প্রকাশক :
মণিদীপা মুখার্জী
৭।৩ বি, রাধানাথ মল্লিক লেন
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী, ১৯৫৭

মুদ্রাকর :
শ্রীরামকৃষ্ণ রায়
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

মুরারীশীল ও তৎপত্নী ঃ

ভাঁড়ু দত্ত ঃ

ফুল্লরা ঃ

পুরুষ ও নারী চরিত্র ঃ

মুকুন্দরামের কাব্যে উপাখ্যানদ্বয়ের পৃথক বৈশিষ্ট্য ঃ

মুকুন্দরামের তুঃখবাদ ঃ

মুকুন্দরামের কাব্যে হাস্যরস ঃ

পরিশিষ্ট

[ক]

[খ]

[গ]

[ঘ]

বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ধারা

মঙ্গলকাব্য পরিচিতি ঃ

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা-সাহিত্যসাগরসঙ্গমে যে কয়টি স্রোতধারা এসে মিলিত হয়েছিল তাদের মধ্যে তিনটি ধারাই প্রধান। এই তিনটি ধারা—গীতিকাব্য, অনুবাদ কাব্য ও মঙ্গলকাব্য। এই যুগের সাহিত্য সৃষ্টি সবই ধর্মকেন্দ্রিক ; সুতরাং ধর্মীয় সাহিত্য আখ্যায় ভূষিত হওয়ার উপযুক্ত। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রায় সবটাই গীত হোত। চর্যাগীতি, বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ ও ভারত পাঁচালী সবই গানের উদ্দেশ্যে রচিত। গীতিময়তাই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাণ। প্রাগাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ত্রিধারার মধ্যে মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ কাব্য পাঁচালী নামে অভিহিত। নৃত্যগীত সহযোগে খোলা আসরে এইগুলি জনসাধারণের কাছে পদচারণা করতে করতে পরিবেশন করা হোত বলেই হয়ত পাঁচালী নামকরণ হয়েছিল। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, পাঞ্চালিকা অর্থাৎ পুতুলনাচ থেকেই পাঁচালী এসেছে।

মঙ্গলকাব্যগুলি আখ্যায়িকা কাব্য। সাধারণভাবে দেবদেবীর মহিমা-প্রচারক আখ্যায়িকা কাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলা হয়ে থাকে। এই সব দেবদেবীকে সাধারণতঃ লৌকিক দেবতা বলা হয়ে থাকে। মঙ্গলকাব্যগুলি কয়েকটি নির্দিষ্ট আঙ্গিকে বিভক্ত। কাব্যের প্রথম অংশে থাকে দেবদেবীর বন্দনা। এই অংশে কবি উদারভাবে সকল সম্প্রদায়ের দেবদেবীর বর্ণনা করে থাকেন। দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত হয় গ্রন্থ রচনার কারণ। প্রায় সকল কবিই দেবতার আদেশ অথবা স্বপ্নাদেশকেই কাব্য রচনার প্রেরণা রূপে বর্ণনা করে থাকেন। এই অংশে কবিরা নিজের নাম, বংশপরিচয়, রচনাকাল ইত্যাদিও বিজ্ঞাপিত

করেন। তৃতীয় অংশের নাম দেবখণ্ড। 'লৌকিক দেবতা' নামে কথিত কাব্য-বর্ণিত দেবতার সঙ্গে পৌরাণিক দেবতার সংযোগ স্থাপনই এই অংশের উদ্দেশ্য। এই অংশে পৌরাণিক হরপার্বতীর কাহিনীই সাধারণতঃ সবিস্তারে বর্ণিত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত পৌরাণিক আদর্শে সৃষ্টি-প্রকরণও বর্ণিত হয়। চতুর্থ খণ্ড নরখণ্ড। এই অংশে থাকে মূল কাহিনী। সাধারণতঃ কোন শাপভ্রষ্ট স্বর্গের অধিবাসী মর্তে আবির্ভূত হয়ে কাব্যবর্ণিত দেবতার পূজা প্রচারের উদ্যোগী হয়ে থাকেন। কখনও কোন বিরোধী শক্তির প্রতিকূলতাকে পরাভূত করে, কখনও বা কাব্যের নায়কনায়িকা ইষ্ট দেবতার আনুকূল্য লাভ করে কাব্যবর্ণিত দেবতার মহিমা এবং পূজা প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। মনসামঙ্গলে বেহুলা-লখীন্দর, চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু-ফুল্লরা, ধর্মমঙ্গলে লাউসেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নায়িকার বারমাস্যা বা বারমাসের দুঃখ কাহিনী, নায়িকার সজ্জা, রন্ধন ও ভোজন, কাঁচলি নির্মাণ, চৌতিশা বা চৌত্রিশ অক্ষর-যুক্ত ছত্রে ইষ্ট দেবতার স্তব প্রভৃতিও নরখণ্ডে বর্ণিত হয়ে থাকে।

মঙ্গলকাব্য ও ব্রতকথা ঃ

পাল রাজাদের রাজত্বকালে বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধ প্রভাব ব্যাপকতর হয়েছিল। সেন রাজাদের আমলে হিন্দু প্রাধান্য বর্ধিত হয়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই তুর্কী প্রাধান্য সূচিত। এই সব রাজনৈতিক পরিবর্তন সমাজ ও সংস্কৃতির উপরে ছাপ ফেলেছিল। ফলে ধর্মচর্যারও বিচিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়। পৌরাণিক দেবতারা আকার-প্রকার পরিবর্তন করে সম্ভবতঃ কিছু কিছু আর্যেতর প্রভাব স্বীকার করে নিয়ে পূজিত হতে থাকেন। এই সব দেবতাই মঙ্গলকাব্যে আসন দখল করেছেন। হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক জীবন ধর্মাশ্রিত। পারিবারিক জীবনে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল স্বভাবা মেয়েরা স্বামী-পুত্র-পরিবারের মঙ্গল কামনায় এই সকল পুরাতন অথচ স্বল্পিত এবং লৌকিক দেবদেবীদের পূজা করতে থাকেন। নানাবিধ

বারব্রত আচরণে তাঁরা দেবতার কৃপা প্রার্থনা করতেন। মেয়েদের এই সকল বারব্রত উপলক্ষ্যে ছড়া বা ব্রতকথা পাঠ করার প্রচলন সেকালেরও ছিল আর এখনও আছে। এই সকল ছড়া বা ব্রতকথা কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলে চিহ্নিত করার উপায় নেই। পণ্ডিতদের মতে, এই ব্রতকথাগুলিই সংস্কৃত পুরাণাদির আদর্শে মঙ্গলকাব্যের আকৃতি লাভ করেছে বিভিন্ন প্রতিভাধর কবির হাতে। মঙ্গলকাব্য নামক পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকা কাব্যের আকার লাভ করার পূর্বে মেয়েলী ব্রতকথার মধ্য দিয়ে এগুলি বিকাশ লাভ করেছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যগুলি যে ভাবে পরিপূর্ণ ও সুসংবদ্ধ কাব্যাকার লাভ করেছে, তাতে মনে হয় যে আরও অনেক পূর্ব থেকেই এগুলি গ্রাম্য মেয়েদের ব্রতাচরণের উপাখ্যানরূপে বিকাশ লাভ করেছিল। এখনও সত্যনারায়ণের ব্রতকথা, সুবচনীর ব্রতকথা, শনির পাঁচালী, সূর্যের পাঁচালী, ছড়ার আকারে মেয়েলী ব্রতমাহাত্ম্য যে ভাবে প্রচলিত আছে তাতে মনে হয় অনুরূপ ব্রত-পাঁচালী থেকেই মঙ্গলকাব্যগুলি ক্রমবিবর্তনের পথে পূর্ণাঙ্গ আকৃতি লাভ করেছে। হয়ত দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দী অথবা আরও পূর্বে এই ধরনের লৌকিক ব্রত-মাহাত্ম্য বিভিন্ন আকারে প্রচলিত ছিল। পয়ার বা হাল্‌কা চালের ছন্দে রচিত এই ব্রতকথাগুলির মধ্যে কোন এক দেবতার মহিমাখ্যাপক কাহিনী গড়ে উঠেছিল। ডঃ সুকুমার সেন এইগুলিকে ব্রতগীত পাঞ্চালী বলেছেন। তিনি লিখেছেন, "গ্রাম-দেবদেবীর মাহাত্ম্য খ্যাপন উপলক্ষ্যে প্রাচীন কাহিনীগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাকেই ব্রত-গীত-পাঞ্চালী বলিতেছি।" হয়ত মুসলমান আগমনের পূর্বেই মনসা-চণ্ডী-ষষ্ঠী প্রভৃতির মাহাত্ম্য-খ্যাপক ব্রত-কাহিনী প্রচলিত ছিল। তবে এই ধরনের ব্রত-কাহিনীতে সুসংবদ্ধ কাব্যাকার নেই ও আশাও করা চলে না। ডঃ অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে, কানাহরি দত্ত মনসার ছড়াকে পাঁচালীর আকার দিয়েছিলেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলে ব্রতকথার ছাপ আছে। ক্ষমানন্দ ভনিতায় মনসামঙ্গলের যে ক্ষুদ্র কাহিনীটি

বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে সেটিও কতকটা ব্রতকথার মত। মেয়েলী ছড়ায় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা এখনও দুর্লভ নয়। তাই মনে হয় ব্রত-ছড়ার মধ্য দিয়ে যে কাহিনী বা আখ্যান আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাই পরবর্তী কালে প্রতিভাধর কবির হাতে সুসংবদ্ধ আকারে পাঁচালীকাব্যে পরিণতি লাভ করেছে।

মঙ্গলকাব্যের প্রকারভেদ ঃ

মঙ্গলকাব্যগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ বৈষ্ণব, পৌরাণিক ও লৌকিক। বৈষ্ণবীয় মঙ্গলকাব্যের মধ্যে চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, জগন্নাথ মঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যে পুরাণ প্রসিদ্ধ দেবতার মহিমা কীর্তিও হয়েছে। সূর্যমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এইগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত পুরাণাদির ভাবানুবাদ। অবশ্য গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, জগন্নাথ মঙ্গল প্রভৃতিও পৌরাণিক মঙ্গল-কাব্যের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হতে পারে। কিন্তু যে কাব্যগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে অধিকতর সমাদৃত, প্রচারিত এবং মঙ্গলকাব্য আখ্যায় মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা কাব্যের সম্পদরূপে পরিগণিত, সেগুলিকে সাধারণতঃ লৌকিক মঙ্গলকাব্য বলা হয়ে থাকে। লৌকিক দেবদেবীর মহিমা-প্রচারক কাব্য হিসাবেই এইগুলি লৌকিক মঙ্গলকাব্য আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছে। লৌকিক মঙ্গলকাব্যের তিনটি প্রধান ধারা ঃ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। এ ছাড়াও অপ্রধান শাখাগুলির মধ্যে রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব ও পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়বস্তু এবং প্রকৃতি মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু এবং প্রকৃতি থেকে ভিন্ন হওয়ায় এগুলি প্রকৃত মঙ্গলকাব্যের এক্তিয়ারভুক্ত নয়।

মঙ্গলকাব্য নামের তাৎপর্য ঃ

মঙ্গলকাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি পারিভাষিক শব্দ হিসাবে প্রচলিত। এক বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টিকে এই ধরনের সংজ্ঞা দেওয়ার কারণ

সম্পর্কে বিভিন্ন মতের প্রচলন আছে। কোন কোন মঙ্গলকাব্য এক মঙ্গলবার থেকে অপর মঙ্গলবার পর্যন্ত গীত হোত। মঙ্গলবারে সূচনা ও মঙ্গলবারে সমাপ্তি থেকে কাব্যগুলির নাম মঙ্গলকাব্য হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু ধর্মমঙ্গলকাব্য বার দিন ধরে গীত হোত। ভারতীয় রাগরাগিণীর মধ্যে অন্যতম 'মঙ্গলরাগ'। মঙ্গলকাব্যগুলি হয়ত মঙ্গলরাগে গীত হোত অথবা এই কাব্যগুলি গীত হওয়ার কালে ব্যবহৃত বিশিষ্ট সুরকে 'মঙ্গল রাগ' নামে অভিহিত করা হোত বলেই হয়ত কাব্যগুলিকে মঙ্গলকাব্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে,—এমন অনুমানও কেউ কেউ করে থাকেন। হিন্দী ও দ্রাবিড় ভাষায় বিবাহ অর্থে মঙ্গল শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় বিবাহোপলক্ষ্যে আয়োজিত লোকগীতি মঙ্গল বা মঙ্গলাচার নামে প্রাচীন বাঙ্গালায় অভিহিত হওয়ায়, সংকুচিত অর্থে দেবদেবীর বিবাহ, দেবদেবীর বিবাহে অনুষ্ঠিত গীত এবং সব শেষে দেবদেবীর পূজোপলক্ষ্যে দেবদেবীর মহিমাখ্যাপক গীত মঙ্গলগান বা মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত হতে পারে। দেবতার পূজানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মঙ্গলকাব্য গানের রেওয়াজ ছিল। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "দেবপূজা উৎসব উপলক্ষ্যে এসব কাহিনী দীর্ঘদিন ধরিয়া গীত-প্রযুক্ত হইত। কতক অংশ গানের মত নাচের তালে গাওয়া হইত। বাকি অংশ সুরে তালে আবৃত্ত হইত। গ্রাম দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে তাঁহাদের মাহাত্ম্য কাহিনী গীত হইলে আসরে একটি ঘট রাখিয়া তাহাকে দেবাধিষ্ঠান কল্পনা করা হইত। যিনি অধিকারী তিনিই মূল গায়ন। তাঁহার হাতে থাকিত চামর, এক পায়ে নূপুর। তাঁহার সহকারীরা দোহার বা পালি। ইহারা ধুয়া গাহিতেন এবং মৃদঙ্গ ও মন্দিরাও বাজাইতেন।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম পূর্বার্ধ)

সাধারণতঃ মঙ্গল শব্দ কল্যাণার্থে ব্যবহৃত হয়। কল্যাণার্থক মঙ্গল শব্দ কাব্যটির নামকরণের সঙ্গে জড়িত থাকাই স্বাভাবিক। যে কাব্য বা গীত রচনায় গানে এবং শ্রবণে ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গল বা কল্যাণ সাধিত

হয় সেই কাব্যই মঙ্গলকাব্য নামে খ্যাত হওয়া সঙ্গত। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ ভক্তের কল্যাণ সাধন ত করেছেনই, এমনকি বিদ্বেষী অভক্তকেও স্ববশে আনয়ন ক'রে কল্যাণদাতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সাধারণতঃ কোন ঐহিক অমঙ্গলনাশ তথা মঙ্গললাভের উদ্দেশ্যেই ভক্তগণ এই সকল দেবতার পূজা করেছেন বা পূজা প্রচার করেছেন। সুতরাং শুভার্থক মঙ্গল শব্দ থেকেই মঙ্গলকাব্যের নামকরণ সঙ্গত বোধ হয়।

জাগরণ ও অষ্টমঙ্গল ঃ

মঙ্গলকাব্যগুলিকে অনেক সময় জাগরণ বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জাগরণ কাব্যের অন্তিমপূর্ব পালার নাম। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য আট পালায় বিভক্ত আট দিনে গেয়। ধর্মমঙ্গল বার দিনে গেয়। এক মঙ্গলবারে শুরু করে পরের মঙ্গলবারে শেষ করার জন্যই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিকে অষ্টমঙ্গল বলা হোত। অন্তিম পূর্ব পালার নাম জাগরণ পালা। গান যে দিন সমাপ্ত হয় (অষ্টম অথবা দ্বাদশ দিনে) তার পূর্ব রাত্রে সারা রাত জাগরণ করে গান শোনার রীতি। এই পালাটিই সাধারণতঃ দীর্ঘতম এবং কাব্যের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঘটনার climax এখানে। সারা রাত্রি জাগ্রত থেকে এই অংশ শোনার রীতি প্রচলিত ছিল বলেই এই পালার নাম জাগরণ। অন্তিম দিনে গীত হোত মূল কাব্য-বহির্ভূত বিষয়সমূহ, যেমন—গীত শ্রবণের ফল, কবির আত্মকাহিনী, সমগ্র কাব্যের সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে অষ্টম দিনে গেয় এই অংশটি অষ্টমঙ্গলা নামে পরিচিত ছিল। এ থেকেই বোধ হয় সমগ্র কাব্যটিকেই অষ্টমঙ্গল বলা হোত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে ধর্মমঙ্গল কাব্যে অষ্টমঙ্গলা কথাটি সংক্রমিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের পটভূমি ঃ

চৈতন্যপূর্ব যুগে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের সময় পর্যন্ত চার পাঁচ শত বৎসর ধরে মঙ্গলকাব্যের যুগ

প্রবাহিত হয়েছে। বাঙ্গালাদেশ আর্যেতর এক পুরাতন সভ্যতার লীলাভূমি। পণ্ডিতগণের মতে, আদি-অষ্ট্রিক মঙ্গোল, দ্রাবিড়, কোল প্রভৃতি অন্-আর্য জাতির সংমিশ্রণে যে আর্যেতর কৃষ্টির উদ্ভব হয়েছিল, তা অন্-আর্য হলেও আর্য সভ্যতা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। (এই আর্যেতর সমাজের ছিল পৃথক সমাজবন্ধন, রীতিনীতি, ধর্মচর্যা। বৈদিক সমাজে পুরুষের প্রাধান্য যে স্বীকৃত হয়েছিল, বৈদিক গ্রন্থাদি তার সাক্ষ্য বহন করে।) বিবর্তন ধারা সুস্পষ্ট হলেও পুরাণে মোটামুটি বৈদিক সমাজরীতিই অনুসৃত। কিন্তু আর্যেতর আদিম সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য তাই এই সমাজে। পূর্ব ভারত বিশেষতঃ নেপাল বঙ্গদেশ আসাম তন্ত্রসাধনার লীলাভূমি। তন্ত্রসাধনায় মাতৃসাধনাই প্রাধান্য পেয়েছে। পূর্ব ভারতে তান্ত্রিকতার প্রভাবেই বৌদ্ধতন্ত্রের উৎপত্তি (?) পূর্ব ভারতে উদ্ভূত মহাযানী বৌদ্ধধর্মেও বহু স্ত্রীদেবতা স্থান লাভ করেছেন। সম্ভবতঃ গুপ্তযুগে বঙ্গদেশে আর্য প্রভাব প্রসারিত হয়। পাল রাজত্বকালে সমগ্র বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধপ্রভাব ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। এই সময়েই বাঙ্গালা ভাষা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষণা করে। এই সময়েই বাঙ্গালী মানস আপন স্বাতন্ত্র্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতারাও বৌদ্ধতন্ত্রে নবরূপ ধারণ করেছিলেন। সেন রাজত্বে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বাঙ্গালাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এদেশে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবতাগণ হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে নব নব আকার ধারণ করেন। এই সময়ে যেমন স্মৃতিশাস্ত্র-শাসিত সমাজব্যবস্থা প্রাচীন সমাজব্যবস্থার স্থান গ্রহণ করে, স্মৃতিশাস্ত্র ও সংস্কৃতসাহিত্যের চর্চাও এদেশে ব্যাপকতর হয়, তেমনি শাস্ত্রে ভাস্কর্যে কাব্যে পৌরাণিক ও মিশ্রদেবতাগণ স্ব স্ব আসন দখল করতে থাকেন। পুরাণ ও তন্ত্রের দেবদেবীদের সঙ্গে স্থানীয় গ্রাম্য দেবদেবীরাও পৌরাণিক মহিমা ও মর্যাদায় উন্নীত হন। বেদ, পুরাণ, বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রের দেবতার সঙ্গে স্থানীয় দেবতার সংমিশ্রণে উৎপন্ন

বাঙ্গালী। সাধারণের দেবতারা ক্রমে ক্রমে এদেশের সমাজজীবনে ও ধর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তবে স্মৃতিশাস্ত্র-শাসিত ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যবাহী হিন্দু সমাজে এই সকল লৌকিক দেবদেবীর উচ্চতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠালাভ খুব সহজে সম্ভব হয়নি। নানাবিধ পরিবর্তন, আন্দোলন ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে লৌকিক ও মিশ্রিত দেবতারা হিন্দু সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই সংঘর্ষ এবং আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে মঙ্গলকাব্যগুলিতে। দেবতার সঙ্গে দেবতার পূজক বা মহিমাগায়ককেও জাতিচ্যুত হতে হয়েছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে তুর্কী আক্রমণের সূচনা থেকে প্রায় দুই শত বৎসর অরাজকতা ও অনিশ্চয়তার অন্তে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গলাদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া কতক পরিমাণে আবির্ভূত হয়েছিল। মোটামুটি একটা নিশ্চিন্ততার পরিবেশ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। সিংহাসনের লড়াই কিম্বা রাজবংশের পরিবর্তন পল্লীকেন্দ্রিক বাঙ্গালার সাধারণ মানুষকে তেমন প্রভাবিত করেনি। তাই চতুর্দশ শতক থেকেই সাহিত্য প্রচেষ্টার শুভ সূচনা লক্ষিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাহিত্য প্রচেষ্টা বিস্তৃতি লাভ করে।

তুর্কী আক্রমণ ও মুসলমান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙ্গালার সমাজেও গুরুতর পরিবর্তন হোল। তুর্কী আক্রমণে এ দেশের মানুষ যে ঝাঁকানি খেল সেই ঝাঁকানিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাসিত সমাজ ও আর্যেতর সমাজ কাছাকাছি এসে সংমিশ্রণের সুযোগ পেল। ফলে একের দেবতা অপরের সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করলেন। মুসলমান আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জনজীবনে কতকটা স্থৈর্য ফিরে এলেও নিরুপদ্রব শান্তি সুলভ হয়নি। মাঝে

দুর্যোগ এসে নাড়া দিয়েছে জনসমাজকে। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে হাবসী কুশাসন এবং ষোড়শ শতকের শেষভাগে মোঘল-পাঠান সংঘর্ষ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। নিরুপদ্রব শান্তি এবং নিরাপত্তার অভাব-

বোধ প্রকটিত হয়েছে। স্থানীয় মুসলমান শাসক এবং রাজকর্মচারীর অত্যাচারও সময়ে সময়ে সাধারণ মানুষকেও ভীত-ত্রস্ত করে তুলতো। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারের কাহিনী মুকুন্দরাম সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। মামুদ সরিফের উৎপীড়নের ফলে বর্ধমানের দামুন্যা ও নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে মানুষ পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ধাওয়া করেছে। মুকুন্দরাম লিখেছেন ঃ

পেয়াদা সভার কাছে প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজারা হয়ে ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥

এমনি বিপর্যয়ের মুখে অসহায় প্রজা দেবতাকেই আশ্রয় বলে গ্রহণ করা ছাড়া আর কি করতে পারে? এমনি কত মামুদ সরিফের আবির্ভাব ঘটেছিল তার হিসাব কে রেখেছে? ফলে মানুষ হারালো আত্মবিশ্বাস—হয়ে পড়লো দৈবাধীন। প্রতিকারে অক্ষমতা হেতু বিদেশী আক্রমণকারীর অত্যাচারকে তারা দৈবের বিধান বলে স্বীকার করে নিল। দেবতার আনুকূল্যে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর প্রতিকূলতার সর্ববিধ বিপদের আশংকা থেকেই একান্ত দৈব নির্ভরতা জন্ম নেয়। সম্পন্ন গৃহস্থ যখন মামুদ সরিফদের রোষ দৃষ্টিতে সর্বহারা হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে তখন এই আকস্মিক বিপৎপাৎকে দেবতার রোষ ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করা সম্ভব হয় না। সমাজের এই অনিশ্চয়তাজাত চিন্তার ছাপ পড়েছে দেবদেবীর চরিত্রে। দেবতা হয়েছেন নিষ্ঠুর অত্যাচারী। এমন একজন দেবতার উপর নির্ভর করা প্রয়োজন যিনি তুষ্ট হলে অপরিমিত সুখ সম্পদ দানে সমর্থ এবং প্রয়োজনে শত্রুদলনে হবেন অতি ভয়ংকর। তাই দেবতার রোষে ছয় পুত্রের বিষে মৃত্যু হয়,—ধনপূর্ণ চৌদ্দ ডিঙা জলে ডোবে, অবশিষ্ট একমাত্র পুত্র লোহার বাসরঘরেও সর্পদংশনে প্রাণ হারায়। আবার দেবতার পরিতুষ্টি ফিরিয়ে দেয় মৃতপুত্রের জীবন হৃতসম্পদ—দেবতার কৃপায় দরিদ্র ব্যাধ পায় রাজত্ব—মশান থেকে ফিরে বন্দীত্বমুক্ত পিতা, ধনসম্পদ এবং

সুন্দরী রাজকন্যা নিয়ে বাড়ীর পথে নৌকা ভাসায় শ্রীমন্ত। এই যুগে দেবতার মধুর বা ঐশ্বর্যভাব মনকে তৃপ্তি দেয় না। তাই সর্বত্যাগী নিস্পৃহ তপস্বী শিব অপেক্ষা অনুগ্রহ-নিগ্রহে সমর্থ মনসা চণ্ডী ধর্মরাজ অধিকতর শরণ্য বলে গণ্য হয়। অবশ্য সংস্কৃত পুরাণে অনুগ্রহ-নিগ্রহে সমর্থ ভক্তের প্রতি বরদ এবং অভক্তের বিনাশে উৎসাহী দেবচরিত্রের অভাব আছে তা নয়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতার মত এমন উৎকৃষ্ট প্রতিহিংসা এবং স্বার্থপরতা পৌরাণিক দেবচরিত্রে দেখা যায় না।

মঙ্গলকাব্যে সমাজচিত্র ঃ

(যুগচিত্র প্রতিফলিত হয় কাব্যদর্শনে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে সমাজচিত্র যত স্পষ্ট এবং ব্যাপক, অধিকাংশ কাব্য সাহিত্যেই ততটা পাওয়া যায় না। দেবাশ্রিত কাহিনী মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। দেবমহিমা কীর্তন প্রসংগে বহুতর অলৌকিক কাহিনী তাই এই কাব্যগুলিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। যে যুগে বিদেশী আক্রমণকারী এবং অত্যাচারী শাসকের উৎপীড়নকে প্রতিকারে অসমর্থ জাড্যপূর্ণ মানব সমাজ দেবতার অসন্তোষ বলে মেনে নিয়ে দেবতার প্রসন্ন দৃষ্টির জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করেছে। সেই দৈব নির্ভরতার যুগে দেবতার শক্তি এবং দেবভক্তের সামর্থ্য সম্পর্কে মানুষের ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা ছিল অগাধ; তাই অলৌকিকত্বে বিশ্বাসও ছিল অগাধ। দেবমহিমাকে সাধারণ জনমানসে চির গ্রথিত করার অভিলাষে কবিগণ যথেচ্ছ অলৌকিক কাহিনী ও ঘটনা সন্নিবেশনে দ্বিধা করেন নি। জনরুচি ও জনমানসের প্রবণতা তাই এই কাব্যগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ কবিই স্বাভাবিক নিয়মে সমকালীন সমাজ ও যুগধর্মকে অতিক্রম করতে না পেরে সমাজজীবনের অপূর্ব বাস্তবসম্মত বিবরণ দিয়ে গেছেন। মঙ্গলকাব্যগুলি তাই বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। পাঠান-মোঘল সংঘর্ষে রাজশক্তির উত্থান পতনে, সাময়িক ভাবে অঞ্চল বিশেষে দুর্দিনের সূচনা করলেও তা সামগ্রিকভাবে জনজীবনকে

বিপর্যস্ত করেনি বলেই মনে হয়। মুসলমান শাসকদের উৎপীড়ন কখনও কখনও নিরীহ প্রজাকে বিপন্ন করলেও তা ছিল সাময়িক এবং অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে গোপীনাথ নন্দী বন্দী হয়েছেন, তাঁর তালুক বাজেয়াপ্ত হয়েছে, প্রজারা ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে, কবি মুকুন্দরামও নিঃসম্বল অবস্থায় সপরিবারে সাতপুরুষের ভিটে ত্যাগ করেছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে মহামদের প্রজাদের উপর অত্যাচার-কাহিনীর বেনামীতে সেকালের শাসকবর্গের অত্যাচারের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। মিথ্যা অপবাদে ঘরবাড়ী লুণ্ঠন, সতের লাঞ্ছনা, অসতের পুরস্কার, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ইত্যাদির দুর্দশা, রাজকর বৃদ্ধি প্রভৃতি উপদ্রবে প্রজাগণের দেশত্যাগী হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। তথাপি সাধারণভাবে হিন্দু-মুসলমান আশেপাশে বসবাস করেছে। সুলতান হোসেন শাহের আমলে প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে বিজয়গুপ্ত লিখেছেন ঃ

যাহার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে অধিক।
মুলুক ফতোয়াবাদ বাঙ্গ বোরা তামসিক।
পশ্চিমে গর্গর নদী পূর্বে ঘণ্টশ্বর।
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥
বৈদ্যজাতি বৈসে তথা লেখনে চতুর।
একাদশীর ব্রত করে পূজয়ে ঠাকুর॥

মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলে মুসলমান পল্লীর একটি মনোরম বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে হাসন-হুসেন ভ্রাতৃদ্বয়ের কৃষিকর্মের বিবরণ আছে। ব্রাহ্মণ্যশাসিত হিন্দু সমাজে বণিক জাতির প্রাধান্য মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল উভয় কাব্যেই পাওয়া যায়। কালকেতুর উপাখ্যানে শবরজাতির প্রাধান্যের ইঙ্গিত আছে। শিবায়ন কাব্যে শিবের কোচ, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতি নিম্ন জাতীয়া নারীর প্রতি আসক্তি ও আর্যসমাজ বহির্ভূত আদিম জাতির প্রাধান্যের ইঙ্গিত বহন করে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব প্রসারিত হলেও পূর্ব ভারতে শবর

প্রভৃতি অন্-আর্য জাতির প্রাধান্য এবং তাদের বিশিষ্ট সংস্কৃতির অস্তিত্ব ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালা দেশেও বর্তমান ছিল। আর্য পুরাণে ভারতের পূর্ব প্রান্তে শবরাদি জাতির প্রাধান্যের কথা স্বীকৃত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম ব্যাপকতা লাভ করেছিল, তার বহুল প্রমাণ রয়েছে মঙ্গলকাব্যগুলিতে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙ্গালার ভাব জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সমাজে এবং চিন্তায় প্রতিফলিত হচ্ছিল। অথচ তন্ত্র-প্রভাবিত বঙ্গদেশে শিব-শক্তির উপাসনা কোন অংশেই হ্রাস পায়নি। বরঞ্চ শক্তিদেবতার নব নব রূপ এবং শিবের কৃষিজীবী সমাজের উপযোগী মূর্তি জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। বেদের রুদ্র এবং পুরাণের যোগীশ্বর শিব কৃষিনির্ভর বাঙ্গালার সমাজে কৃষকে পরিণত হয়েছেন। আবার শিবের নিম্ন জাতীয়া নারীর সঙ্গ শিথিলবন্ধন আদিম সমাজের পরিচয়-বাহী। সেকালের সমাজেও বকধার্মিক, সাধুবেশী ভণ্ডের অভাব ছিল না। ঘনরাম লিখেছেন :

তাহে কত ভণ্ড হইবে পাষণ্ড
বণ্ড ভণ্ড রণ্ডাধীন।

তান্ত্রিক সাধনার নামে ব্যভিচারের উল্লেখও ঘনরাম করেছেন।

না বুঝয়ে তত্ত্ব পরদারে মত্ত
মজাইবে মাংস মদে।

দেশের মানুষ সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত। সাধারণ মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দেই বসবাস করতো। প্রাচুর্য না থাকলেও দারিদ্র্যের প্রখরতা অল্পজনকেই ভোগ করতে হোত। মহামদের অত্যাচারে গৌড়ের দুরবস্থার চিত্র দেখে গৌড়রাজ যখন বলেন :

দেশে নাই অনাবৃষ্টি বিঘা প্রতি আনা।
কোন জোর জঞ্জালে ভাঙ্গিল ঘরখানা॥

(ঘনরামের ধর্মমঙ্গল)

তখন দেশের একটা সামগ্রিক সমৃদ্ধির চিত্র মনে না জেগে পারে না। শিবায়নে দরিদ্র শিব পত্নীর হাতে শাঁখা পরিয়ে পত্নীর সাধ মেটাতে পারেননি বটে, কিন্তু পার্বতী স্বহস্তে রন্ধন করে যে ভাবে সাড়ম্বরে পতি-পুত্রকে চর্ব্য-চোষ্যলেহ্যপেয় দ্বারা ভোজনে পরিতুষ্ট করেছেন, তা আজকের বাঙ্গালা দেশে রীতিমত ঈর্ষার বস্তু। মনে হয়, সে যুগে খাদ্য-বস্ত্রের অভাব ছিল না। কারণ এ দুটি জিনিষই বাঙ্গালা দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হোত। কিন্তু টাকা-পয়সার তেমন স্বচ্ছলতা ছিল না। দ্রব্যবিনিময় অথবা কড়ি দিয়ে কেনাকাটা চলতো। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত বাঙ্গালীদের বেশভূষা ও অলংকারপ্রিয়তা বাঙ্গালীর সৌখিন মনের এবং উন্নত রুচির পরিচয় বহন করে। মেয়েদের কাঁচলী নির্মাণে যে শিল্পকার্যের বিবরণ আছে তা বোধ করি এ যুগের পক্ষে কল্পনারও অতীত। মেয়েরা সোনার অলংকার কুসুমের অলংকার শাঁখা ইত্যাদি পরিধান করতেন, মেঘডম্বুর শাড়ী, কাঁচলী প্রভৃতি ছিল তাঁদের পরিধেয়। কানাড়ী প্রভৃতি ছন্দে মেয়েরা বাঁধতেন কবরী। নগরবাসীদের বর্ণনায় মুকুন্দরাম লিখেছেন ঃ

নগরে নাগর জনা কানে লম্বমান সোনা
বদনে গুবাক হাতে পান।
চন্দনে চর্চিত তনু হেন দেখি যেন ভানু
তসর রঙ্গন পরিধান॥

নগরবাসীরা বেশ সৌখিন ছিলেন বলেই মনে হয়। পুরুষেরা পরতেন কানে কুণ্ডল, হাতে বালা। মাথায় পাগড়ী ও গায়ে উড়নি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল।

একখানি কাছিয়া পিন্ধে একখানি মাথায় বান্ধে
একখান দিল সর্বগায়।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব থেকে হিন্দু রাজা ও সেনাপতিরা দরবারে পশ্চিমী পোষাক পরতেন; যুদ্ধকালে পাগড়ী-ইজার-কাবাই পরা হোত।

ফুল্লরার বারমাস্যাতে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দারিদ্র্যের যে মর্মন্তুদ চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে কতকটা আতিশয্য আছে বলে মনে হয়। ভাবী সপত্নীকে বিতাড়িত করতে কাল্পনিক দারিদ্র্যের কাহিনী ইনিয়ে বিনিয়ে বলা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তথাপি স্বচ্ছলতার সঙ্গে দারিদ্র্য যে ছিল সে কথাও মিথ্যা নয়। ফুল্লরার বারমাস্যাতে মুকুন্দরাম বাঙ্গালী সমাজের অনেক সংবাদ দিয়েছেন। বাঙ্গালীর তৈলচর্চিত তনু, মাংসপ্রিয়তা, আশ্বিনে দুর্গাপূজার আনন্দ, মাঘমাসে শাক তোলার মত তুচ্ছ বিষয়ে বিধিনিষেধ মানার রীতি, পৌষ-মাঘ মাসে ঘরে ঘরে গোলায় ধান প্রভৃতি অনেক মূল্যবান তথ্য এখানে জমা হয়েছে। দরিদ্র মেয়েরা পরতেন খুঁঞার বসন এবং শীতে লেপের পরিবর্তে খোসলা ব্যবহার করতেন।*

মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বণিক সমাজের নৌকায় বা জাহাজে সমুদ্রপথে বিদেশে বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ পাই। অনেকে মনে করেন যে, এই বিবরণে সমকালীন বাণিজ্যের চিত্র অপেক্ষা পূর্বতন কালের স্মৃতিই অধিকতর কার্যকরী হয়েছে।

শিবায়ন কাব্যে প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের কৌলিন্য প্রথা, কৃষকদিগের কৃষিকার্য, দরিদ্র পরিবারের দারিদ্র্য প্রভৃতির বিবরণ আছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে কৌলিন্য প্রথার প্রাবল্য লক্ষিত হয়। কুলীন সন্তান কেবল বংশমর্যাদার জোরেই বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হতেন। নয় বৎসর বয়স্কা বালিকা কন্যাকে বয়স্ক কুলীন তনয়ের হাতে সমর্পণ করে গৌরীদানের পুণ্যার্জনে অনেকেই সমুৎসুক হতেন। মুকুন্দরামের নগরপত্তনে সে যুগের সামাজিক ইতিহাস ও নানা বৃত্তির লোকের পরিচয় আছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোপ, ধীবর, ছুতার, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতির লোকেরা স্বস্ব বৃত্তি অনুযায়ী জীবিকা নির্বাহ করতেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানগণও নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে কাজ করতেন। ঘনরামের কাব্যেও বিভিন্ন বৃত্তির লোকের বিবরণ আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কুলীন কায়স্থ,—ঘোষ মিত্র বসু প্রভৃতি, তামুলী, তাঁতী, মালী,

বণিক, কুমার, শাঁখারী, কর্মকার, উত্তর রাঢ়ী সিংহ দাস দত্ত পাল ঘোষ প্রভৃতি গোপগণ, বারুই, কলু, কৈবর্ত, ছুতার, রজক, মোদক, সুবর্ণ বণিক, আগুরি, ডোম, শুড়ি, কিরাত প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও বৃত্তির মানুষ ইছাই ঘোষের নির্মিত নগরে বসতি স্থাপন করেছে। চোয়াড়, খয়রা, খণ্ডাতি, কোল, খল প্রভৃতি জাতি পুরীর রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। ঘনরামের কাব্যে যুদ্ধবর্ণনার, সৈন্যনির্বাচনের এবং যুদ্ধাস্ত্র বর্ণনারও বাস্তব চিত্র আছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন যে চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা, ভাঁড়ু দত্ত, মুরারীশীল, ধর্মমঙ্গলের কর্পূর সেন মহামদ পাত্র মনসামঙ্গলের সনকা প্রভৃতি বাঙালীর ঘরের নিত্যকালের চিত্র। কালু ডোম ও লখ্যা ডোমের বীরত্ব ডোমজাতির সৈনিকবৃত্তির পরিচায়ক। কালু ডোম ও লখ্যা ডোমের যুদ্ধসজ্জা, বীরত্ব, নিষ্ঠা, সততা, বিশ্বস্ততার যে বিবরণ ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখা যায়, তাতে এই অন্ত্যজ শ্রেণীর বাস্তব গৌরবোজ্জ্বল চিত্রটি বাঙ্গালীর মানসপটে চির মুদ্রিত হয়ে যায়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কন্যার জননী মেনকা ও সাপুড়ে শিবের চিত্রটি বাঙ্গালী সমাজে অতি পরিচিত।

আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকারা প্রধানতঃ বণিক ও নিম্ন সম্প্রদায়ের। সুতরাং সমাজে উচ্চ বর্ণের প্রাধান্য ছিল না, এ অনুমান অসঙ্গত নয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে—মুকুন্দ-রামের নগরপত্তন পালায় বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রা ও বৃত্তির যে বিবরণ আছে তা থেকে একটা নূতন সমাজ সংগঠন ও বিরুদ্ধ উপাদানের সমন্বয়ের আভাস পাওয়া যায়।

সেকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা একালের মতই বাড়ীতে চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতেন। বিদ্যাচর্চা সাধারণতঃ উচ্চ বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজসরকারে যাঁরা চাকরি করতেন, তাঁরা সংস্কৃতের সঙ্গে ফার্সীও শিখতেন। নরসিংহবসু (১৮শ শতাব্দী) তাঁর ধর্মমঙ্গলকাব্যে লিখেছেন যে তাঁকে সংস্কৃত ও ফার্সী পড়তে হয়েছিল।

সমন্বয়ের সময় পৌরাণিক মহেশ্বর ও কুচনীর রূপমুগ্ধ বৃদ্ধ শিব এক হইয়া গেলেন।” (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত)

শিবায়ন কাব্যেই গৃহী কৃষিজীবী শিবের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। এই কাব্যে শিবের চরিত্র কোন মহৎ মর্যাদায় ভূষিত হয়নি। কোচনী এবং বাগ্দিনীর প্রতি শিব চরিত্রকে অতি সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। এই উপাখ্যানে আদিম লোককাহিনীর প্রভাব থাকতেও পারে। কিন্তু স্কন্দপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড), শিবপুরাণ প্রভৃতিতে শিবের কামাতুরতা এবং পরদারাসক্তির বর্ণনা আছে। বামন পুরাণে আছে শিবের দারিদ্র্যের উল্লেখ। কৃষিপ্রধান বাঙ্গালাদেশে এই উপাখ্যানগুলিই কৃষক শিবের জীবন প্রসংগে সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

তিনটি প্রধান মঙ্গলকাব্যের তিনজন প্রধান দেবতা ঃ মনসা, চণ্ডী ও ধর্মরাজ। এঁদেরও সাধারণতঃ লৌকিক দেবতা বলা হয়ে থাকে। মনসা সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, “আর্য সমাজে স্ত্রী দেবতার বিশেষ কোন স্থান ছিল না। মোহেন্-জো-দারো ও হরপ্পা আবিষ্কার হইতে জানা যায় যে, সেখানে প্রাগৈতিকহাসিক যুগেই মাতৃকাপূজা বিশেষ প্রচলিত ছিল।... ...বাঙ্গালার সর্পদেবী মনসার পরিকল্পনায় এই অনার্য সম্ভূত মাতৃকাপূজা বা শক্তিপূজারই অন্যতম বিকাশ দেখিতে পাই।” (মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস) আসাম বাঙ্গালা উড়িষ্যা থেকে নাগপুর ও দক্ষিণাঞ্চলে সাপের উপদ্রব যেমন বেশী, তেমনি প্রচলিত সর্পপূজা বা সর্পদেবতার পূজার প্রচলন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের মতে, মনসা অনার্য দেবতা; দাক্ষিণাত্যে কানাড়া প্রদেশে অনার্য-পূজিত স্ত্রী-সর্প বা সর্পদেবতা মঞ্চাম্মা কালক্রমে দাক্ষিণাত্যাগত সেনরাজগণের সঙ্গে বাঙ্গালা দেশে এসে মন্চা-অম্মা বা মনসা মাতায় পরিণত হয়েছেন। কিন্তু এই মত সর্বজন স্বীকৃত নয়। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে, ‘মনসা’ থেকেই ‘মন্চার’ উৎপত্তি। পাণিনি ব্যাকরণে ‘মনসা দেবী’র উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতিতে মনসাদেবীর কথা পাওয়া যায়। মহাভারতে

মনসা

আস্তীক-জননী বাসুকির ভগিনী জরৎকারু মুনির পত্নী জরৎকারুর কাহিনী আছে। কিন্তু তাঁর নাম 'মনসা' দেওয়া হয়নি। মহাভারতে সর্পমাতা কশ্যপ পত্নী কদ্রু। পুরাণে মনসা কশ্যপের পত্নী।

সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য মানসী।
তেনৈব মনসা দেবী মনসা বা চ দীব্যতি॥

দেবীভাগবতে মনসার সঙ্গে জরৎকারুকে সংযুক্ত করা হয়েছে :

নাগানাং প্রাণরক্ষয়িত্রী যজ্ঞে পরীক্ষিতস্য চ।
নাগেশ্বরীতি বিখ্যাতা সা নাগভগিনীতে চ॥
বিষং সংহর্তুমীশা যা তেন বিষহরী স্মৃতা॥
আস্তীকস্য মুনীন্দ্রস্য মতো সাপি তপস্বিনী।
আস্তীকমাতা বিজ্ঞাতা জগত্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতা॥

বৌদ্ধতন্ত্রের জাঙ্গুলী বা জাঙ্গুলীতারা বিষহরী দেবতা। জাঙ্গুলী বিষবিদ্যা বলেই সম্ভবতঃ বিষবৈদ্যকে জাঙ্গুলিক বলা হয়। জাঙ্গুলী দেবী সর্বশুক্লা চতুর্ভুজা সর্পভূষিতা ও বীণাপাণি। ডঃ সুকুমার সেন মহামায়ূরী ও একজটা নাম্নী অপর দুটি দেবীর সঙ্গে মনসার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। মহামায়ূরী বিষনাশের এবং বিষবিদ্যার দেবতা, আর একজটা সর্বাঙ্গে হিংস্র সর্পভূষিতা। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের হংসারূঢ়া, নাগপাশ হস্তা বজ্রশৃঙ্খলা পদ্মাবতী এবং সর্পবাহনা পন্নগা বা মানসী দেবীর সঙ্গেও মনসা দেবীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অথর্ববেদে সরস্বতী বিষনাশিনী দেবী। সরস্বতীর সঙ্গে মনসার সাদৃশ্য সুগভীর। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, রুদ্রতেজ 'মনা' মনসা হয়েছেন। পুরাণের কশ্যপের মানস-কন্যা মনসা, মঙ্গলকাব্যে শিবকন্যা হয়েছেন। অথর্ববেদে ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কশ্যপ সূর্যের নামান্তর। রুদ্র ও সূর্য। সুতরাং রুদ্রতেজ মনা এবং কশ্যপকন্যা বা শিবকন্যা মনসা স্বরূপতঃ অভিন্না। সুতরাং মনসার রূপকল্পনায় বৈদিক মনা ও সরস্বতীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। হয়ত বা বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলী, একজটা, মহামায়ূরী, জৈনদেবী পন্নগা মানসীর সংমিশ্রণও থাকতে পারে।

আবার সরস্বতী মনসার প্রভাবে বৌদ্ধ এবং জৈন দেবীদের উদ্ভবও অসম্ভব নয়।

চণ্ডীমঙ্গলের অধিদেবতা চণ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত দেবতেজঃ সম্ভূতা মহিষাসুরঘাতিনী মহামায়া চণ্ডী থেকে ভিন্না বলে প্রতীয়মান হয়। বাঙ্গালা দেশে চণ্ডীদেবী ঢেলাই চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, রণচণ্ডী, ওলাই চণ্ডী ইত্যাদি বহু বিচিত্র নামে এবং রূপে পূজিতা হয়ে থাকেন। চণ্ডীমঙ্গলের মঙ্গলচণ্ডী বিভিন্ন মূর্তিতে আবির্ভূতা। কালকেতুর নিকটে তিনি গোধারূপিণী, তৎপরে দশভুজা দুর্গা, আরণ্য পশুকুলের তিনি রক্ষয়িত্রী—আবার ধনপতির উপাখ্যানে তিনি কমলেকামিনী। পৌরাণিক চণ্ডীর রণরঙ্গিণী মূর্তি কদাচিৎ চোখে পড়ে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে—কলিঙ্গরাজ ও সিংহলরাজের সঙ্গে যুদ্ধকালে। অন্যত্র তিনি শান্তরূপা বরাভয়দাত্রী—মঙ্গলকারিণী। অনেকে মনে করেন, দেবীর উগ্ররূপ প্রকাশিত হওয়ার কামনায় তাঁকে মঙ্গলচণ্ডী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কথিত হয়েছে যে, মঙ্গলদান করার জন্য, মঙ্গলগ্রহ কর্তৃক পূজিত হওয়ার জন্য এবং মঙ্গল নামক নৃপতির পূজা লাভ করার জন্য তাঁর নাম হয়েছে মঙ্গলচণ্ডী। কালিকা পুরাণ বলছেন, মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডী পূজা কর্তব্য। এই কারণেও মঙ্গলচণ্ডী নাম হতে পারে। দ্বিজ মাধব, দ্বিজ রামদেব প্রভৃতি পূর্ববঙ্গীয় কবিদের কাব্যে মঙ্গল দৈত্য বধ করে দেবী মঙ্গলচণ্ডী আখ্যা পেয়েছেন। মঙ্গলচণ্ডী যে নারী-পূজিতা দেবতা, তা জানা যায় দেবী-ভাগবত থেকে ঃ

চণ্ডী

"রূপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্টদেবতা।"

বৈদিক গ্রন্থাবলীতে, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে দেবীচণ্ডীর উল্লেখ নেই। তবে কালিকাপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, দেবীভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতিতে চণ্ডীর প্রসংগ পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের মতে, চণ্ডী শব্দটি অষ্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে। ছোটনাগপুরের

'ওঁরাও' নামক আদিম জাতির মধ্যে শিকারীর সহায়িকা চণ্ডী নামে এক দেবতা পূজিতা হয়ে থাকেন। কালকেতু ব্যাধের কল্যাণদাত্রী চণ্ডী অনার্য চণ্ডী দেবতার প্রকারভেদ বলে অনেকে মনে করেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী বজ্রতারা লৌকিক মঙ্গলচণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু বজ্রতারার সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর সাদৃশ্য অল্প। অপরপক্ষে সাধনমালায় বর্ণিত সর্প, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি পশু সংশ্লিষ্টা বজ্রধাতেশ্বরী দেবীর সঙ্গে পশুকুলের দেবতা চণ্ডীর সাদৃশ্য আছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, অনার্য পূজিতা চাণ্ডী বৌদ্ধতন্ত্রে বজ্রধাত্বেশ্বরীর মধ্য দিয়ে পরবর্তী সংস্কৃত পুরাণে চণ্ডীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাঙ্গালাদেশে মঙ্গলচণ্ডী রূপ পরিগ্রহ করেছেন।

চণ্ডী শব্দ এবং দেবতা যদি মূলতঃ আর্যেতর সমাজ থেকে এসে থাকে তা হলেও একথা সত্য যে বৈদিক যুগ থেকে নারী (শক্তি) দেবতার যে বিবর্তন ঘটেছে তা আধুনিক কালে মহিষমর্দিনী দুর্গা বা চণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন। চণ্ডী দেবী দুর্গারই রূপান্তর হিসাবে সর্বত্র গৃহীত এবং পূজিত হচ্ছেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে স্তুতা অরণ্য ও পশুর পালিকা অরণ্যানীই মঙ্গলচণ্ডী। তিনি বলেন: "অরণ্যানীই বহুশত শতাব্দের পথ বাহিয়া নানা কবি-কল্পনার রঙে ডুবিয়া ও নানা লোকভাবনার পাকে জড়াইয়া পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গলের অধিদেবী মঙ্গলচণ্ডীরূপে দেখা দিয়াছেন।"

শিবের এক নাম পশুপতি। মোহেন-জো-দারোতে তিনি পশুবেষ্টিত পশুপতি রূপেই সৃষ্ট হয়েছেন। চণ্ডী-দুর্গা-উমা শিবপত্নী শিবানী। পশুপতি-পত্নী পশুর কল্যাণকারিণী দেবী হবেন—এতেও আশ্চর্যের কিছু নেই। চণ্ডীর অপর মূর্তি কমলেকামিনীর সঙ্গে গজলক্ষ্মীর সাদৃশ্য প্রচুর। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ধনদাত্রী গজলক্ষ্মীর পূজার নিদর্শন মেলে ভারহূত স্তূপে। লক্ষ্মীর মত মঙ্গলচণ্ডীও ধনদাত্রী। চণ্ডীমঙ্গলের এক নাম জাগরণ পালা। লক্ষ্মীও কোজাগরী রূপে পূজিতা হন। চণ্ডীদেবতার রূপকল্পনায় সরস্বতীর প্রভাবও

কম কার্যকরী নয়। বৈদিক সরস্বতী বিদ্যাদেবী কিন্তু ধনসম্পদদাত্রী এবং আর্যগণের রক্ষয়িত্রী। সরস্বতী সারদা—চণ্ডীমঙ্গলের নাম সারদামঙ্গল। দেবী অভয়া বলেই অভয়ামঙ্গল। ধর্মপূজাবিধান নামক গ্রন্থে মঙ্গলচণ্ডী সরিৎ তীরে সমুৎপন্না। বাশুলী দেবী বাগীশ্বরী বা সরস্বতীর অপভ্রংশ বলে অনেকের বিশ্বাস। কাশীর বাগীশ্বরী মন্দিরে সরস্বতী সিংহবাহিনী। ছাতনায় বাসলী অসুরোপরি দণ্ডায়মানা। তন্ত্রশাস্ত্রে চণ্ডীর তিনরূপের মধ্যে সরস্বতী অন্যতমা। লক্ষণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে নির্মিত গজলক্ষ্মী মূর্তির পাদদেশে সিংহ। তন্ত্রশাস্ত্রে নীলসরস্বতীর বর্ণনা আছে,—এরই অপর নাম ভদ্রকালী। বৃহন্নীলতন্ত্রে আছে, সরস্বতী রাঢ়দেশে মঙ্গলচণ্ডী নামে পূজিতা। এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে বৈদিক সরস্বতী ও অরণ্যানী গজলক্ষ্মীও পৌরাণিক চণ্ডীর গুণাবলী গ্রহণ ক'রে মঙ্গলচণ্ডীর রূপ গ্রহণ করেছেন। মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে মনসার সংশ্লেষ ডঃ সুকুমার সেন প্রতিপাদন করেছেন।

কালকেতুর উপাখ্যানে চণ্ডিকা গোধারূপ ধারণ করেছিলেন। রূপমণ্ডল নামে প্রতিমা শাস্ত্রে গৌরীকে গোধাসনা বলা হয়েছে। এই গোধাসনা দেবীই গৃহে মঙ্গলচণ্ডীকা রূপে পূজিতা হন। প্রাচীন ভাস্কর্যেও গোধাসনা গৌরী-মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে চণ্ডীর দ্বিবিধ মূর্তির এবং চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনীরই উল্লেখ আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে গোধা কোন কোন অনার্য জাতির প্রতীক (totem) ছিল। দেবী অনার্য প্রভাবে গোধারূপিণী বা গোধাবাহিনী হয়েছেন।

ধর্মরাজ ঃ

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম ধর্মরাজের পূজাকে বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি বলে ঘোষণা করেন। অমরকোষে ধর্ম শব্দের এক অর্থ বুদ্ধ। করচরণহীন নিরাকার নিরঞ্জন পুণ্যমূর্তি ধর্মঠাকুর। ধর্মঠাকুরের গোলাকার প্রস্তরমূর্তি বৌদ্ধ শূন্যবাদের সাদৃশ্যবাহক, আবার বৌদ্ধ চৈত্যের সঙ্গেও সাদৃশ্যসূচক। মাণিক গাঙ্গুলীর কাব্যে ধর্মঠাকুর শূন্যমূর্তি। ধর্মপূজক ডোম

জাতিকেও রূপান্তরিত বৌদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। হরপ্রসাদ ধর্মের সঙ্গে ধ্যানী বুদ্ধের অভিন্নতা স্বীকার করেছেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্মঠাকুরকে অনার্য দেবতা কূর্মবাচক 'দরম্' থেকে এসেছে বলে অনুমান করেছেন।

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (২য় সং) ধর্মরাজকে সূর্যদেবতা বলে গণ্য করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণে তিনি ধর্মঠাকুরকে বৈদিক বরুণ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। বরুণ রাজা, ধর্মঠাকুর ও রাজা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বরুণ সম্পর্কিত হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী ধর্মমঙ্গলে রূপান্তরিত হয়ে স্থানলাভ করেছে। বরুণ ধবল, ধর্মঠাকুর নিরঞ্জন। ডঃ সেনের মতে, ধর্মের গাজনের সঙ্গে রাজসূয় ও অন্যান্য বৈদিক যজ্ঞের মিল আছে।

প্রকৃতপক্ষে সূর্যদেবতার সঙ্গেই ধর্মঠাকুরের সাদৃশ্য অধিকতর। কোন কোন পণ্ডিত ধর্মঠাকুরকে প্রাগার্য জাতি পূজিত সূর্যদেবতা রূপে গ্রহণ করেছেন। ধর্মঠাকুরের গোলকার মূর্তির সঙ্গে সূর্যের সাদৃশ্য আছে। ধর্মঠাকুরের এক মূর্তি কূর্ম, সূর্যকেও কূর্ম বলা হয়ে থাকে। সূর্য ও ধর্ম উভয়েই শুভ্রবর্ণ। সূর্যদেবের রোষে কুষ্ঠরোগ হয়, সন্তোষে রোগমুক্তি ঘটে। ধর্মঠাকুর সম্পর্কে একই বিশ্বাস প্রচলিত। ধর্মঠাকুর মহামদকে কুষ্ঠরোগ দান করেছিলেন ও পরে মুক্ত করেছিলেন। ঘনরামের কাব্যে ধর্মের শালে ভর দিয়ে রঞ্জাবতী দেহত্যাগ করলে নারীহত্যার পাপ সূর্যকে আক্রমণ করেছিল।

পৌরাণিক শিব এবং লৌকিক শিবও ধর্মপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন। ধর্ম ও শিব—উভয়েরই গাত্রবর্ণ শুভ্র। শিবের গাজন ধর্মের গাজনে পরিণত হয়েছে। কোন কোন স্থানে শিবের গাজনে ধর্মমঙ্গলকাব্য পাঠ করা হয়।

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বিষ্ণুর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। বিষ্ণুর কূর্মাবতার ধর্মের কূর্মরূপের মূল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে কখনও কখনও ধর্মও কৃষ্ণ-বিষ্ণু অভিন্নরূপে প্রতিপাদিত হয়েছেন। রঞ্জাবতীর প্রার্থনায় ধর্মরাজ বিষ্ণুরূপ ধারণ করেছিলেন। ধর্মঠাকুরের উপরে পুরাণবর্ণিত বিষ্ণু-কৃষ্ণের কীর্তিকলাপ

আরোপিত হয়েছে। কখনও বা ধর্মরাজকে রামচন্দ্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। রামচন্দ্র ও ধর্মরাজ উভয়েরই হনুমান সহায়ক।

পরবর্তী কালে তুর্কী প্রভাবও লক্ষিত হয় ধর্মরাজ্যে যোদ্ধবেশে অশ্বারোহী মূর্তি কল্পনায়। ধর্মরাজের আকারে এবং প্রকারে বহুতর দেবদেবী মিশ্রিত হয়ে গেছেন।

অপ্রধান দেবতা ঃ

শীতলা ঃ মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান শাখাগুলির মধ্যে ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল এবং রায়মঙ্গল উল্লেখযোগ্য। শীতলা ষষ্ঠী এবং দক্ষিণরায় হিন্দু সমাজে অপ্রধান দেবতা। শীতলা বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং বসন্তরোগনাশিনী। স্কন্দ-পুরাণে শীতলা বিস্ফোটকাদির নিরাময়কর্ত্রী এবং শিশুপালিকা। পিচ্ছিলতন্ত্রে শীতলা রাসভস্থা শ্বেতাঙ্গী এবং বিস্ফোটকাদির তাপ প্রশমনকারিণী। কেউ কেউ বৌদ্ধতন্ত্রের হারিতীদেবীর সংগে শীতলার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে থাকেন। দাক্ষিণাত্যে গ্রাম্য জলদেবী শীতলাম্মা বসন্তরোগনাশিনী। শীতলাম্মা ও বাঙ্গালার শীতলার সংযোগ অসম্ভব নয়। কিন্তু শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবীকুলের আকার-প্রকারের সাদৃশ্য এত স্পষ্ট যে মনে হয় এঁরা আদিতে একই ছিলেন, পরে গুণগত পার্থক্য হেতু পৃথক হয়েছেন।

ষষ্ঠী ঃ ষষ্ঠী ও শীতলা প্রায় অভিন্না। ষষ্ঠীর অপর নাম দেবসেনা। তিনি দেব সেনাপতি কার্তিকেয়ের পত্নী। ষষ্ঠী বালাধিষ্ঠাত্রী দেবী। শিশুজন্মের ষষ্ঠ দিনে পূজিতা হওয়ার জন্যই তাঁর নাম ষষ্ঠী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও দেবীভাগবত প্রভৃতিতে ষষ্ঠীর উল্লেখ আছে। বৌদ্ধতন্ত্রের হারিতীদেবীর সঙ্গেও ষষ্ঠীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

দক্ষিণরায় ঃ দক্ষিণরায় দক্ষিণদিকের রাজা। ইনি ব্যাঘ্র দেবতা। দক্ষিণ বঙ্গের ব্যাঘ্র অধ্যুষিত অঞ্চলে ইনি পূজিত হয়ে থাকেন। ইনি ব্যাঘ্রভয় দূর করেন। দক্ষিণদিকের অধিপতি যমরাজের সঙ্গে দক্ষিণরায়ের সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

মঙ্গলকাব্য জাতীয় কাব্য ঃ

মঙ্গলকাব্যে যে সকল দেবতার মহিমা কীর্তিত হয়েছে—যাঁরা পণ্ডিত-সমাজে সাধারণতঃ লৌকিক দেবতা নামে খ্যাত, তাঁদের পূজা আদিতে আধিব্যাধি, ভয়ভীতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হলেও ক্রমে এঁরা সাম্প্রদায়িক গণ্ডি অতিক্রম করে বাঙ্গালার সর্বজনীন দেবতায় পরিণত হয়েছেন এবং সর্বজনের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করেছেন। এই সব দেবতাদের বাঙ্গালী আপনজন বলে গণ্য করেছে এবং এঁদের পূজা উপলক্ষ্যে উৎসবে মেতে উঠেছে—দেবতার কাছে নিবেদন করেছে নিজের কামনা বাসনা। এই দেবতাদের কেন্দ্র করে যে কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, কত কত কবি সেই কাহিনীকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন চার পাঁচ শত বৎসর ধরে,—গতানুগতিক কাহিনীকে আশ্রয় করে অনেকেই রেখে গেছেন স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর। এই সকল উপাখ্যানে বিচিত্র চরিত্র এসে ভিড় করেছে। কতকগুলি চরিত্র বাঙ্গালার সমাজের নিত্যকালের সামগ্রী। এদের কাহিনী বাঙ্গালার মানুষ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শুনেছে। একই বিষয় কখনও পুরাতন হয়ে যায়নি। বাঙ্গালী মঙ্গলকাব্য থেকে পেয়েছে সাহিত্যরস—জীবনের শিক্ষা—আধ্যাত্মিক তৃপ্তি। সনকার বাৎসল্য, বেহুলার পাতিব্রত্য, চাঁদ সওদাগরের দুর্জয় তেজ,—লাউসেনের বীরত্ব, পতিব্রতা ফুল্লরার দারিদ্র্যপীড়িত জীবন—কালকেতুর সরল আদিম জীবন, ভাঁড়ুদত্তের শঠতা, খুল্লনা-লহনার বিবাদ—বাঙ্গালী মনকে চিরকাল আনন্দ দিয়েছে। সংস্কৃত পুরাণ অপেক্ষা বাঙ্গালা পুরাণ মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙ্গালীর অধিকতর আনন্দের সামগ্রী। রামায়ণের সীতার চেয়ে বেহুলা বাঙ্গালীর কাছে অনেক বেশী আপনার জন। শিবায়ন কাব্যে জামাতা শিবের দারিদ্র্যে কন্যার পিতামাতার উদ্বেগ—অভাবের সংসারেও চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় ভোজনের বিলাসিতা,—মনসামঙ্গলে বিধবা পুত্রবধূ বেষ্টিতা সনকার হাহাকার প্রভৃতি নিত্যকালের সামগ্রী। হরপার্বতীর গৃহস্থালীতে বাঙ্গালী দেখেছে নিজের ছবি। দেবতাকে সে করে নিয়েছে

কাছের মানুষ—আত্মার আত্মীয়। দেবতা স্বর্গের নন্দনকানন ত্যাগ করে নেমে এসেছেন বাঙ্গালীর মাটির কুটীরে তার সুখদুঃখের অংশ নিতে। অলৌকিক কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে বাঙ্গালার কবি এঁকেছেন মন-প্রাণ ভরে বাঙ্গালা দেশের সমাজ জীবন ও গার্হস্থ্য জীবনের ছবি ;—আধ্যাত্মিক রসের সঙ্গে মিশেছে বাস্তব রস,—বাঙ্গালীর মনপ্রাণ তৃপ্ত হয়েছে—তার ঘটেছে আত্ম-সাক্ষাৎকার। সাহিত্যের সঙ্গে মানবজীবনের যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যে—এমনটি আর কোথাও পাওয়া যাবে না ; বিশেষতঃ সে যুগে। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের বহুমূল্য তথ্যসমৃদ্ধ এই কাব্যগুলি। জাতীয় জীবনের সঙ্গে এই যে সুনিবিড় যোগ—তজ্জন্যই মঙ্গলকাব্যগুলি জাতীয় কাব্যরূপে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত।

মঙ্গলকাব্যে অলৌকিকতা ঃ

অলৌকিকতা প্রাচীন কাব্যের একটা বিশিষ্ট ধর্ম। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই অলৌকিকতা বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। ঘটনায় অলৌকিকতা এবং চরিত্রগুলিতে অলৌকিক গুণের সমাবেশ—এই দুই ভাবে মঙ্গল-কাব্যগুলি এক অলৌকিক রসানুভূতির উৎস হয়ে আছে। যদিও চরিত্রে এবং ঘটনায় বাস্তবধর্মিতা মঙ্গলকাব্যে সুপ্রকট, তথাপি দেবমহিমা কীর্তনই যে কাব্যের উদ্দেশ্য—দেবতার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ ঘটনার মাধ্যমে অথবা পরোক্ষে দেবভক্তের অসাধারণ শক্তিসামর্থ্যের বর্ণনায় দেবতার উত্তুঙ্গ মহিমা সে কাব্যে বর্ণনা না করে উপায় থাকে না। সর্ব দেশে সর্ব কালেই ঈশ্বর অথবা দেবতা কিংবা অনন্য শক্তিসম্পন্ন মর্তের মানুষ সম্পর্কে অতিলৌকিক শক্তিমত্তায় বিশ্বাস মানবমনে সঞ্চিত থাকে। তা থেকে সৃষ্টি হয় নব নব কাহিনী—যে সকল কাহিনী কখনও বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক-বিমুখ,—কখনও বাস্তবাশ্রিত হয়েও বাস্তবাতীত অতিলৌকিকতায় উত্তরিত। আধুনিক যুগে শিক্ষার প্রসার ও বৈজ্ঞানিক চেতনার ফলে মানুষের মন

যুক্তিবাদে নির্ভরশীল। তথাপি বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার যুগেও আমাদের দেশের মানুষ অলৌকিকতায় বিশ্বাসপ্রবণ। প্রাগাধুনিক কালে অদূর অতীতে —প্রাচীন ও মধ্য যুগে পৃথিবীর সকল দেশে প্রায় সকল মানুষই দেবদানব এবং মহামানবের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। তাই অলৌকিকতা সর্ব দেশেই প্রাচীন ও মধ্য যুগীয় সাহিত্যে স্থানলাভ করেছে। সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে এবং কোলরিজের কাব্যে অলৌকিকতার অভাব নেই। সেকালের মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতাই এর জন্য দায়ী। দেশ কাল এবং সমাজ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। মানুষ নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সাহিত্যের দর্পণে। সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্য অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলকাব্যগুলিতেও অলৌকিক ঘটনা ও চরিত্রের অভাব নেই। চাঁদ সওদাগরের উপরে মনসার নির্যাতন,—বেহুলার মৃতপতি নিয়ে স্বর্গ যাত্রা,—নেতা ধোপানীর কার্যাবলী,—স্বর্গে নৃত্যগীতে দেবতাদের তুষ্ট করে মৃতপতি ও পতির অগ্রজদের জীবনলাভ—চণ্ডীমঙ্গলে গোধিকার দশভুজা রূপ পরিগ্রহ,—দেবীর বৈরীশাসন,—ধনপতি ও শ্রীমন্তের কমলেকামিনী দর্শন—ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের কীর্তিকলাপ—সবই সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। বাস্তব জীবনবোধ এইসকল ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও অলৌকিক ঘটনাগুলি ছাড়া মঙ্গলকাব্যগুলি যেন কল্পনাতেই আনা যায় না। তা ছাড়া মঙ্গলকাব্যগুলি সংস্কৃত পুবাণের আদর্শে রচিত। সংস্কৃত পুরাণে দেবমাহাত্ম্য কীর্তনের উদ্দেশ্যে অজস্র অলৌকিক কাহিনী রচিত হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতে অলৌকিক কাহিনীর ভিড় কাটিয়ে উঠতে গেলে কিছুই থাকে না। হোমারের ইলিয়াড্ থেকে দেবতাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বাদ দিলে কি তার কিছু অবশিষ্ট থাকে ?

যুগধর্ম অনুযায়ী সাহিত্য রচিত হয়। মঙ্গলকাব্যের যুগে অলৌকিকতা বর্জিত নিছক বাস্তব কাহিনী আশা করা বাতুলতা। এ যুগের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সে যুগের সাহিত্য বিচার করা যুক্তিযুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ সম্পর্কে মন্তব্যটি স্মর্তব্য: 'ভারতবর্ষ রামায়ণে অতিপ্রাকৃতের আতিশয্য দেখে নাই।'

বাঙ্গালার মঙ্গলকাব্য সম্পর্কেও এ কথা সত্য। অতিপ্রাকৃত মনে করলে চার পাঁচ শ বছর ধরে কাব্যগুলি বাঙ্গালাদেশের জনমানসকে অধিকার করে থাকতো না--আজকের দিনেও এগুলি আদরের সঙ্গে পঠিত হোত না। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাস্তবতা, সমাজবোধ এবং মানবতা কাব্যগুলিকে সর্বযুগের সর্বসময়ের জন্য আস্বাদনীয় করে তুলেছে। অলৌকিক ঘটনা অথবা ধর্মীয় পটভূমি সাহিত্য রসাস্বাদনের কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি।

পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য ঃ

সেন রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবহেতু সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণগুলি এদেশে উচ্চ মহলে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহলে স্থান দখল করেছিল। এমনকি মুসলমান শাসকবর্গও যে এই সকল কাহিনীর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরাগল খান ও ছুটী খানের সভায় মহাভারত পাঠ এবং মহাভারতের বঙ্গানুবাদের শুভ সূচনা থেকে। গীতগোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকেও পৌরাণিক আবহাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। অপর পক্ষে পঞ্চদশ শতকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনা থেকে অনুমান হয় যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে পঞ্চদশ ষোড়শ এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালাদেশে পৌরাণিক আবহাওয়া বর্তমান ছিল। রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদি পাঁচালীরূপে যে গীত হোত তাও বোঝা যায় রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদির ব্যাপক অনুবাদ থেকে। সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন থাকলেও সাধারণ মানুষ সংস্কৃতের মধ্যে প্রবেশাধিকার পায়নি। অনুবাদ এবং পাঁচালী গানও সম্ভবতঃ সকল মানুষকে সমান তৃপ্তি দিতে পারেনি। তাই প্রয়োজন হয়েছিল বাঙ্গালা দেশের সমাজে ব্যাপক ভাবে পূজিত অথবা স্ত্রীলোকের দ্বারা পূজিত দেবতাদের প্রসংগে প্রচলিত কাহিনী বা ব্রতকথাগুলিকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালী মানসের উপযোগী নব-পুরাণ রচনা করার—যার রসাস্বাদন সর্বজনের মনোধর্মের অনুকূল।

একদিকে যেমন লৌকিক দেবতাদের পৌরাণিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ; অপরদিকে তেমনি নব পুরাণ রচনার মধ্য দিয়ে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সর্বজনের রসপিপাসা তৃপ্ত হয়েছে। এই যে নবপুরাণ যার নাম দেওয়া হয়েছে মঙ্গলকাব্য সেগুলি সংস্কৃত পুরাণেরই বংশধর। সুতরাং সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবমুক্ত নয়। সংস্কৃত পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ নব পুবাণে মেনে চলা হয়নি বটে তথাপি সংস্কৃত পুরাণের প্রকৃতি অনুসরণের চেষ্টা এখানে প্রত্যক্ষগম্য। মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি-প্রকরণ সংস্কৃত পুরাণ অনুসরণের ফল। বহু ঘটনা এবং চরিত্র রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ অনুসারে কল্পিত হয়েছে। এমনকি বৈদিক কাহিনীতে কিছু কিছু এসে পড়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর্মমঙ্গল কাব্যের শরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী উল্লেখ করা যায়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন : "মধ্যযুগের এই মঙ্গলকাব্যগুলিই রাঢ়দেশের রামায়ণ। রামায়ণের কাহিনী ও আদর্শকে সেখানে মঙ্গলকাব্যের গণ্ডির মধ্যে আনিয়া পরিবেশন করা হইয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যগুলিও পূর্ববঙ্গে রামায়ণের স্থান অধিকার করিয়াছিল। সীতার পাতি-ব্রত্যের আদর্শের তুলনায় বেহুলার পাতিব্রত্যের আদর্শই এ দেশের সমাজকে অধিকতর মুগ্ধ করিয়াছে।"

মনসা মঙ্গলকাব্যে বেহুলা চরিত্র যে সীতার আদর্শে পরিকল্পিত হয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সীতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে মহাভারতের সাবিত্রীর উপাখ্যান। সাবিত্রী মৃত্যুর (যমের) কাছ থেকে মৃতপতির জীবন ফিরিয়ে এনেছিলেন। আবার বেহুলার অগ্নিপরীক্ষা সীতার আদর্শে কল্পিত। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে খুল্লনার পরীক্ষা ও সীতার পরীক্ষার সাদৃশ্য বহন করে। বেহুলার উপাখ্যানটিতেও রামায়ণের প্রভাব পড়েছে। যৌবরাজ্যে অভিষেকের প্রাক্কালে সীতা স্বামীসহ বনে গেলেন। বহু দুঃখকষ্টের পরে যখন ফিরে এলেন স্বরাজ্যে, তখন তাঁকে প্রবেশ করতে হোল বসুমতীর গর্ভে। বেহুলাও বিয়ের রাত্রে বাসরঘরে স্বামী হারিয়ে পতির মৃতদেহ বুকে নিয়ে ভেসেছেন অজানার উদ্দেশ্যে। খুল্লনা ও লহনার মধ্যে সপত্নীবিবাদ এবং দুর্বলা দাসীর

মন্ত্রণা নিশ্চয়ই রামায়ণের কৌশল্যা-কৈকেয়ী ও মন্থরার কাহিনী-প্রভাবিত। পৌরাণিক প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক ধর্মমঙ্গল কাব্যে। লাউসেন ও কর্পূরসেন ভাগবতের কৃষ্ণবলরামের এবং মহামদ কংসের আদর্শে পরিকল্পিত। লাউসেনের বাল্যকালে বীরত্বব্যঞ্জক কার্যাবলী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সঙ্গে সাদৃশ্যব্যঞ্জক। লাউসেনের গৌড়গমনে ময়নাগড়ের অবস্থা কৃষ্ণের মাথুর বিরহে বৃন্দাবনের অবস্থার অনুরূপ। লাউসেনের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন রামায়ণের ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক মায়ামুণ্ড প্রদর্শনের অনুরূপ। মায়ামুণ্ড পালা যে রামায়ণের অনুস্মৃতি, একথা ঘনরাম স্বীকার করেছেন।

রচনা দেখিয়া মুণ্ড পরম আনন্দ।
কর্মীবরে করিল বকশিস শরবন্দ॥
তবে পাত্র আপনি ডাকিল ইন্দ্রজালে।
মায়ামুণ্ড সঁপি কিছু কন কুতুহলে॥
ময়নানগরে তুমি চল হে ত্বরিত।
রঘুনাথে যেমন ভাণ্ডিল ইন্দ্রজিত॥

এখানে লবসেন রামচন্দ্রের প্রতিমূর্তি। ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের যুদ্ধে রাম-রাবণের যুদ্ধের ছায়া পড়েছে। লাউদত্ত কর্মকার ও লাউসেনের উপাখ্যান গুহক ও রামচন্দ্রের কাহিনী মনে পড়িয়ে দেয়। ঘনরামের কাব্যে রামায়ণ মহাভারত পাঠের ও কাব্যকাহিনীর উল্লেখ যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। ধর্ম-মঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান ঐতরেয় ব্রাহ্মণের হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতের উপাখ্যানের সঙ্গে ভারত-পুরাণের হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যানের সংমিশ্রিত রূপ। এইভাবে দেখা যায় যে, মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন লৌকিক পৌরাণিক ও বৈদিক দেবতার সংমিশ্রিত দেবতার মহিমা কীর্তন করেছে, তেমনি কাহিনীতেও লৌকিক ও পৌরাণিক উপাদান সংমিশ্রিত করে পৌরাণিক আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে। সেইজন্য এই কাব্যগুলিকে বাঙ্গালীর নব পুরাণ বলা চলে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে মঙ্গলকাব্যগুলি

সমকালে অথবা পরবর্তীকালে রচিত বাঙ্গালা রামায়ণ মহাভারতকেও প্রভাবিত করেছে। তাঁর মতে, মহাভারতের দাতাকর্ণের উপাখ্যান এবং রামায়ণের হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ সংগ্রহের কাহিনীটি মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে গৃহীত হয়েছে। তিনি লিখেছন, "ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালাটিই সামান্য রূপান্তরিত হইয়া বাংলা মহাভারতের অনুবাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। লৌকিক রামায়ণের হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ সংগ্রহের কাহিনটি মনসামঙ্গলের শঙ্কর গারড়ীর কাহিনী হইতে গৃহীত।"

মঙ্গলকাব্য ও মহাকাব্য ঃ

মঙ্গলকাব্যগুলিতে মধ্যযুগের বাঙ্গালার মানুষ ও বাঙ্গালার সমাজ-জীবনের বিস্তৃত পরিচয় ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র। শুধু মধ্যযুগে কেন, আজকের পল্লীবাংলাতেও অনুরূপ চিত্রের অভাব নেই। তা ছাড়াও বাঙ্গালার রস-পিপাসা নিবৃত্ত করতে এগুলির আবেদন আজও নিঃশেষিত হয়নি। তাই মঙ্গলকাব্যগুলিকে জাতীয় মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া অযৌক্তিক নয়। মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ বিস্তৃতিবোধের অভাব এখানে লক্ষিত হয়। যদিও বাঁধাধরা কাহিনী অনুসরণের ফলে লেখকের কল্পনা পরিপূর্ণরূপে স্ফূর্তি পেতে পারে না—তথাপি বিচিত্র ঘটনা—বহুবিধ বর্ণনা—বহু চরিত্রের স্ব স্ব বিশিষ্টতা নিয়ে আনাগোনা—কোথাও বা যুদ্ধবিগ্রহ যুদ্ধসজ্জা—সর্বোপরি বাঙ্গালী জীবনের সুখ-দুঃখ-আশা আকাঙ্ক্ষা এবং বাঙ্গালীর সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তব চিত্র—কাব্যগুলিকে নিঃসন্দেহে বাঙ্গালীর জাতীয় মহাকাব্যের গৌরবে ভূষিত করতে পারে। তবে একথা ঠিক, মহাকাব্যের গঠন কৌশল ও আলংকারিক রীতি বিচার করলে মঙ্গলকাব্যগুলিকে মহাকাব্য পর্যায়ভুক্ত করা সম্ভব নয়। মহাকাব্যের একটা বিশিষ্ট আকার আছে। সেই আকারটি নির্মিত হয়েছে অলংকার শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়মের দ্বারা। কাব্যাদর্শ প্রণেতা আচার্য দণ্ডী এবং সাহিত্যদর্পণ প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাকাব্যের যে

লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, সেই হিসাবে মঙ্গলকাব্যগুলিকে কোনক্রমেই মহাকাব্য বলা চলে না। মহাকাব্যের দুইটি শ্রেণী। এক শ্রেণীর মহাকাব্য কবি-প্রতিভার সচেতন প্রয়াস। কালিদাস, ভারবী, মাঘ, মধুসূদন প্রভৃতির রচিত মহাকাব্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অপর শ্রেণীর মহাকাব্যকে স্বাভাবিক মহাকাব্য (Natural Epic) বলা হয়। রামায়ণ মহাভারত ও হোমারের ইলিয়াড্ ওডেসি এই শ্রেণীর মহাকাব্য। এই শ্রেণীর মহাকাব্যে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিভা অপেক্ষা বিশেষ একটা জাতির পরিচয়ই ব্যক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, এই জাতীয় মহাকাব্যে সমগ্র জাতিই আপন পরিচয় ব্যক্ত করে। মঙ্গলকাব্যগুলি এই শ্রেণীর মহাকাব্যেরও সগোত্র নয়। তবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙ্গালী জাতির একটা যুগের অথবা চিরকালের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে—এগুলিতে ব্যক্তি-প্রতিভার ছাপ থাকলেও কাহিনীগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়। এই দিক থেকে কিছুটা মিল আছে দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাকাব্যের সঙ্গে। পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের বিস্তৃতি এবং বীররস প্রাধান্য পায়, এখানে সামগ্রিকভাবে তাও পাওয়া যাবে না।

অলংকার শাস্ত্রোক্ত বিশিষ্ট নিয়ম নির্ধারিত গঠন কৌশলের একান্ত অভাব মঙ্গলকাব্যে। লাউসেন ও চাঁদ সদাগরের চরিত্রে মহাকাব্যোচিত ঔদার্য থাকলেও এদের ধীরোদাত্ত নায়ক বলে গ্রহণ করা চলে না। কালকেতু, ধনপতি তো কোনমতেই মহাকাব্যের নায়ক নয়। বিশিষ্ট কোন দেবতার পূজা প্রচারের জন্যই এই চরিত্রগুলির আবির্ভাব। স্ব স্ব কার্য সমাপন করে এরা স্বর্গলোকে প্রয়াণ করেছে। মহাকাব্যের নায়কোচিত গুণাবলীর সন্নিবেশ চরিত্রগুলিতে ঘটেনি। চারিত্রিক ঔদার্য এবং স্বাধীন বিকাশ, ব্যক্তিসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধকতা হেতু সম্ভব হয়ে ওঠেনি। উপাখ্যানের ঘটনাবলী এবং যুদ্ধবিগ্রহ নায়কনায়িকার জীবনের বন্ধুর পথে যাত্রার অনিবার্য পরিণতি নয়—দেবতার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে দেবতার ইচ্ছাতেই এগুলি সংঘটিত হয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহগুলি অধিকাংশ স্থলেই বীররস সৃষ্টি

করেনি। ধর্মমঙ্গল কাব্য ছাড়া অন্যত্র দেবতা স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। মহাকাব্যের বস্তুনিষ্ঠা মঙ্গলকাব্যে থাকলেও তা' দেবমহিমা প্রচারের আয়োজনে সর্বত্র সুসমঞ্জস সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। কাহিনী সুসংবদ্ধ হয়ে একটা নিটোল অবয়বও লাভ করতে পারেনি। অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে একটি বাস্তবসম্মত পূর্ণতাদানে সক্ষম হয়নি।

কাব্যগুলি সাধারণতঃ করুণরসসিক্ত। মনসামঙ্গল তো করুণ রসের আকর। ধর্মমঙ্গল বীররসের কাব্য হলেও নায়কের বীরত্ব অপেক্ষা দেবতার মহিমাই সর্বত্র প্রকট। স্থানে স্থানে আদিরসের বাড়াবাড়ি মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ করেছে। রসসৃষ্টিও সর্বত্র ভাব সমুন্নতি লাভ করেনি।

কাব্যগুলি গানের উদ্দেশ্যে রচিত। অনেক ক্ষেত্রে কাব্যের অংশবিশেষ গীতিকাব্যের সমধর্মী হয়ে ওঠে। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর মানসপ্রবণতাই মঙ্গল-কাব্যগুলির খাঁটি মহাকাব্য হওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। গতানুগতিক কাহিনী এবং বাঁধাধরা রীতি কবির স্বচ্ছন্দ লেখনী চালনার স্বাধীনতা খর্ব করায় নির্দিষ্ট পথে কাব্যগুলি আবর্তিত হয়েছে। কাব্যগুলি গীতিময় আখ্যায়িকা কাব্য হয়েছে, মহাকাব্য হয়ে ওঠেনি। তথাপি মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত পটভূমি—ঘটনার বৈচিত্র্য—কাহিনীর বিরাটত্ব বর্ণনায় ঔদার্য—বহুবিধ চরিত্রের সমবায়—বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ,—দেশকাল ও সমাজের প্রতিফলন—কোন কোন ক্ষেত্রে নায়ক চরিত্রের মহত্ত্ব মঙ্গলকাব্যগুলিকে মহাকাব্যের নিকটবর্তী করেছে। এগুলি যে আধুনিক যুগের মহাকাব্য রচনার পটভূমি রচনা করেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবপদাবলী ঃ

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে মহাকবি জয়দেব গীতগোবিন্দম্ নামে নাট্যগীতি বা গীতিনাট্য রচনার পর থেকে তাঁরই প্রেরণায় বড়ু চণ্ডীদাস ও পরবর্তী পদাবলীর চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও তাঁদের অনুসরণকারী বৈষ্ণব কবিগণ বৈষ্ণব

কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সরাসরি জয়দেবের অনুস্মৃতি পরিলক্ষিত হয়। গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একটি আখ্যায়িকা আছে। আখ্যায়িকাটি কতকগুলি পালায় বিভক্ত। এগুলি অভিনয় ও গানের উদ্দেশ্যে রচিত। আখ্যায়িকামূলক পালায় বিভক্ত এবং গীতোদ্দেশ্যে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে এই দুখানি কাব্যের সাদৃশ্য আছে। অবশ্য প্রকৃতিগতভাবে গরমিলও এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট। গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে নাট্যধর্মিতা আছে, মঙ্গলকাব্যে তা প্রায় অনুপস্থিত। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান বৈষ্ণব কবিবৃন্দ যে রাধাকৃষ্ণ পদাবলী রচনা করেছেন আকৃতি এবং প্রকৃতির দিক থেকে গীতগোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে তাদের যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি সুদুস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছে এই যুগে সমান্তরালভাবে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে। বৈষ্ণব কবিরা প্রায় সকলেই নিষ্ঠাবান ভক্ত—আরাধ্য-চরণে আত্মনিবেদনের উদ্দেশ্যেই তাঁরা রচনা করেছেন প্রেমগীতিহার। এগুলি সত্যই 'বৈকুণ্ঠের তরে'। কবিগণ নিজের মনেব মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেছেন এই সঙ্গীতগুলি। বৈষ্ণব পদাবলী তাই সম্পূর্ণ আত্মনিষ্ঠ। বাহ্যিক ঘটনা .বা বর্ণনার স্থান এখানে একেবারেই সংকুচিত। কবির স্বাধীনতাও খর্বীকৃত। উজ্জ্বল নীলমণি—নির্দিষ্ট পথে গতানুগতিক রীতি অনুসরণ করে রসপর্যায় অনুসারে কবিকে চলতে হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের মত পদাবলীও গানের উদ্দেশ্যই বিরচিত। গানের প্রকৃতি এবং শ্রোতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং ভক্ত ভাবুকজন ভিন্ন পদাবলীর রস পরিপূর্ণভাবে আর কারো পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। পদাবলী সম্পূর্ণ গীতিময়,—অথবা বলা যেতে পারে গীতিসর্বস্ব। আখ্যায়িকা এখানে একটা থাকলেও তা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং অন্তরালবর্তী। অপরপক্ষে মঙ্গলকাব্য বস্তুনিষ্ঠ। দেশ-কাল-সমাজের নিখুঁত বাস্তব বিবরণ মঙ্গলকাব্যে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, মধ্যযুগীয় অন্য কোন কাব্য-সাহিত্যে তা দুর্লভ। এমনকি চৈতন্যভাগবত ছাড়া অন্যান্য চৈতন্য

জীবনীগুলিতেও সমকালীন সমাজ উপেক্ষিত হয়েছে। চৈতন্যভাগবতেও বিশেষ ভাগবত দৃষ্টি কবির মনকে আচ্ছন্ন করায় সমকালীন সমাজচিত্র পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট হতে পারেনি। পদাবলীর কবি সখীভাবে বিশেষ ভাবতন্ময় দৃষ্টিতে গীতারতি করেছেন ইষ্টদেবের। সুতরাং এখানে বাহ্য জগৎ উপেক্ষিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য আখ্যায়িকা প্রধান। মঙ্গলকাব্যের কাহিনী প্রায় একরূপ হওয়ায় বিভিন্ন কবি বর্ণিত চরিত্রগুলি প্রায় সমরূপ হওয়া সত্ত্বেও কবির বাস্তব দৃষ্টি সাধারণতঃই চরিত্রগুলিকে বাস্তবানুরূপ করে তুলেছে। চাঁদ সদাগর, সনকা, মা মেনকা, গিরিরাজ, উমা, শিব, নারদ, ফুল্লরা, কালকেতু, খুল্লনা, লহনা, ভাঁড়ু দত্ত, মুরারী শীল, মহামদ, রঞ্জাবতী, প্রভৃতি মনুষ্যচরিত্র বাঙ্গালী সমাজ সংসারের চিরন্তন বাস্তব মানুষ। এমনকি, চণ্ডীমঙ্গলের পশুচরিত্রগুলিও বাস্তব সমাজের আভাস বহন করে। মুসলমান শাসকের অত্যাচার, অরাজকতা, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা,—ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা, নারীর অলংকারপ্রিয়তা, অলংকরণ ও সজ্জার বিবরণ, নিম্নবিত্ত সমাজের দারিদ্র্য, সপত্নী কলহ কুলীনবৃদ্ধ বরে কন্যা সমর্পণে পিতা-মাতার মনোবেদনা, বণিক ও শবর প্রধান বাঙ্গালার সমাজ, সম্পন্ন গৃহস্থের পারাবত খেলা, বাঙ্গালীর শিল্প কর্ম, কৃষিকার্য প্রভৃতি অজস্র বস্তুনিষ্ঠ ঘটনা ও বর্ণনায় মঙ্গলকাব্যগুলি সর্বজনের ও সর্বকালের উপভোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের লেখকগণ সকলেই সম্ভবতঃ ভক্ত ছিলেন; ভক্ত হলেও তাঁরা সকলেই কাব্যবর্ণিত দেবতার উপাসক ছিলেন না। যাঁরা নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিলেন তাঁদেরও ধর্মমত ছিল উদার, পরমতসহিষ্ণু এবং সমন্বয়ধর্মী। এমনকি মুসলমান পীরও তাঁদের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হননি। পদাবলীর কবিগণের সকলেরই ধর্মমত সম্পর্কে এই উদারতা ছিল না। মঙ্গলকাব্যগুলি গানের উদ্দেশ্যে রচিত, এ গীত বৈষ্ণব পদাবলীর কীর্তনগান অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকাশ্য আসরে শ্রোতৃবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে প্রধান গায়ন দোহার ও বাদকের সহযোগিতায় চামর হাতে পায়ে নূপুর বেঁধে

নৃত্যগীতের সাহায্যে পরিবেশন করতেন মঙ্গলগীত। কোন বিশেষ ভাবদৃষ্টি এবং রসশাস্ত্রের জ্ঞানাভাবে কোন শ্রোতার মঙ্গলগীতি আস্বাদন ব্যাহত হোত না। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সর্বজন এই গান শোনার অধিকারী হতেন। বৈষ্ণব কবির মত কামনাশূন্য হয়ে রাধাকৃষ্ণলীলারস আস্বাদন অথবা বৈকুণ্ঠের সাযুজ্যলাভ কামনা নিয়ে মঙ্গলকাব্যের কবি কাব্য রচনা করতেন না। তাঁদের দৃষ্টি জীবনবিমুখ নয়, জীবনমুখী। কাব্যে যেমন দেবতা উপলক্ষ্য হয়ে মানুষ হয়েছে লক্ষ্য, কবিও তেমনি দেবতার কাছে কামনা করেছেন ধন, জন, সম্পদ, পুত্র, পরিবার ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য। ভারতচন্দ্রের ঈশ্বর পাটনী অন্নদার কাছে বাঙ্গালীর অন্তর কামনাটি ব্যক্ত করেছেঃ "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" ভোগের মধ্য দিয়ে দেবারাধনা ছিল মঙ্গলকাব্যের জীবন দর্শন।

বাস্তববিমুখ বৈষ্ণব কবিগণ যদিও আরাধ্যের ধ্যানে তন্ময়, তথাপি তাঁদের বাঁধাধরা রীতির মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে দেশ ও সমাজ কিছু কিছু আত্মপ্রকাশ না করে পারেনি। যে মানবতাবোধ বাঙ্গালার জল হাওয়ার বৈশিষ্ট্য, বৈষ্ণব কবি তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেননি। বর্ষায় বঙ্গ-প্রকৃতির ভয়াল মধুর চিত্র—কদম্বশোভিত শীর্ণ নদীতট—বর্ষার জলে পঙ্কিল পিচ্ছিল সর্পসংকুল পথঘাট—পারিবারিক জীবনে ভীরু বালিকাবধূর প্রতি শাশুড়ী ননদীর বিরূপ মনোভাব—বাঙ্গালী মেয়েদের পুকুর ঘাটে গাগরী ভরণে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা—রাখালের মেঠো বাঁশীর সুর বাঙ্গালার কবি মনকে কি না ভুলিয়ে পারে? তাই ত মহাকবি রবীন্দ্রনাথের এ জিজ্ঞাসাঃ

সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা হতে পেয়েছিলে এ প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এ প্রেমগান
বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।

তবু এ কথা অবিসংবাদিতরূপে সত্য যে, যে খোলা চোখে মঙ্গলকাব্যের কবি দেখেছেন দেশ কালকে,—যে সমাজজ্ঞান ও বাস্তববোধ তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে, আত্মভাবতন্ময় বৈষ্ণব কবির রচনায় তার ভগ্নাংশও নেই—আশা করাও সমীচীন নয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন : "এক হিসাবে বৈষ্ণবকাব্যকে মঙ্গলকাব্যের পরিপূরক বলা যাইতে পারে। বাংলার সমাজের ব্যক্তিহৃদয়ের যে আবেগ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহাই বৈষ্ণবকাব্যের শতমুখী ধারায় স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে। একদিকে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যেমন মধ্যযুগের বাংলার সমষ্টি জীবন প্রতিফলিত হইয়াছে, তেমনি আর এক দিক দিয়া বৈষ্ণব কবিতায় ব্যষ্টি হৃদয়ের একান্ত সুখদুঃখের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে।"

যদিও মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবপদাবলী স্বরূপতঃ এবং তত্ত্বতঃ বিভিন্ন, তথাপি বৈষ্ণবীয় প্রভাব মঙ্গলকাব্যের কবিরা অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁরা প্রায় সকলেই কলি-অবতার শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করেছেন। কোন কোন কবির কাব্যে পদাবলীর সাদৃশ্যে রচিত বিষ্ণুপদ পাওয়া যায়। বিষ্ণুপদগুলিতে পদাবলীর প্রভাব সুমুদ্রিত। দ্বিজ মাধব একটি বিষ্ণুপদে সিংহলযাত্রার প্রাক্কালে খুল্লনার মনের বেদনা শচীমাতার মনের বেদনার সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন :

রহাঅ রহাঅ নদীয়ার লোক
বৈরাগে চলিল দ্বিজমনে।
কেমতে ধরাইব প্রাণ শচী ঠাকুরাণী॥
আগম পুরাণ পোথা লইয়া বাম করে।
করঙ্গ বান্ধিল গোরা কটির উপরে॥
নিজপুর হতে গোরা নদীতীরে যায়ে
আউলাইয়া মাথার কেশ শচী পাছে ধায়ে॥

দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গলের ধূয়াগুলিও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব ঘোষণা করছে। যেমন--

দয়ার নিধি এবে সে জানিলুম।
ধনজন যৌবন গরবে ভুলিয়া
মিছা রঙ্গে জনম গোয়াইলুম॥

অথবা—

দেখ গোরাচান্দের বাজার।
সুরধনি নদীতীরে নীলগিরি উপরে
প্রেম মেহু রত্নের পসার।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের উপরে সমধিক লক্ষিত হয়। চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী যদিও অভয়া বরদা--তথাপি তিনি উগ্ররূপাও। কালিকা-মঙ্গলে এবং অন্নদামঙ্গলে চণ্ডী তাঁর উগ্রতা হারিয়ে স্নেহময়ী জননী অন্নদায় এবং শিবায়নে স্নেহময়ী পত্নীতে পরিণত হয়েছেন। ক্রমে পদাবলীর প্রভাবে চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়ন কাব্য বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ গীতিকাব্যে পরিণত হোল। উমাসঙ্গীতে অর্থাৎ আগমনী ও বিজয়ার গানে চণ্ডী হলেন স্নেহময়ী কন্যা—আর শ্যামাসঙ্গীতে তিনি হলেন বাৎসল্যময়ী জননী। বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসধারা শাক্ত সাহিত্যে প্রবাহিত হয়ে শাক্তপদাবলীকে ভক্তিরসসিক্ত করে তুলেছে।

মঙ্গলকাব্য ও শাক্ত পদাবলী ঃ

মঙ্গলকাব্যের দেবী মনসা উগ্ররূপা। পূজা আদায়ের জন্য মানুষের উপরে নিষ্ঠুর নির্যাতন করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। মঙ্গলকাব্যের আর এক দেবী চণ্ডী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর দ্বিবিধ রূপ প্রত্যক্ষ করি,—তিনি বরাভয়-দাত্রী অভয়া—ধনসম্পদদায়িণী। অপর দিকে তিনি শত্রুদলনী রণচণ্ডী। চণ্ডী-দেবীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, তিনি বৈদিক অরণ্যানী এবং

সরস্বতী—পুরাণে দানবদলনী চণ্ডী এবং মঙ্গলকাব্যের পশুপালিকা শবর-পূজিতা মঙ্গলচণ্ডী এবং বণিক-পূজিতা কমলেকামিনী (গজ লক্ষ্মীর প্রকার ভেদ) রূপে আবির্ভূতা। এঁদের নিয়েই বাঙ্গালা দেশে শক্তিপূজার ইতিহাস বিধৃত। অনেকের মতে, প্রাক্-আর্য যুগের মাতৃপূজা বৈদিক-পৌরাণিক প্রভাব সমন্বিত হয়ে মঙ্গলচণ্ডীতে রূপ নিয়েছে। মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার মধ্যে সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে সে যুগের সামাজিক অবস্থার পরিচিতি সহজলভ্য। তুর্কী আক্রমণের পরে বিদেশী বিজেতার অত্যাচার অনাচার এদেশের মানুষকে বিপন্ন করে তুলেছে। প্রতিকারের ক্ষমতাহীন অসহায় প্রজাপুঞ্জ নিষ্ফল ক্ষোভে ও বেদনায় দেবতার কাছে মাথা কুটেছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা দৈব-নির্ভর হয়ে পড়েছে। শক্তিদেবতার উপাসনায় সকল অমঙ্গল নাশের কামনাতেই তারা মঙ্গলচণ্ডীকে আরাধনা করেছে। দেবীমূর্তিতেও শত্রুনাশিনী এবং কল্যাণদায়িনী উভয় রূপের প্রকাশ প্রকটিত। দেবীর প্রতিহিংসা পরায়ণা ভ্রূকুটি কুটিল মূর্তিতে অত্যাচারী শাসকের নির্মমতা ফুটে উঠেছে। বিদ্রোহীর স্পর্ধিত শির দেবতার রোষে অবনমিত হয়েছে,—আর ভক্তবৃন্দ দেবতার কৃপায় নির্ভর করে আত্মসমর্পণ করেছে।

ক্রমে বিজিত মুসলমান শক্তি এদেশেরই অধিবাসীতে পরিণত হয় এবং প্রতিবেশী হিসাবে হিন্দু জনসাধারণের পাশাপাশি বাস করতে থাকে। দেশে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। দেবী চণ্ডীও ভীষণতা হারিয়ে বরাভয়দাত্রী কালিকা ও অন্নদাত্রী অন্নদাতে পরিণত হন। আবার শিবায়নে দেবী উমা রূপে ঘরসংসার গৃহস্থালীতে মনোনিবেশ করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর সংসারবিমুখ ভাববিহ্বলতা এবং রসোচ্ছলতা বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে এক ধরনের ঔদাস্য এবং জড়তা এনেছিল। এই ভাববিহ্বলতার ঘোর কিছুটা কাটলো অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। মোঘল শাসনের কঠোর হস্তাবলেপ শিথিল হয়েছে। বাঙ্গালা দেশ কার্যতঃ স্বাধীন হয়েছে। মুর্শিদকুলি

খাঁর জমিদার নির্যাতন, স্বেচ্ছাচারী নবাবের স্বেচ্ছাচার, বর্গীর উপদ্রব আর ইংরাজের ক্রমিক পদসঞ্চার অনিশ্চয়তা ও বিপর্যয়ের মুখে দেশবাসীকে ফেলে দিল। প্রয়োজন হোল শক্তিসাধনার। বৈষ্ণব পদাবলীর ভক্তিরসধারা সিঞ্চিত শক্তিসাধনা পরিগ্রহ করলো নবরূপ। জন্ম হোল শাক্তপদাবলীর। শাক্ত পদাবলীতেও সেই দৈব নির্ভরতা। চণ্ডী হলেন কন্যা ও মা। উমা ও মা রূপে তিনি ভক্তিমিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন। উমাসঙ্গীত বা আগমনী ও বিজয়ার গানে দেবী এসেছেন কন্যারূপে,—শ্যামাসঙ্গীতে তিনি জননীরূপে। চণ্ডীর উগ্রমূর্তি একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে। শাক্তপদাবলীতে ভক্তের সঙ্গে দেবীর অন্তরঙ্গ মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় দেবী কেবলমাত্র বরদ না থেকে হয়ে উঠেছেন পরম আত্মীয়। উমা সংগীতে যেখানে দেবী মহিষমর্দিনীরূপে প্রকটিতা, শ্যামাসঙ্গীতে যেখানে তিনি ভয়ংকরী করালবদনা রূপে বর্ণিতা –কোথাও বা তিনি সর্বময়ী ব্রহ্মরূপে কীর্তিতা—সেই সকল ক্ষেত্রে দেবীর ঐশ্বর্যভাবই প্রকাশিত। মাধুর্যভাবের অভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কোথাও জননী নিষ্ঠুরা নন। ভক্ত কবি ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হয়ে কখনও কখনও জগজ্জননীকে ছলনাময়ী, রাক্ষসী, দুঃখদায়িনী, সর্বনাশী ইত্যাদি রূপে ভর্ৎসনা করেছেন, সে কেবল মাতা ও পুত্রের মান-অভিমানের অভিনয়।

একদিক থেকে মঙ্গলকাব্য ও শাক্তপদাবলীর সাদৃশ্য আছে। শাক্তপদাবলীর কবিগণ মঙ্গলকাব্যের কবির মতই সংসারবিমুখ বৈরাগী ছিলেন না। তাঁরা ঐহিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বাস্তব জগতকে অস্বীকার করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবসাধনায় তাঁরা তন্ময় ছিলেন না। মঙ্গলকাব্যের কবির মতই চোখ কান খোলা রেখে তাঁরা সঙ্গীতগুলি রচনা করেছিলেন। তাই উপমা, রূপক, রূপকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ-জীবনের নিখুঁত চিত্র তাঁরা তুলে ধরেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "পদের ফাঁকে ফাঁকে, উল্লেখে—ইঙ্গিতে—তুলনায়—রূপকল্পে সমাজ-জীবনের বাস্তব সমস্যা ছায়াপাত করিয়াছে। এখানে আমরা ডিক্রি-ডিসমিস্,

তহবিল-তছরূপ, হিসাবের খাতা প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের অনুষঙ্গের কথা শুনি। ঘুড়ি ওড়ানো, পাশা খেলা প্রভৃতি আমোদ প্রকরণকে রূপকরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখি, বহুবিবাহ বিড়ম্বিত পরিবারে বিমাতার স্নেহহীন বিমাতৃশাসিত পিতার ঔদাসীন্যের খবর পাই।……শাক্তপদাবলীতে সংসারের সমস্ত গ্লানি কুশ্রীতা, দারিদ্র্যরিক্ততা অনাবৃতভাবে প্রকট ও ইহার সাধনাক্রম অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত।"

উমাসংগীত চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়ন কাব্যবর্ণিত পৌরাণিক কাহিনীরই রূপান্তর। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনকে পৌরাণিক কাহিনীর রসে জারিত করে নব কলেবর দেওয়া হয়েছে। বালিকা-কন্যার কুলীন বয়স্ক বরে বিবাহ এবং তজ্জনিত পিতা-মাতার কন্যাবিয়োগ বেদনা এই পুরাণাশ্রিত কাহিনীকে অশ্রু-সজল করে তুলেছে।

তাই মনে হয়, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল প্রভৃতিতে দেবীর যে মহিমা পরিকীর্তিত হয়েছে, তাই বিবর্তনের ধারায় শাক্তপদাবলীর জননীরূপিণী মহামায়া উমা অথবা কালিকাতে পরিণত হয়েছেন।

মঙ্গলকাব্যের সাহিত্য মূল্য ঃ

প্রায় কয়েক শতাব্দী ব্যাপী অজস্র মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। বহু কবি একই বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। অধিকাংশ রচনাই হয়ত অক্ষম লেখকের রচনা। তথাপি প্রতিভাধর কবি প্রায় প্রত্যেক শাখাতেই কিছু না কিছু জন্মেছেন। গতানুগতিক কাহিনীতেই তাঁরা নিজস্ব প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, ক্ষেমানন্দ, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির মত কবি যে কোন সাহিত্যেরই গৌরবস্থল। রস সৃষ্টিতে, ভাষায় ছন্দে এঁরা নিজেদের অস্তিত্ব বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে সুমুদ্রিত করে রেখেছেন।

বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্যগুলি আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালার সমাজ-জীবনের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান সংরক্ষিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যগুলিতে। কবিগণ্ সমাজ চেতনার যে পরিচয় দিয়েছেন তা' তুলনারহিত। সমসাময়িক বাঙ্গালাদেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিবরণ মঙ্গলকাব্য ছাড়া অন্যত্র সুদুর্লভ। যুগ প্রবণতা ও রাজনৈতিক অবস্থারও সম্যক জ্ঞান লাভ হবে মঙ্গলকাব্য থেকে। কাব্য হিসাবে মঙ্গলকাব্যের যদি কোন ঘাটতি থাকে তা হলে জাতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে এগুলি অমূল্য দলিল হিসাবে কার্যকরী হওয়ায় সে ঘাট্‌তিটুকু পূরণ হয়ে যায়।

মঙ্গলকাব্যের পরিচয়

মনসামঙ্গলকাব্য

মনসাপূজার প্রাচীনতা ঃ

সর্পদেবী মনসার যে সকল মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর। পুরাণের উল্লেখ, বৌদ্ধ জাঙ্গুলীতারার সাদৃশ্য ইত্যাদি থেকে মনে হয় খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতেই বাঙ্গালাদেশে মনসাপূজার প্রচলন হয়েছিল। চৈতন্যভাগবতের সাক্ষ্যে পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে মনসাপূজার ব্যাপক প্রচলনের সংবাদ পাওয়া যায়। তবে মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী অল্পবিস্তর পূর্ব থেকে প্রচলিত থাকলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে মনসামঙ্গল কাব্যের জন্ম হয়েছিল বলে বোধ হয় না। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত পুরাণে মনসার আখ্যান রচিত হয়েছিল এবং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গলগানের পালারূপে বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মনসামঙ্গলকাব্য—কাহিনীর ঐতিহাসিকতা ঃ

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে দেখিয়েছেন যে মনসা-মঙ্গলকাব্য রাঢ় অঞ্চলেই উদ্ভূত হয়েছিল। বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় মনসা-পূজার প্রচলন এবং মনসার মন্দির সর্বাপেক্ষা বেশী। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন যে, চাঁদ সওদাগরের কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তবে তিনি বলেছেন, চাঁদ সওদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের আপত্তি নাই যে যাঁহারা শৈব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, চাঁদ সদাগর তাঁহাদের এক দলের নেতা ছিলেন ও

শেষে তিনি মনসাদেবীর পূজা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ডঃ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, কোন ধনী বণিকপুত্র বিবাহের রাত্রে সর্পদংশনে মৃত্যুর মত মর্মান্তিক ঘটনাও এই কাহিনীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। চাঁদ সওদাগরের কাহিনী এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থানে চাঁদ সওদাগরের ভিটা ইত্যাদি পাওয়া যায়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "ত্রিপুরা জেলায় এমনি একটি চম্পকনগর আছে। পূর্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থলে লখীন্দরের কাণ্ডকারখানাটা হইয়াছিল। লখীন্দরের লোহার বাসরের ভিটাও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। এদিকে বর্ধমানের ষোল ক্রোশ পশ্চিমে চম্পকনগর ও তন্নিকটে বেহুলা নদী প্রভৃতি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আসামভ্রমণ প্রণেতা উদাসীন সত্যশ্রবাঃ নির্দেশ করেন, ধুবড়ীই চাঁদ সদাগরের নিবাসভূমি। উত্তর বঙ্গের লোকেরা বলে বগুড়ার নিকটবর্তী মহাস্থানে চাঁদ সদাগরের ও লখীন্দরের বাড়ী ছিল। কেহ কেহ দার্জিলিং-এর নিকটবর্তী রনিৎ নদীর তীরে চাঁদ সদাগরের বাসস্থান নির্দেশ করেন। আবার দিনাজপুর জেলায় কান্তনগরের নিকটবর্তী সনকা গ্রামে চাঁদ সদাগরের বাড়ীর ভগ্নস্তূপ কেহ কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন।" শুধু চাঁদ সওদাগরের ভিটি নয়, বেহুলার যাত্রাপথের বর্ণনাও বিবিধ নদীখাতের ইঙ্গিত দেয়। ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় বর্ধমানের পূর্বাঞ্চলে দামোদরের মরা খতে বেহুলা গাঙ্গুড়ের বিবরণ আছে। কেউ কেউ পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশের শ্রেষ্ঠরাজা (খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ) শ্রীচন্দ্রদেবের সঙ্গে চাঁদ সওদাগরকে অভিন্ন বলে মনে করেন। কারো মতে, মনসামঙ্গলের চম্পকনগরী প্রাচীন মগধের রাজধানী চম্পক। প্রকৃতপক্ষে, চাঁদ সওদাগরের কাহিনীর পশ্চাতে যদি কিছু ঐতিহাসিক সত্য থাকে তবে তা এখন আর ঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী ঃ

মনসামঙ্গল কাব্যের দুটি প্রধান অংশ—দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। দেবখণ্ডে পৌরাণিক কাহিনী। এই অংশে শিবদুর্গার উপাখ্যান, শিবের চোখের জলে

(অথবা ঘামে) নেতার জন্ম,—পদ্মবনে (অথবা কেয়া পাতায়) শিবের কন্যা (অথবা মানসকন্যা) মনসার জন্ম,—চণ্ডীর সঙ্গে মনসার বিবাদ—শিব কর্তৃক মনসাকে সিজ পর্বতে পরিত্যাগ—নেতা ও মনসার রাজ্যপাট স্থাপন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। এই অংশেই মহাভারতের জরৎকারুর সঙ্গে মনসার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ, —আস্তিকের জন্ম,—জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ নিবারণ প্রভৃতি ঘটনাও এই অংশের বিষয়বস্তু।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান কাহিনী চাঁদ সওদাগরের উপাখ্যান। স্বর্গে ভ্রমণকালে মনসা ও চাঁদ সওদাগরের সাক্ষাৎকারের সময় চাঁদের মহাজ্ঞানের প্রভাবে মনসার কোমরবন্ধ সর্পকুল সন্ত্রস্ত হওয়ায় মনসা বিবস্ত্রা হয়ে পড়েন এবং চন্দ্রধরকে অভিশাপ দেন মর্তে জন্মগ্রহণ করতে। নির্দোষ চাঁদও মনসাকে শাপ দেয় যে তিনি পূজা না করলে মর্তে মনসার পূজা প্রচারিত হবে না।

চাঁদ মর্তে বিজয় সাধুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পত্নী সনকা। মনসার রাজ্যপাট হয়েছে। কিন্তু প্রজা চাই। মর্তের মানুষ পূজা করলে তবে রাজ্য থাকে। চাঁদ সওদাগরকে দিয়ে পূজা প্রচার করাতেই হবে। চাঁদ পরম শৈব, শিবপূজা করেন প্রতিদিন আর সনকা গোপনে ঘটে মনসার পূজা করেন. চাঁদ জানতে পেরে পদাঘাতে মনসার ঘট ভেঙ্গে দিলেন। মনসা কুপিতা হলেন। মনসার কোপে চাঁদের রাজ্য চম্পকনগরের প্রজারা সর্পাঘাতে প্রাণ হারাতে থাকে। চাঁদের বন্ধু শংকর গারুড়ী বিষবিদ্যার প্রভাবে মৃত প্রজাদের প্রাণদান করেন। মনসা চাঁদের গুয়াবাড়ী ধ্বংস করলে মহাজ্ঞান প্রভাবে চাঁদ গুয়াবাড়ী সঞ্জীবিত করলেন। মনসার কৌশলে শংকর গারুড়ী প্রাণ হারালেন, চাঁদের মহাজ্ঞান অপহৃত হোল। মনসা চাঁদের ছয় পুত্রকে অন্নের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করলেন। সনকা হাহাকার করেন, স্বামীকে মিনতি করেন মনসাকে পূজা করার জন্য। কিন্তু চাঁদ অটল।

ঝালু মালু মনসা পূজা করছিল। সনকা সংবাদ পেয়ে গোপনে মনসার

কাছে চাঁদের মঙ্গল কামনা করলেন। মনসা সনকাকে পুত্রবর দিলেন, কিন্তু চাঁদ মনসাপূজা না করলে ঐ পুত্রের বাসরঘরে মৃত্যুর ভবিতব্যও জানিয়ে দিলেন। শাপভ্রষ্ট দেবতা ঊষা ও অনিরুদ্ধ মর্তে বেহুলা ও লখীন্দর রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। পুত্রের মুখ দেখে আনন্দিত চন্দ্রধর বাণিজ্যে চললেন চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজিয়ে। যাত্রার প্রাক্কালে মনসা চাঁদের কাছে পূজা চাইলেন। চাঁদ তাঁকে অপমানিত করে বিতাড়িত করলেন। চাঁদ বাণিজ্য সেরে চৌদ্দ ডিঙ্গা মূল্যবান ধনসম্পদে পূর্ণ করে যখন ঘরে ফিরছেন, সেই সময় মনসা চাঁদের কাছে পুনর্বার পূজা প্রার্থনা করে অপমানিত হলেন। দেবীর আদেশে অকস্মাৎ মাঝ সমুদ্রে বান এলো—চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা ধনরত্ন সহ জলে ডুবে গেল। কিন্তু চাঁদকে বাঁচিয়ে রাখলেন মনসা তাঁর পূজা প্রচারের জন্য। চাঁদের আশ্রয়ের জন্য তিনি জলে গোটা লাউ বা কলসী ফেলে দিলেন। মনসার কৃপা চাঁদ ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। বহু ক্লেশে অনাহারে অনিদ্রায় শীর্ণ দেহে চাঁদ ঘরে ফিরে এলেন। লখীন্দর তখন যুবক। সকল দুঃখ ভুলে চাঁদ পুত্রের বিবাহের আয়োজনে মেতে উঠলেন। উজানী নগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলা বিবাহের পাত্রীরূপে মনোনীতা হলেন। বাসরঘর তৈরী হোল নিশ্ছিদ্র লোহা দিয়ে। কিন্তু মনসার ছলনায় কর্মকার লোহার ঘরে সূক্ষ্ম ছিদ্র রাখতে বাধ্য হোল। মনসা প্রেরিত কালনাগিনী বাসরঘরেই লখীন্দরকে দংশন করলো। উৎসব বাড়ীতে কান্নার রোল উঠলো। লখীন্দরের মৃতদেহ কলার ভেলায় চাপিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হোল। নববধূ বেহুলা চললেন ভেলায় ভেসে মৃত পতির সঙ্গে। আত্মীয় পরিজনের নিষেধ তিনি গ্রাহ্য করলেন না; বুকে তাঁর দুর্জয় পণ—ফিরিয়ে আনবেন স্বামীর জীবন। গোদার ঘাটে গোদা ছিপে মাছ ধরতে ধরতে বেহুলার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চাইলো। বেহুলা তাকে অভিশাপ দিয়ে চললেন এগিয়ে। আপু ডোমও অনুরূপ প্রার্থনা জানিয়ে অভিশপ্ত হোল। ধনামনার লোভ থেকে নিজেকে রক্ষা করে, ব্যাঘ্র এবং চিলের

গ্রাস থেকে স্বামীর গলিত দেহ বুকে করে বাঁচিয়ে বেহুলা স্বামীর অবশিষ্ট পাঁজর ক'খানা বুকে নিয়ে এলেন নেতা ধোপানীর ঘাটে। নেতা মনসার সহচরী, দেবতাদের ধোপানী। নেতা তার সঙ্গের ছেলেটিকে হত্যা করে রেখে কাপড় কাচার শেষে তাকে জীবন্ত করে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। বেহুলা কাপড় কেচে দিয়ে নেতাকে খুশী করে তাঁকে ধরলেন স্বামীর প্রাণ দান করবার জন্য। নেতা বেহুলাকে দেবপুরীতে নিয়ে গেলেন। দেবসভায় বেহুলা নৃত্য প্রদর্শন করে দেবতাদের তুষ্ট করলেন। নৃত্যে তুষ্ট মহাদেব বেহুলাকে তাঁর স্বামীর প্রাণভিক্ষা দিলেন। মহাদেবের কথায় মনসা রাজী হলেন, কিন্তু শর্ত এই যে চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করাতে হবে। বেহুলা চাঁদের ছয় পুত্র এবং জলমগ্ন ধনপূর্ণ চৌদ্দ ডিঙ্গা ফেরৎ চাইলেন। সবই ফিরে দিলেন মনসা। ধনপূর্ণ চৌদ্দ ডিঙ্গা, স্বামী ও ছয় ভাসুর নিয়ে চম্পকনগরে ফিরে এলেন বেহুলা। খবর পেয়েই চাঁদ ছুটে এসেছেন। কিন্তু মনসা পূজা করতে হবে শুনে চাঁদ বিমুখ হলেন। কিন্তু বেহুলার স্নেহের অনুরোধ ব্যর্থ হোল না। চাঁদ পারলেন না পুত্রবধূর স্নেহকাতর অনুনয় উপেক্ষা করতে। তিনি মুখ ফিরিয়ে বাম হাতে ফুল দিয়ে মনসাকে পূজা করলেন। মনসা এতেই তৃপ্ত। জগতে মনসা-পূজা প্রচারলাভ করলো।

এর পরে অবিশ্বাসীর কাছে বেহুলার সতীত্বের পরীক্ষা এবং শাপমুক্ত বেহুলা-লখীন্দরের ঊষা-অনিরুদ্ধ রূপে স্বর্গ গমনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

মনসা মঙ্গলের চরিত্র

চাঁদ সওদাগর ঃ

সমগ্র মঙ্গলকাব্যে অথবা সমগ্র মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা কাব্যে পুরুষাকারে আস্থাশীল দৃঢ়চেতা হিমালয়ের মত উন্নতশির একমাত্র চরিত্র চাঁদ সওদাগর। চাঁদ সওদাগর শিবের ভক্ত। শিব ছাড়া অন্য দেবতাকে তিনি পূজা করবেন না। এই কঠোর সংকল্প নিয়ে আত্মশক্তিতে ভর করে তিনি একা মনসা-

বিরোধিতা করেছেন। ছয় পুত্র মরেছে—ধনপূর্ণ চৌদ্দ ডিঙ্গা জলে ডুবেছে—নিজের প্রাণবিপন্ন হয়েছে—তবু তিনি মনসার কাছে মাথা নত করেননি। যে হাতে তিনি শূলপাণির পূজা করেছেন, সে হাতে তিনি চেঙ্গমুড়ি কানীর পূজা করবেন না,—এই তাঁর কঠোর প্রতিজ্ঞা। পত্নী সনকা কেঁদে আকুল হয়ে অনুনয় করেছেন—আত্মীয় পরিজন অনুরোধ করেছেন; কিন্তু চাঁদ প্রতিজ্ঞায় অটল। কনিষ্ঠ পুত্র লোহার বাসরঘরে প্রাণ দিয়েছে, সদ্যোবিধবা নববধূ পতির মৃতদেহ নিয়ে কলার ভেলায় ভেসেছেন—তবুও চাঁদের প্রতিজ্ঞা টলেনি। শেষ পর্যন্ত স্নেহের কাছে চাঁদের দুর্জয় প্রতিজ্ঞা পরাভূত হয়েছে। সাতটি মৃতপুত্রের জীবন নিয়ে বেহুলা যখন ফিরে এসেছে তখন চাঁদ উল্লসিত হয়েছেন, কিন্তু মনসা পূজা করতে হবে শুনেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন। শেষ পর্যন্ত বেহুলার স্নেহের অনুরোধ চাঁদকে টলিয়ে দিয়েছে। স্নেহের কাছে চাঁদ পরাভূত হয়েছেন—দৈবের কাছে নয়। অবশ্য সকল কবি চাঁদের চরিত্রে সামঞ্জস্য রাখতে পারেননি। কেউ কেউ চাঁদকে দিয়ে ঘটা করে মনসাপূজা করিয়েছেন। তবু মধ্যযুগে বাঙ্গালা কাব্যে চাঁদ সওদাগর এক অনন্যসাধারণ চরিত্র। চাঁদ প্রাণহীন একটা আইডিয়া নয়—প্রাণবন্ত রক্তমাংসের মানুষ। মনসা বিরোধিতায় তিনি যত কঠোরই হোন, ভেতরে ভেতরে তিনি ক্ষয়ে গেছেন শোকে দুঃখে বেদনায়। সে বেদনার প্রকাশ সীমীত হলেও দুর্লক্ষ্য নয়।

বেহুলা ঃ

সীতা-সাবিত্রীর আদর্শে পরিকল্পিত বেহুলা চরিত্রটি বাঙ্গালাদেশে দেবত্বে উন্নীত হয়েছে। বেহুলা চরিত্রের প্রধান গুণ পতিপ্রাণতা। যিনি বিবাহের রাত্রে স্বামী হারিয়েছেন—স্বামীকে তখনও চেনেননি ভাল করে, স্বামীকে ভালবাসার প্রশ্ন সে ক্ষেত্রে অবান্তর। সাবিত্রী তবু বৎসরকাল স্বামীসঙ্গ পেয়েছিলেন। স্বামীই নারীর সর্বস্ব—উপাস্য দেবতা,—এই হিন্দু আইডিয়া বেহুলাকে মৃত পতির পুনর্জীবন লাভের সংকল্পে অটল রেখেছে। বহু দুঃখ,

বহু প্রলোভন, অনেক ভয় জয় করে বেহুলা পতি ও পতির অগ্রজদের জীবন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। সেজন্য তাঁকে অসম্ভবকে সম্ভব করতে হয়েছে—দেবসভায় নৃত্যগীতে দেবতাদের তুষ্ট করতে হয়েছে। নাচনী বেহুলার এ এক আশ্চর্য শক্তি। মনে হতে পারে বেহুলার চরিত্রও একটি আইডিয়া মাত্র। কিন্তু তা নয়। পতিপ্রাণতাই বেহুলাকে সাহসিকা করেছে—তেজস্বিনী করেছে। প্রলুব্ধকারী দুষ্ট ধনামনা, গোদা প্রভৃতিকে বেহুলা অভিশপ্ত করেছেন। আবার চাঁদ বা সনকা লখীন্দরের মৃত্যুর জন্য বেহুলাকে যখন দায়ী করেছেন, বেহুলা তখন যথোচিত উত্তর দিতেও দ্বিধা করেননি। মনসার নিকটে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বেহুলা যথাসাধ্য প্রয়াস করেছেন। তাঁরই স্নেহের অনুরোধে চাঁদ পরাজয় মেনেছেন। আবার বাসরঘরে আকস্মিক ভাবে স্বামীকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখে অসহায়া নারীর মত বেহুলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। মোটের উপর কোমলে কঠোরে গড়া বেহুলা চরিত্রটি মনসামঙ্গল কাব্যে এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

সনকা ঃ

মনসামঙ্গল কাব্যে বাঙ্গালী জননীর মূর্তিতে সনকা আবির্ভূতা। স্বামী-পুত্রের কল্যাণকামনাই তাঁর ব্রত। তাই স্বামীর অনিচ্ছা জেনে গোপনে তিনি মনসাপূজায় দ্বিধা করেননি। চাঁদের অসঙ্গত জেদের জন্য সোনার সংসার ছারখার হতে চলেছে দেখে বারংবার তিনি স্বামীর কাছে অনুনয় করেছেন মনসার সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে। ছয় পুত্রের মৃত্যুশোক বুকে নিয়ে এই হতভাগিনী নারী হাহাকারে আকাশ বাতাস ভরিয়ে দিয়েছেন। আবার সাধারণ অশিক্ষিতা বাঙ্গালী জননীর মতই শেষ সম্বল কনিষ্ঠ পুত্রটির মৃত্যুর পরে তিনি পুত্রবধূকেই দায়ী করেছেন। সনকার সকরুণ বিলাপ সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যটিকেই করুণ করে তুলেছে। আবার পুত্রবধূ মৃত পুত্রকে নিয়ে ভেসে যাবার সংকল্পটা করলে তিনিই বাঁধা দিয়েছেন। একটি নিখুঁত বাস্তব বাঙ্গালী জননীর চিত্র সনকা। এখানে অতিরঞ্জন একেবারেই নেই।

মনসা :

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলের মনসাই সর্বাপেক্ষা হিংস্র এবং নীচ রূপে অংকিত হয়েছেন। নিজের স্বার্থ ছাড়া মনসা আর কিছুই চাননি। নিজের পূজা প্রচারিত হবে এই আশায় তিনি নিরপরাধ চাঁদ সওদাগরকে অপরিসীম দুঃখ দারিদ্র্য দিয়েছেন,—চাঁদ মনসা পূজায় অস্বীকৃত হলে চরম শাস্তি দিয়েছেন। এখানে তিনি হিংস্র প্রকৃতির। গোপনে চাঁদের ছয় পুত্রকে বিষ প্রয়োগ করতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। চাঁদের বন্ধু শংকর গারড়ীকে বিনা অপরাধে হত্যা করতেও তিনি সংকোচ বোধ করেননি। ছলনার আশ্রয়ে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণেও তাঁর কোন কুণ্ঠা নেই। ছলে বলে কৌশলে কার্য সিদ্ধিই তাঁর অভিপ্রায়। অবশ্য ভক্ত এবং পূজককে তিনি করুণা করেছেন। অপর দিকে চাঁদের হেঁতালের লাঠির ভয় মনসা চরিত্রের দুর্বলতাটুকুও প্রকাশ করে দিয়েছে। হেঁতালের লাঠির ভয়ে মনসা পলায়ন করতেও দ্বিধা করেননি। আবার কোন কোন কবি পূজা আদায়ের জন্য মনসাকে দিয়ে চাঁদের কাছে মিনতিও করিয়েছেন। মোট কথা, মনসা চরিত্রে কোথাও দেবত্ব আরোপিত হয়নি। কবিরা তাঁকে স্বার্থ পরায়ণা চক্রান্তকারিণী দুর্বল অথচ নীচ প্রকৃতির মানবী রূপেই অংকিত করেছে।

মনসা মঙ্গলকাব্যের কবি

আদি কবি হরিদত্ত :

মনসা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রাচীন কবিরূপে পরিচিত বিজয়গুপ্ত লিখেছেন :

> সর্বলোকে গীত গাহে না বোজে মাহাত্ম্য
> প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত।

হরিদত্তের গীত লোপ্ত পাইল এই কালে
জোড়া গাথা নাহি কিছু ভাণ্ডে বোলে চালে।
গীতে মতি না দেয় কেহ ভাবে খোলে চাল।
তাহা দেখি পুত্র মোর উপজে বেতাল।

ছত্র কয়টির একটি পাঠান্তর আছে ঃ

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত।
কথায় সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর,
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর।
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফফাল
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে চেতাল॥

বিজয়গুপ্তের এই উল্লেখ থেকে হরিদত্তই মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি রূপে স্বীকৃতি পেয়ে আসছেন। হরিদত্ত সম্ভবতঃ কাণা ছিলেন। হরিদত্তের কাল সম্পর্কে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন ঃ "বিজয়গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময়ে যে গীতি বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্বে বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং কাণা হরিদত্ত মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি।" ডঃ সেন আর এক স্থানে বলেছেন, "সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরিদত্ত বিদ্যমান ছিলেন।" হরিদত্ত সম্পর্কিত বিজয়গুপ্তের মন্তব্য আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের ভূমিকায় লিখেছেন, "তাঁহার সময়ে কাণা হরিদত্তের কবিতা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। গায়কগণ তাঁহার ছিটাফোঁটা দুই চারিটি কবিতা লইয়া তাহার সহিত তাহাদের স্বরচিত পদের যোগান দিয়া যে গাথা রচনা করিয়াছিল, তাহাতে পূর্বাপর কাহিনীর

সংযোগ রক্ষিত হয় নাই।" ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, বিজয়গুপ্তের সময়ে হরিদত্তের কাব্য সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। সুতরাং হরিদত্ত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন।

পুরুষোত্তম নামে এক কবি অথবা গায়ন বিজয়গুপ্তের পরবর্তীকালে হরিদত্তের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন ঃ

কাণা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়।
তাঁর অনুবন্ধ লাচারীর ছন্দ
কবি পুরুষোত্তমে গায়॥

দাস হরিদত্তের ভণিতায় কালিকাপুরাণের তিনখানি পুঁথি পাওয়া গেছে মৈমনসিংহ জেলায়। কালিকাপুরাণ সংস্কৃত পুরাণের অনুবাদ। এই কবি একজন বৈষ্ণব ভক্ত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে 'কালিকাপুরাণের' কবি হরিদত্ত ও মনসামঙ্গলের হরিদত্ত একই ব্যক্তি এবং কালিকাপুরাণ চৈতন্য পূর্বযুগের রচনা। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণেও হরিদত্তের একটি পদ আছে। মনে হয়, হরিদত্তের কাব্য বিজয়গুপ্ত, পুরুষোত্তম নারায়ণ দেব প্রভৃতি কবি ও গায়নরা আত্মসাৎ করেছিলেন। বিজয়গুপ্ত যে হরিদত্তের কাব্য থেকে উপাদান গ্রহণ করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। বৈদ্য হরিদাসের ভণিতায় মনসামঙ্গলের একটি পুঁথি পাওয়া গেছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, কালিকা পুরাণের অনুবাদ এবং মনসামঙ্গলের পুঁথি—দুটিই একই কবির রচনা হতে পারে এবং পুরুষোত্তম-কথিত কাণা হরিদত্ত একই ব্যক্তি হতে পারেন, তবে এই হরিদত্তের সময় অষ্টাদশ শতকের পূর্বে নয়—এবং কালিকা পুরাণের রচনাকালও অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী নয়।

বিজয়গুপ্ত ঃ

মনসামঙ্গলের প্রাচীন কবিদের মধ্যে অন্যতম বিজয়গুপ্ত। কেউ কেউ

এঁকে মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি বলেও উল্লেখ করে থাকেন। পদ্মাপুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে বিজয় গুপ্ত লিখেছেন:

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতে তিলক॥
* * *
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়॥

বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামে কবির বাস ছিল। কবির উক্তি থেকে জানা যায় যে, ১৪০৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহের রাজত্বকালে এই কাব্য রচিত হয়। কিন্তু হোসেন শাহ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিজয়গুপ্তের কোন কোন পুঁথিতে আছে, 'ঋতু শশী বেদ শশী' অর্থাৎ ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ। এই সময় হোসেন শাহের রাজত্বকাল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পূর্বের কালজ্ঞাপক পয়ারটি ভুল এবং পরেরটি ঠিক বলে গণ্য করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন বিজয় গুপ্তকে অত প্রাচীন কবি বলে স্বীকার করেননি। তিনি মনে করেন যে "বিজয়গুপ্ত পুরানো অথবা অর্বাচীন কবি কিম্বা গায়ক হইতে পারেন।" বিজয়-গুপ্তের নামে প্রচলিত কাব্য যে পুরাতন মালমশলা সহযোগে জোড়াতালি দিয়ে অর্বাচীন কালে লেখা হয়েছে এ তত্ত্ব তিনি প্রতিপাদন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণও নানা হস্তস্পর্শে, নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে।"

বিজয়গুপ্তের কবিত্ব

"মনসামঙ্গল প্রধানতঃ করুণ রসের আকর। এই করুণরস প্রধান কাব্যটিতে সার্থকতা লাভ করিতে হইলে যে সুগভীর ভাব-প্রবণতার প্রয়োজন হয়, বিজয়গুপ্তের মধ্যে তাহার কতকটা অভাব ছিল। বিজয়গুপ্তের দৃষ্টি ব্যষ্টি-চরিত্রের অন্তস্তল অপেক্ষা সমষ্টি চরিত্রের বহির্ভাগের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট ছিল। ভাব-প্রবণতা অপেক্ষা তাঁহার মধ্যে বস্তু-বিশ্লেষণ প্রবণতা অধিক ছিল। সেই জন্য তিনি এই করুণ

রসাশ্রিত কাহিনীর উদ্দাম ভাবপ্রবাহে ভাসমান না হইয়া ইহার একটি বিচ্ছিন্ন খণ্ড বস্তুকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তাহার ফলে বিচ্ছিন্ন সামাজিক চিত্রগুলি তাঁহার কাব্যে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। এই দিক দিয়া বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান উপাদান হইয়া রহিয়াছে। এমনকি তাঁহার পরিকল্পিত দেব-চরিত্রগুলিও তৎকালীন সমাজের এক একটি জীবন্ত মানবচরিত্র রূপেই অঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে দেবত্বের লেশমাত্র নাই। বাংলার ধূলি মলিন গৃহাঙ্গিনায় তাঁহার কাহিনীর পরিবেশটি রচনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আদর্শবাদের স্পর্শমাত্রও নাই। পদ্মা, চণ্ডিকা, শিব প্রভৃতি দেব চরিত্রগুলি এমনই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই চিত্রিত হইয়াছে।”

(ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য)

মনসামঙ্গল কাব্যের স্থায়ী রস করুণ রস হলেও অন্যান্য রসের চিত্রও আছে বিজয়গুপ্তের কাব্যে। বিজয়গুপ্তের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে হাস্যরস পরিবেষণে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, “বিজয়গুপ্তের কবিতা কথায় কথায় ব্যঙ্গের দিকে ধাবিত হয়, সেই ব্যঙ্গেই তাঁহার কবিতা বেশ ফুটিয়া ওঠে।” বিজয়গুপ্তের বর্ণনার সরসতা প্রসংগে পদ্মার বিবাহ সম্পর্কে শিবদুর্গার কথোপকথনটি উদ্ধারযোগ্য :

জামাই এনেছি পুণ্যবান কন্যা করিব দান
বিবাহের সজ্জা করে ঘরে।
এনেছি মুনির সুত রূপে গুণে অদ্ভুত
কন্যা সমর্পিব তার করে॥
হাসি বলে চণ্ডী আই তোমার মুখে লজ্জা নাই,
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে তারা চাবে পান খাইতে
আর চাবে তৈল সিন্দুরে॥

হাসি বলে শূলপাণি এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠাম এয়োর উঠিবে প্রাণ,
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে ॥
আছুক পানের কাজ এয়োগণ পাবে লাজ
পান গুয়া দিবে কোন জনে।
বিজয়গুপ্তেতে কয় এরূপ উচিত নয়
ঘরে গিয়ে কর সম্বিধানে।

শিবের প্রতি চণ্ডিকার ক্রোধোক্তিটিও উল্লেখযোগ্য :

পাপ কপাল ফলে স্বামী পাইলাম ভাল।
ভাঙ্গ ধুতুরা খায় পরিধান ব্যাঘ্রছাল ॥
প্রেতের সঙ্গে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি ॥
নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে।
চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তারে খাউক বাঘে ॥
আগুন লাগুক কান্দের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন ভাণ্ডাল মোরে ॥
ছিঁড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা, ঝড়ে ভাঙ্গুক নাউ।
কপালের তিলকচন্দ্র তারে গিলুক রাউ ॥

বিজয়গুপ্তের বর্ণনায় দেবমহিমা খর্ব হয়েছে, বর্ণনাও রুচিসঙ্গত হয়নি। গ্রাম্যতা দোষ থাকা সত্ত্বেও বিজয়গুপ্তের বর্ণনা যে সরস এবং বাস্তবানুগত, তাতে সন্দেহ নেই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন : "বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মতথ্যের খনি। ইহার ভাষা প্রাচীন ও কতকটা অমার্জিত হইলেও এই কাব্যের পত্রে পত্রে পল্লীপ্রাণের করুণ সাড়া পাওয়া

যায়।······তাঁহার রচনায় মেকী কিছুই ছিল না। খাঁটি বাঙ্গালী প্রাণের আকাঙ্খা তিনি মিটাইতে পারিয়াছিলেন।"

বিজয়গুপ্তের কাব্যে ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। স্বরবৃত্তের প্রয়োগ বিজয়গুপ্তের কাব্যে বোধহয় প্রথম পাওয়া যায়। অলংকার প্রয়োগেও বিজয়গুপ্তের কৃতিত্ব আছে। উপমা প্রয়োগে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যাজস্তুতি অলংকারও তিনি প্রয়োগ করেছেন। পূর্বোদ্ধৃত অংশগুলিতে ভারতচন্দ্রের রচনা বৈদগ্ধ্যের আভাস মেলে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নদার খেয়াপারের প্রসিদ্ধ বর্ণনাটির যেন একটি প্রাক্‌রূপ পাওয়া যায় বিজয়গুপ্তের কাব্যে চণ্ডীর খেয়াপারের দৃশ্যে :

ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী মনে মনে পাঁচে।
হাসিতে খেলিতে গেলা ডোম্‌নীর কাছে॥
কপট করিয়া সাঁচা মিছা কথা কই।
এক নাম জানিয়া তাহারে বলে সই॥
তোমার মত সই আমি বড় ভাগ্যে পাই।
আমার দুঃখের কথা তোমাকে জানাই॥
চণ্ডী বলে সখী মোর দুঃখের নাহি ওর।
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর॥

এইগুলি যদি পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ না হয়, তা হলে বিজয়গুপ্তের প্রভাব ভারতচন্দ্র স্বীকার করে নিয়েছেন একথা মানতেই হবে। ভারতচন্দ্রের মত প্রতিভাধর কবি যদি বিজয়গুপ্তের প্রভাব স্বীকার করে থাকেন, তা হলে বিজয়গুপ্তের প্রতিভার গৌরব এর থেকে আর কি হতে পারে?

বিজয়গুপ্তের রচনা ব্যঙ্গপ্রধান হলেও করুণ রস যে তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত তা নয়। লখীন্দরের সর্পদংশনের সংবাদে সনকার আচরণ ও বিলাপে কবি যথেষ্ট করুণ রস পরিবেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

বার্তা পাইয়া সোনেকা আসিল লড় দিয়া।
আহা পুত্র বলি পড়ে ভূমে আছাড় খাইয়া॥
সোনাই বলে পাইয়াছিলাম অখিলের নিধি।
দিয়া বঞ্চিত হইলা দারুণ বিধি॥
অনেক তপস্যা মূই করিলাম নিরাহারে।
সেই ফলে তুমি পুত্র ধরিলাম উদরে॥
তুমি পুত্র পাইয়া আমি করিলাম বড় আশ।
অভাগিনীর আশা বিধি করিলাম নৈরাশ॥
কান্দে সোনকা রাণী বুকে হানে ঘা।
আর মোরে চন্দ্রমুখে না বলিলা মা॥
ধাইয়া গিয়া সোনেকা লখাইরে লইল কোলে।
বুক বাহিয়া লখাইর বিষের লোল পড়ে॥

তবে বিজয়গুপ্তের বর্ণনায় করুণরস সর্বত্র সিদ্ধ হয়নি। দেবসভা থেকে প্রত্যাবর্তনান্তে বেহুলা শ্বশুরবাড়ী ঘুরে এসে শ্বশুরের করুণ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন :

শ্বশুরের দেখিলাম লম্বা লম্বা দাড়ি।
তবু তিনি নাহি ছাড়েন কান্ধের হেতাল বাড়ি॥

এই বর্ণনা কারুণ্য অপেক্ষা হাস্যরসেরই পোষক। বিজয়গুপ্তের বর্ণনায় পাণ্ডিত্য নেই, কিন্তু আছে সহানুভূতি। তাঁর বর্ণনা সহজ সরস সুখপাঠ্য এবং বাস্তবানুগ। তাঁর কাব্য পড়তে পড়তে সে যুগের গার্হস্থ্য জীবন একান্ত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, কাব্যবর্ণিত মানুষগুলির সঙ্গে পাঠক একাত্মতা অনুভব করে, তাদের সুখ-দুঃখের নিবিড় স্পর্শ অনুভব করে,—অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস পায়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বিজয়গুপ্ত দেবতার মাহাত্ম্য রচনা করেন নাই। মানবেরই মঙ্গলগান গাহিয়াছেন। চাঁদ কর্তৃক মনসার অপমানকে সর্বদাই তিনি এত বড় করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহার ফলে

তাঁহার কাব্যে মনসার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়া উঠে নাই, মানুষেরই বিজয় ঘোষিত হইয়াছে।" (চাঁদ সদাগরের চরিত্রে যে বজ্রকঠোর দৃঢ়তা বিজয়গুপ্ত দান করেছেন, তার সঙ্গে চাঁদের পরিণাম সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি। চাঁদ বেহুলা ও পাত্রমিত্র ইত্যাদির অনুরোধে বাঁ হাতে মনসা পূজা করতে রাজী হলেন। চণ্ডী তখন চাঁদের কাছে মনসা ও চণ্ডীর অভিন্নতা প্রতিপাদন করলেন। চাঁদ তখন হেতালের লাঠি আগুনে পুড়িয়ে ফেলে সাড়ম্বরে মনসার পূজা করলেন। পূজা শেষে চাঁদ বললেন:

যে মুখে দিয়াছি গালি লঘু জাতি কানি।
সেই মুখে ভস্ম খাম শোন গ জননী।
যে মুখে দিয়াছি গালি দেও চূনকালি
আমারে করহ কৃপা বিষহরি মায়ে।
গোঁফ দাড়ি কাটিয়া দিব তোমা পায়ে॥

এই পরিণতি চাঁদ সদাগরের পূর্বাপর চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।)

নারায়ণ দেব:

নারায়ণ দেব মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কেউ কেউ তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবিরও গৌরব দিয়ে থাকেন। কিন্তু নারায়ণ দেবের কোন পুঁথি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায়নি। নারায়ণ দেব তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে জানা যায় যে, নারায়ণ দেব রাঢ় দেশ থেকে এসে ময়মনসিংহ জেলার বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। নারায়ণ দেবের কাব্যে কালবাচক কোন পয়ার না থাকায় তাঁর সময় নিরূপণে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থে বলেছেন যে, ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে নারায়ণ দেব তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। আবার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বিজয়গুপ্তের সমকালে নারায়ণ দেবের কাব্য রচিত হয়েছিল। ডঃ আশুতোষ ভট্টচার্যও নারায়ণ

দেবের সময় পঞ্চদশ শতাব্দী বলে স্থির করেছেন। ডঃ তমোনাশ দাশগুপ্তের মতে, নারায়ণ দেবের সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। আবার ডঃ সুকুমার সেনের মতে ষোড়শ শতকের শেষ থেকে সপ্তদশ শতকের গোড়ায় নারায়ণ দেবের স্থান।

নারায়ণ দেবের কাব্যের নাম পদ্মাপুরাণ। কাব্যটি খণ্ডিত। বহু কবি অথবা গায়েনের ভণিতা আছে কাব্যের মধ্যে। ভণিতায় সুকবিবল্লভ উপাধি আছে। একটি পুঁথিতে ভণিতা আছে ঃ

সুকবি বল্লভ রামদেব নারায়ণ।

কারো কারো মতে, সুকবিবল্লভ নামে অন্য কোন কবি বা গায়েন নারায়ণ দেবের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে, কবির পূরা নাম রামনারায়ণ দেব। কাব্য রচনার উপলক্ষ্য বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে কবি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন।

কাব্য বিচার

নারায়ণ দেবের কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত ঃ প্রথম খণ্ডে কবির আত্মপরিচয় ও দেববন্দনা, দ্বিতীয় খণ্ডে পৌরাণিক উপাখ্যানসমূহ এবং তৃতীয় খণ্ডে চাঁদ-সওদাগরের উপাখ্যান। নারায়ণ দেবের কাব্যের জনপ্রিয়তা ছিল প্রচুর। কবি চন্দ্রাবতী দস্যু কেনারামের পালাতে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের কয়েক পঙ্ক্তি গ্রহণ করেছেন। আবার পশ্চিম বঙ্গের কবি ক্ষেমানন্দ নারায়ণ দেবকে প্রণতি জানিয়ে কাব্য আরম্ভ করেছেন। ডঃ তমোনাশ দাশগুপ্তের মতে, নারায়ণ দেবের প্রাচীন পুঁথিতে পুরাণাদির প্রভাব ও পুরাণ কাহিনী কম। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালের লিখিত পুঁথিতে পুরাণাদির প্রভাব গভীর। ডঃ দাশগুপ্ত সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে পৌরাণিক প্রসংগ কম। কিন্তু অন্যান্য পুঁথিতে পৌরাণিক প্রসংগ বিজয়গুপ্ত অপেক্ষা অধিক। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "দ্বিতীয় খণ্ডের পৌরাণিক আখ্যানসমূহই নারায়ণ দেবের কাব্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। মহাভারতের আস্তিক পর্ব, বিবিধ শৈব পুরাণ ও কালিদাসের

'কুমারসম্ভবম্' কাব্য প্রভৃতিই নারায়ণ দেবের রচিত মনসামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডের ভিত্তি।……নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল কাব্য বাংলা ভাষায় পৌরাণিক কাহিনীর এক বিশাল ভাণ্ডার।"

নারায়ণ দেবের কাব্যে সহজ কবিত্ব এবং প্রভূত পাণ্ডিত্যের সমন্বয় ঘটেছে। নারায়ণ দেব করুণ রসের কবি। তাঁর কাব্যে আদ্যন্ত করুণ রস প্রবাহিত। কাব্যের সমাপ্তিতে তিনি করুণ রসের প্রস্রবণ বইয়ে দিয়েছেন। সনকার বিলাপ থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করছি।

নারায়ণদেবের কবি প্রতিভা

পুত্র ২ বুলি সোনাঞি তুলিয়া লইল কোলে।
কান্দিয়া আকুল সোনাই লোটায় ভূমিতলে॥
বুকে মারে ঘাও সোনাই মুখে না আইসে রাও।
দুঃখিনি সোনাইরে হাসিয়া বোলান দেও॥
কোন রাজ্যে জাইব আমি তোমা না দেখিয়া।
পুত্রের কারণে মোর পুড়িয়া উঠে হিয়া॥
ছয়পুত্র মরণে লাগিল যত তাপ।
তুমি পুত্র লাগিয়া সাগরে দিব ঝাপ॥
চিতা সাজাইব আমি গুঞ্জড়িয়ার তিরে।
তোমা লইয়া প্রবেশিব চিতার উপরে॥

নারায়ণ দেব যেমন করুণ রসের কবি, তেমনি হাস্যরস সৃষ্টিতেও তিনি কম নৈপুণ্য দেখাননি। তাঁর কাব্য স্মিতহাস্যের বিদ্যুৎ চমকে মনোমুগ্ধকর। তাঁর কাব্যে কুরূপা এয়োর বর্ণনা :

কুরূপের প্রধান নাম তার ইছি।
দুই হাত পাও গোধ হইয়াছে বিচি॥
তাহার পাছে আইয় বেটী সিগ্র আইল ধাইয়া।
মাথা হনে পায়ের তলা দাউদে নিছে খাইয়া॥

হাটীতে না পারে বেটী দারুণ চুলের ভরে।
টানিঞা বান্ধীল খোপা ঘাড়ের উপরে ॥
লুটুনির ভরে তার ঘাড় ভাঙ্গি পড়ে।
খান চারি ঝাটা লইল দাউদ খাউজাইবারে ॥
তারে পাছে আইয় চলে নাম তার ভালা।
গলায়ে গলগণ্ড তার দুই চক্ষু ঢেলা ॥

বৃদ্ধা নিজের অকাল বার্ধক্যের কারণ বর্ণনা প্রসংগে বলছে:

চুলপাকা যে কারণ শুন তার বিবরণ
ঔষদ করিল সতিনে।
অনেক খাইলাম কাফুর তেকারণে দন্ত চুর
বুড়ি হেন না ভাবিয় মনে ॥

এ চিত্র যে চিরন্তন। বার্ধক্যে বয়স কমাবার মর্মান্তিক অথচ কৌতুককর চেষ্টা সর্বকালেই দেখা যায়।

আর এক বৃদ্ধার বর্ণনা প্রসংগে নারায়ণ দেব বলছেন:

দর্পণ হাতে লইয়া আপনার মুখ চাইয়া
গালে বুড়ি মারিলেক চড় ॥
জখন জোবন মোর নাগরে নালৈ ঘর
হেন বস কথা গেল মোর ॥

বিগত যৌবনা নারীর পক্ষে যৌবনের জন্য আক্ষেপও মর্মান্তিত—কিন্তু কৌতুকাবহ। সে যুগের অন্যান্য কবিদের মত নারায়ণ দেবের হাস্যরসও স্থানে স্থানে স্থূল ও গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট।

নারায়ণ দেবের কাব্যে ঐতিহাসিক উপাদান প্রচুর। মধ্যযুগের বাঙ্গালা-দেশের একটি সামগ্রিক সমাজচিত্র তাঁর কাব্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তারকার রন্ধন, লখীন্দরের বাসরঘরে হাস্যকৌতুক, চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রা,—

নানা দেশ ও নদনদীর বিবরণ,—নানাবিধ সর্পের বিবরণ, পল্লীগ্রামের সুখদুঃখ সামাজিক রীতিনীতিতে পরিপূর্ণ নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ।

চরিত্র সৃষ্টিতেও নারায়ণ দেব আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নিপুণ চিত্রকরের মত সুকবি নারায়ণ দেব বেহুলা চরিত্রের বিচিত্র ঘটনা ও অনুভূতি চিত্রিত করেছেন। কোমলে কঠোরে গড়া মৃদুতা ও তেজস্বিতার সমন্বিত মূর্তি নারায়ণ দেবের বেহুলা। তাঁর পাশে লখীন্দর ম্লান নিষ্প্রভ। বেহুলার যাত্রাপথে জমদানীর স্ত্রী, গোধা, ধনামনা, বঙ্গাই সাধু প্রভৃতি খল ও দুষ্ট চরিত্র অংকনে কবি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সব চরিত্র বর্ণনাকালে কবি অল্পবিস্তর রসিকতাও করেছেন। নারায়ণ দেব চাঁদ সওদাগরের চরিত্রে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রেখে চরিত্রটির গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছেন। তার কাব্যে চাঁদ সওদাগর মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে একটি ফুল ছুঁড়ে দিয়ে মনসার পূজা করে স্নেহের কাছে নতি স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিজয়গুপ্ত চাঁদকে দিয়ে সাড়ম্বরে মনসাপূজা করিয়ে চরিত্রটির গৌরব ক্ষুন্ন করেছেন।

ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস ঃ

ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি। পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে, ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস দুইজন ভিন্ন ভিন্ন কবি। একালের সকল পণ্ডিতই একমত যে, ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস একজনই। কেতকা মনসার এক নাম—কারণ ক্ষেমানন্দের মতে মনসা কেয়া পাতায় জন্ম নিয়েছিলেন। সুতরাং ক্ষেমানন্দ কবির নাম ও কেতকাদাস উপাধি—এই ধারণাই সর্বজনীন। ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র সর্বশেষ সংস্করণে লিখেছেন যে কবির নাম কেতকাদাস আর তাঁর উপাধি ক্ষেমানন্দ; কারণ, ক্ষেমানন্দ ভণিতা আরও দু'তিনজন কবি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কেতকাদাস ভণিতা কেউই ব্যবহার করেননি।

ক্ষেমানন্দ কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের অনুসরণে যে বিস্তৃত আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ

করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে কবির পিতা শংকর মণ্ডল স্থানীয় শাসনকর্তা বারা খাঁর কর্মচারী ছিলেন। কবির ছোট ভাইএর নাম অভিরাম। কবি বেহুলার যাত্রাপথের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে বর্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলির এবং বর্ধমানের পূর্বে বেহুলা ও গাঙুড় নামক দামোদরের মরা খাতের গতিপথের বিবরণ আছে। মনে হয়, কবি বর্ধমানের নিকটবর্তী কোন গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ক্ষেমানন্দের কাব্যে বারা খাঁর উল্লেখ আছে। তিনি দক্ষিণ রাঢ়ের সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে বারা খাঁ প্রদত্ত একটি দানপত্র পাওয়া গেছে। এই সময়ের কিছু পরে কেতকাদাসের মনসামঙ্গল রচিত হয়। এ থেকে অনুমান করা হয় যে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল। এই আত্মবিবরণীতে বিষ্ণুদাস ও ভারামল্ল ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এঁরাও ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। ক্ষেমানন্দের কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের উল্লেখ আছে বহু স্থানে এবং মুকুন্দরামের প্রভাবও সুস্পষ্ট। ক্ষেমানন্দেরও সম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া যায়নি।

সহৃদয়তা ও সরলতা ক্ষেমানন্দের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর ভাষা স্বচ্ছ সরল প্রসাদগুণ যুক্ত এবং গ্রাম্যতা দোষমুক্ত। তিনি তাঁর রচনায় উচ্চতর আদর্শ সর্বত্রই রক্ষা করতে পেরেছেন এবং শিথিলতা বর্জন করেছেন। ক্ষেমানন্দের কাব্যে পৌরাণিক কাহিনী অত্যন্ত নগণ্য। চাঁদ সওদাগরের কাহিনীই তাঁর কাব্যে বৃহত্তম স্থান দখল করে আছে। কেতকাদাসের হাতে

ক্ষেমানন্দের কবিত্ব

বেহুলার চরিত্র সুন্দরভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। বেহুলার স্নিগ্ধ কোমল তেজস্বিনী মূর্তিটি ক্ষেমানন্দ দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ক্ষেমানন্দের বেহুলা চরিত্র সম্বন্ধে লিখেছেন, "কেতকাদাসের বিশেষত্ব এই যে বেহুলা এখানে কেবল একটা আদর্শের প্রতিলিপি নয়, রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন। বেদনায়, শোকে, দুঃখে তিনি কাঁদিয়া সকলকে কাঁদাইয়াছেন, বুদ্ধিকৌশল

প্রয়োগে সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন, অশ্রু ও হাসিতে পরিপূর্ণ জীবনের সৃষ্টি হইয়াছে।" (মনসামঙ্গলের ভূমিকা)।

চাঁদ সওদাগরের চরিত্রসৃষ্টিতে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চাঁদের চরিত্রে দৃঢ়তা মোটামুটি সর্বত্রই রক্ষিত হয়েছে। বাসরঘরে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে চাঁদ পুত্রশোকে অশ্রুবিসর্জন না করে প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠেছেন। মনসার উপরে প্রতিহিংসা নেবার পথে যে প্রতিবন্ধক ছিল সে মরে গেছে,—উন্মাদ হয়ে চাঁদ হেতালের লাঠি কাঁধে করে নৃত্য শুরু করেছেন।

শুনিয়া যে চাঁদ বেণে হরষিত হৈল।
স্কন্ধে হেতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল॥
ভাল হৈল পুত্র মৈল কি তার বিষাদ।
চেঙ্গীমুড়ী কানীর সহ ঘুচিল বিবাদ॥

* * * *

লখাই বাসরে মৈল চাঁদ বান্যা বার্তা পল্যে
পুত্রশোকে শুকাইল হিয়া।
বিভাদিনে চাঁদ বান্যা পুত্রের মরণ শুন্যা
নাচে হেতালের বাড়ি লইয়া।
লখাই মৈল ভাল হৈল
নির্ভয় হৈনু মনে চেঙ্গমুড়ী কানী সনে
এতদিনে বিবাদ ঘুচিল॥

বেহুলা স্বামী ও ভাসুরদের সঙ্গে ফিরে এলে সকল আত্মীয়-পরিজন চাঁদকে অনুরোধ করে মনসাপূজা করতে। তখন—

চাঁদ বেনে বলে মম বড় অপমান।
কেমনে করিব মনে মনসার ধ্যান॥
বাদ বিসম্বাদ ছিল যাহার সঙ্গে কালি।
কোন লাজে তাহার লইব পদধূলি॥

চেঙ্গমুড়ী বলিয়া যাহারে দিলাম গালি।
কোন মুখে তার আগে হব পুটাঞ্জলি॥
এই বড় অপমান হইল আমার।
কেমনে পূজিব পদ দেবী মনসার॥
যেই হাতে পূজি আমি সোনার গন্ধেশ্বরী।
কেমনে পূজিব তাহে জয় বিষহরি॥

কবি চাঁদের মানসিক দ্বন্দ্বটুকু প্রকাশ করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। অবশেষে চাঁদ সাড়ম্বরে মনসাপূজা করেছেন। ক্ষেমানন্দ চাঁদের চরিত্রের ক্রমপরিণতি দেখিয়েছেন। তথাপি চাঁদের চরিত্রে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। ক্ষেমানন্দ বিজয় গুপ্তের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন।

উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলংকার ব্যবহারে ক্ষেমানন্দ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তৎসম শব্দের ব্যবহারেও তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কিন্তু পরিচ্ছন্ন চাঁচাছোলা ভাষা ব্যবহারই ক্ষেমানন্দকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

ক্ষেমানন্দ উচ্চ কবিত্বশক্তির অধিকারী। জীবনের উপরিভাগে সুখদুঃখের বিচিত্র তরঙ্গাভিব্যক্তি তাঁর কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছে। দেবসভায় নৃত্যরতা বেহুলার চরিত্রটি তাঁর হাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। করুণ রস সৃষ্টিতেও কবির দক্ষতা স্বল্প নয়। করুণ রসের এই কাব্যটিতে ক্ষেমানন্দ সার্থকভাবেই কারুণ্য সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন। বেহুলার দুঃখ বেদনার মর্মন্তুদ চিত্রও তিনি দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন। বাসরঘরে লখীন্দরের মৃত্যুতে বেহুলার করুণ বিলাপ পাঠকের চোখ অশ্রুসজল করে তোলে।

বড় পাই তাপ তাহে দংশে সাপ
মনসা লাগিল বাদে।
দুঃখে ফাটে হিয়া ও মুখ চাহিয়া
এই বলে সদা কান্দে॥

হেম জিনি অঙ্গ সহজে সুভঙ্গ
বিষম বিষে হইল কালি ॥
খণ্ড কপালিনী আমি অভাগিনী
কেবা দিল শাপ গালি ॥ ইত্যাদি।

ক্ষেমানন্দের কাব্যে সনকার বিলাপ ঃ

শুনিয়া বিদরে প্রাণ চক্ষে পড়ে পানি।
মরা পুত্র কোলে করি কান্দয় বেণেনী ॥
পুত্রশোকে দিতে বেহুলা এতদিন ছিলে।
দুলভ নখাই মোর না জানি কি কৈলে ॥
হাপুতির পুত মোর বাছা নখীন্দর।
তোমা লাগি গড়াইলাম লোহার বাসর ॥
কার শাপ ফলিল কে মোরে দিল গালি।
বংশে কেহ না রহিল দিতে জলাঞ্জলি ॥

বেহুলা ও সনকার বিলাপের সঙ্গে একত্রে যখন পড়ি চাঁদের হেতালের লাঠি নিয়ে উন্মাদ নৃত্যের কথা এবং চাঁদের "নখাই মৈল ভাল হৈল" ইত্যাদি উক্তি, তখন করুণ রসের প্লাবনে পাঠকের অন্তরে দুকূল প্লাবিত হয়ে যায়। তখন কবির করুণ রস সৃষ্টির দক্ষতায় বিস্মিত না হয়ে পারি না।

বিপ্রদাস পিপ্পলাই ঃ

ডঃ সুকুমার সেন বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলকে সবচেয়ে পুরানো মনসামঙ্গল রূপে গ্রহণ করেছেন। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলটি অখণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে এবং ডঃ সুকুমার সেনের সম্পাদনায় এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বিপ্রদাস তাঁর কাব্যটিকে মনসামঙ্গল এবং মনসাবিজয় উভয় আখ্যাই দিয়েছেন। ডঃ সেন বিপ্রদাসের কাব্যটির মনসাবিজয় নামটিই গ্রহণ করেছেন। বিপ্রদাস কাব্যরচনার কাল সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ
নৃপতি হুসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।
হেন কালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পিরীত।

এই শ্লোক থেকে জানা যায় যে ১৪১৭ শকাব্দে বা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহের রাজত্বকালে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। বিপ্রদাসের আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে, কবি সামবেদীয় পিপ্পলাদ শাখার বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, তাঁর পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত, বাসভূমি চব্বিশ পরগণা জেলার নাতুড্যা বটগ্রাম। বিপ্রদাসের কাব্যের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ভারতচন্দ্র ও ঘনরামকে স্মরণ করায়। তাঁর কাব্যে চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা সম্পর্কে কুমারহাট, হুগলী, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, ভদ্রেশ্বর, ইছাপুর, খড়দহ, শ্রীপাট, রিষড়া, কোন্নগর, কামারহাটি, এড়েদহ, চিৎপুর, কলিকাতা প্রভৃতি আধুনিক স্থানের নামোল্লেখ আছে। বিপ্রদাসের কাব্যের আধুনিক ভাষা, সন তারিখের যথাযথ উল্লেখ, আধুনিক প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ প্রভৃতির জন্য এই কাব্যটিকে অনেকেই প্রাচীন যুগের বলে স্বীকার করতে চান না। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যটিকে ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তীকালের বলে গণ্য করেছেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, বিপ্রদাসের কাব্যের ভাষা অনেকটা আধুনিক হলেও অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকায় প্রাচীনতার ছাপ একেবারে বিলুপ্ত হয়নি এবং কলিকাতা খড়দহ প্রভৃতি আধুনিক প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখগুলি প্রক্ষিপ্ত।

বিপ্রদাসের কাব্যে মনসামঙ্গলের ধারাবাহিক সম্পূর্ণ উপাখ্যান পাওয়া যায়। বহু বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে সঙ্গতিবিধান বিপ্রদাসের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। বিপ্রদাসের বর্ণনা সহজ সরল চিত্তাকর্ষক এবং আতিশয্যবর্জিত। দেব ও মানব চরিত্রগুলির বর্ণনা সুসঙ্গত। বিপ্রদাসের কাব্যে একটি ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে। নারী চরিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হয়েছে। কবি পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডিত্য কাব্যে গুরুভার হয়ে

কাব্য বিচার

ওঠেনি। কবির আন্তরিকতা এবং দেবভক্তি কাব্যটিকে স্নিগ্ধ ও মনোরম করে তুলেছে। কাব্যটিতে কবি নানাবিধ বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। নানাবিধ রাগরাগিণীর উল্লেখও আছে কাব্যে। বিপ্রদাসের কাব্য অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষমুক্ত।

বিপ্রদাসের কাব্যে হাসান-হোসেনের পালাটি বেশ বড় এবং সুপরিকল্পিত। বিপ্রদাস মনসা চরিত্রে স্নেহমমতা ও করুণার সঞ্চার করেছেন। অন্যান্য কবিদের মনসামঙ্গলের তুলনায় বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে মনসা চরিত্রটি একটি বিশিষ্টতা লাভ করেছে। চাঁদ সওদাগরের চরিত্র সু-অঙ্কিত হলেও অন্যান্য অনেক কবির মত বিপ্রদাস চাঁদের চরিত্রে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেননি। কাব্যের শেষে চাঁদ সাড়ম্বরে সপরিবার মনসার পূজা করেছেন।

অনেক প্রকারে স্তুতি করে চাঁদো রাজা
নানাবিধ প্রকারে করয়ে পদ্মা পূজা।
পরম ভকতি পূজে মুনি জরৎকার
পদ্মার তনয় পূজে আস্তিক কুমার।

চাঁদ মনসার এমনই ভক্ত হয়ে পড়েছেন যে মনসা-বিরোধিতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে মনসার কাছে শাস্তি প্রার্থনা করেছেন।

তবে চাঁদো করজোড়ে করে নিবেদন
বহু নিন্দা কৈলে মুঞি এ পাপ বদন।
মস্তক উপরে করো চরণ প্রহার
দোষ নিন্দা এবে শাস্তি হউক আমার।

মনসামঙ্গলের অপর কোন কবি চাঁদ সওদাগরের এই দুর্গতি বর্ণনা করেননি। বিপ্রদাসের কাব্যে মনসা ছলনা করে বিবাহের পূর্বেই বেহুলাকে বাসরঘরে বিধবা হওয়ার অভিশাপ দিয়েছেন। বিপ্রদাসের কাব্যে হাস্যরসের পরিবেষণ নগণ্য হলেও কৌতুকাবহ চিত্রের অভাব নেই। মনসার সঙ্গে বিরোধের ফলে বড় মিঞার মৃত্যু হলে বাড়ী চাকরবাকরদের মনোভাবটি সুন্দরভাবে ফুটেছে।

মিঞা যবে ফৌত হইল　　　　গোলামের খোষ পাইল
বিবি লইয়া পলাইতে চায়।

লখীন্দরের বিবাহ রাত্রিতে চাঁদের বর্ণনা ঃ

চাঁদো রাজা নাচে কান্ধে হেতালের বাড়ি
ঝলমল করে মুখে পাকা গোঁপ দাড়ি।

বেহুলাকে ছলনাকালে মনসার রূপ ঃ

হেনকালে তথা মায়া পাতে পদ্মাবতী
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে আইসে শীঘ্রগতি।
প্রচুর ধবল কেশ বাঁধিতে না পারে
আকাশে চাহিতে পড়ে ঘাড়ের উপরে।

*　　　*　　　*

খণ্ড খণ্ড বসন বদনে দন্ত বোড়া
খঞ্জ গমনী দেবী দুই পদ খোড়া।
সঘন নিমগ্ন আখি মন্দ দৃষ্টি চায়
গভীর আকার শির শোভে সর্বগায়।

বিপ্রদাসের কাব্যে করুণ রসের প্রাবল্য না থাকলেও করুণ রসের বর্ণনাতেও কবির দক্ষতা আছে। লখীন্দরের বর্ণনাতে সনকার শোক ঃ

হাহাকার সনকা লখাই করি কোলে
বদনে বদন দিয়া সঘন নেহালে।

*　　　*　　　*

চিয় রে প্রাণের পুত্র দেও সম্বোধন
পড়িল ধরণীতলে হরিয়া চেতন।
উঠ উঠ লখিন্দর সোনার পুথলি
পূর্ণিমার চন্দ্র পুনি কারে দিনু ডালি।

*　　　*　　　*

হত অভাগিনী আমি এ মহীমণ্ডলে
ধরিতে না পারি প্রাণ ঝাপ দিব জলে।
অগ্নি কুণ্ডে প্রবেশিব তোমারে লাগিয়া
তোমা পুত্র পাব আমি যমপুরে গিয়া।

পুত্রের মৃত্যুতে চাঁদের শোক :

কান্দিয়া করুণা ভাবে চাঁদো নরপতি
পুত্র পুত্র বলিয়া সম্ভ্রমে পড়ে ক্ষিতি।
কত পাপ কৈনু মুঞি জন্মিয়া ভূতলে
কত দুঃখ বিধি মোর লিখিল কপালে।

সবদিক থেকে বিচার করলে বিপ্রদাসকে বিজয়গুপ্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া যায়। বিপ্রদাস যে মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দ্বিজ বংশীদাস :

পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের অন্যতম প্রধান কবি দ্বিজ বংশীদাস। দ্বিজ বংশীদাসের মুদ্রিত পুঁথিতে যে আত্মবিবরণী আছে, তা থেকে জানা যায় যে কবির এক পূর্বপুরুষ রাঢ় দেশ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত পাতোয়ারী গ্রামে বসবাস করেছেন। এখানেই বংশীদাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম অঞ্জনা! কবি ছিলেন বন্দ্যবংশীয়। বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনা করেছিলেন। বংশীদাসের আত্মবিবরণীতে কালজ্ঞাপক পয়ারটি এই :

জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রাঢ়ে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার॥

পয়ারটির অর্থ : বংশীদাস ১৪৯৭ শকাব্দ বা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে পদ্মাপুরাণ রচনা করেছিলেন। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতগণ বংশীদাসকে এত প্রাচীনকালের কবি বলে মনে করেন না।

সাধারণতঃ বংশীদাসকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপন করা হয়। ডঃ সুকুমার সেন বংশীদাসকে সপ্তদশ শতকেও ফেলতে রাজী নন। বংশীদাসের আত্মবিবরণীতে হাজরাদি পরগণার অন্তর্গত পাতুয়ারী গ্রামের কথা বলা হয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে, ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে বার ভুঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁ মানসিংহ কর্তৃক পরাজিত হওয়ার পরে হাজরাদি পরগণার সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিজ বংশীদাসের রচনায় মগ ফিরিঙ্গির বন্দুক-গুলির ব্যবসায়ের উল্লেখ থেকেও বংশীদাসকে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে গণ্য করা যায় না। দ্বিজবংশীর অধস্তন সপ্তম পুরুষের হিসাবে তাঁকে আরও পরে স্থাপন করতে হয়। অধিকাংশ পণ্ডিতের ধারণা যে কালজ্ঞাপক পয়ারটি প্রক্ষিপ্ত।

দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গল বৃহৎ কাব্য। সংস্কৃত পুরাণাদিতে কবির গভীর জ্ঞান ছিল। দেবখণ্ডে কবি পুরাণের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। শিবের তপস্যা, মদনভস্ম, হরপার্বতীর পরিণয়, কার্তিকেয়ের জন্ম ইত্যাদি ঘটনা বর্ণনায় কবি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের উপাদান গ্রহণ করেছেন। চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে মনসার বিরোধের পূর্বে বংশীদাস কাজির সঙ্গে মনসার বিরোধ ও ধন্বন্তরিবধের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের বিবরণও তিনি দিয়েছেন। বংশী-দাসের কাব্যে চাঁদ সওদাগরের বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর কাব্যে চাঁদ সওদাগর চণ্ডীর ভক্ত, যদিও শিবের প্রতি চাঁদের শ্রদ্ধা আছে। চণ্ডীর আদেশেই চাঁদের সঙ্গে মনসার বিরোধ। মনসা ও চণ্ডীর বিবাদের মধ্যেই চাঁদের জীবনে এসেছে দুর্দৈব। শেষ পর্যন্ত মহাদেবের মধ্যস্থতায় বিমাতা ও সপত্নীকন্যার বিবাদ মিটেছে। চণ্ডী ও মনসার বিবাদের মাঝে পড়ে চণ্ডীর আশ্রিত চন্দ্রধরের চরিত্রমহিমা কতকটা হীনপ্রভ হয়ে গেছে। চাঁদের বলদর্পিত মনসা-বিরোধিতা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠেনি। দ্বিজ বংশীদাস করুণ রসের কবি। করুণ রস সৃজনে তিনি সিদ্ধহস্ত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "মনসামঙ্গল কাব্য যে করুণ রসের আকর অন্তরের সহজ ভাবানুভূতি হইতে বংশীদাস

কবিত্ব

তাঁহার কাব্যে তাহা উৎসারিত করিয়াছেন।” বংশীদাসের লেখনী প্রসূত বেহুলার বিলাপ নিম্নরূপ :

প্রভু আমা বঞ্চি গেলা কোন দোষ পাইয়া
বারেক বোলন দাও অভাগীর চাইয়া ॥
আমারে অনাথা করি গেলা কোন দোষে।
অভাগিনী বিপুলারে সঁপি কার পাশে ॥

কবি করুণ রস সৃষ্টিতে দক্ষ হলেও মাঝে মাঝে হাস্যরসের জ্যোতি তাঁর কাব্যকে উদ্ভাসিত করেছে এবং হাস্যরসের বর্ণনাতেও তিনি ব্যর্থ নন। বংশীদাস পণ্ডিত লোক ছিলেন। তাঁর কাব্যে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ আছে। সংস্কৃত অলংকার তিনি কাব্যে প্রয়োগ করেছেন। বংশীদাস ছিলেন ভক্ত ও সাধক কবি। তিনি নিজে গায়কও ছিলেন। কবি সম্ভবতঃ শক্তির উপাসক ছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবীয় প্রভাবও তাঁর কাব্যে পড়েছে। ভক্তের আন্তরিক ভক্তির স্পর্শে বংশীদাসের কাব্য হয়ে উঠেছে প্রাণস্পর্শী। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন : “সহজ নিরলঙ্কারা ভাষায় ব্যক্ত মনের গভীর ভাবটি পাঠকের মর্মতলে গিয়া স্পর্শ করে। ভক্ত সাধকের দৃষ্টির সঙ্গে সহজ কবিত্বের শুচিদৃষ্টি মিলিত হইয়া তাঁহার কাব্যে মণিকাঞ্চন যোগ সৃষ্টি করিয়াছে।”

তন্ত্রবিভূতি :

বিভূতি উত্তরবঙ্গের এক প্রাচীন কবি। ডঃ আশুতোষ দাস প্রথমে উত্তরবঙ্গ থেকে তন্ত্রবিভূতির পুঁথির সন্ধান পান। উত্তরবঙ্গের অপর একজন কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে তন্ত্রবিভূতির প্রভাব পড়েছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল তন্ত্রবিভূতির কাব্য প্রায় আত্মসাৎ করেছেন। ডঃ সেনের মতে, বিভূতি জাতিতে তাঁতী হওয়ার জন্যেই তন্ত্রবিভূতি নাম ব্যবহার করেছেন।

উত্তর বঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যে একটা স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। তন্ত্রবিভূতি যে অংশগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, জগজ্জীবনের কাব্যে সেই অংশগুলিই সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তন্ত্রবিভূতির ভাষা ও বর্ণনায় সংযম আছে। জগজ্জীবনের কাব্যে আদিরসের যে বাড়াবাড়ি দেখা যায়, তন্ত্রবিভূতির কাব্যে তা বহুলাংশে সংযত। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তন্ত্রবিভূতির কাব্য সম্পর্কে লিখেছেন, "কাব্য-বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ আদিরসাত্মক সংযম প্রভৃতি আলোচনা করিয়া আমাদের স্পষ্ট ধারণা হইয়াছে যে, তন্ত্রবিভূতির রচনাশক্তি অনেক বেশী সংহত, ঋজুগতি, ভাষাবিন্যাসেও আমরা জগজ্জীবন অপেক্ষা তন্ত্রবিভূতিরই অধিকতর পক্ষপাতী; সর্বোপরি শালীনতা, লোকচরিত্রজ্ঞান ও বাস্তব চিত্রাঙ্কনে তন্ত্রবিভূতির কোন কোন অংশ মনসামঙ্গলের অনেক কবিকেই ম্লান করিয়া দিবে।"

বিশিষ্টতা

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড)

জগজ্জীবন ঘোষাল ঃ

দিনাজপুরের অন্তর্গত কোচ আমোরা বা কুড়িয়ামোড়া গ্রামে জগজ্জীবন ঘোষালের বাসভূমি ছিল। কবি দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের সমসাময়িক ছিলেন। কবির পিতামহের নাম জয়ানন্দ, পিতা রূপ রায়চৌধুরী, মাতা রেবতী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঘনশ্যাম, পত্নী পদ্মমুখী। জগজ্জীবনের কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়েছিল।

জগজ্জীবনের কাব্য দেবখণ্ড ও বণিক খণ্ড এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। কাহিনী গতানুগতিক। জগজ্জীবন তাঁর কাব্যে যে সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ দিয়েছেন তা তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও নাথসাহিত্যের অনুরূপ। জগজ্জীবনের রচনায় করুণরস সম্যক্ স্ফূর্তিলাভ করেনি। জগজ্জীবনের কাব্যে আদিরসের ছড়াছড়ি এবং বাড়াবাড়ি আছে। গ্রাম্যতা দোষও প্রচুর। লখীন্দরের মাতুলানী ধর্ষণের বর্ণনা আধুনিক রুচিকে

কাব্য বিচার

তীব্র আঘাত করে। তবে জগজ্জীবনের কাব্যে একটি সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাম্য সুখদুঃখের বর্ণনা, পারিবারিক জীবন, আঞ্চলিক সমাজ চিত্রণ, আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার প্রভৃতি কারণে জগজ্জীবনের কাব্য একটি বিশিষ্টতা লাভ করেছে। কবির সংস্কৃত পুরাণাদিতে জ্ঞান ছিল প্রচুর। ছন্দনৈপুণ্য, তৎসম শব্দের প্রয়োগ, অলংকার ব্যবহার প্রভৃতি কবির বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দেয়।

জীবন মৈত্র ঃ

উত্তরবঙ্গের অন্যতম মনসামঙ্গল রচয়িতা জীবনকৃষ্ণ মৈত্র। করতোয়া নদীর তীরে লাহিড়ীপাড়া গ্রামে জীবন মৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম স্বর্ণমালা, পিতার নাম অনন্ত। কবি নিজেকে নাটোরের রাণী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের আশ্রিত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি কাব্য রচনার যে সময় নির্দেশ করেছেন তাতে জানা যায় যে ১১৫১ বঙ্গাব্দে বা ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে জীবন মৈত্রের কাব্য রচিত হয়।

জীবন মৈত্রের কাব্য আকৃতিতে বেশ বড়। দেবখণ্ড ও বণিক খণ্ডে যথারীতি স্বর্গ ও মর্তের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। দেবখণ্ডে 'ঊষাহরণ' নামে একটি স্বতন্ত্র উপাখ্যান সংযুক্ত হয়েছে। জীবন মৈত্রের কাব্যে বেহুলার পিতার নাম বাহো সদাগর, মাতার নাম মেনকা, ভ্রাতার নাম শঙ্খধর, বেহুলার নাম বেললি। আরও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বেহুলা যখন কলার মান্দাসে ভেসে চলেছেন স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে তখন বাণিজ্য-প্রত্যাগত ভ্রাতা শঙ্খধর চিনতে না পেরে ভগিনীকে প্রণয় নিবেদন করে, পরে বেহুলার পরিচয় পেয়ে লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হয়।

কাব্য বিচার

জীবন মৈত্রের কাব্যে সংস্কৃতবাহুল্য আছে। তবে ভাষার গতিশীলতা বিনষ্ট হয়নি—তৎসম শব্দের প্রয়োগ ভাষাকে আড়ষ্ট করে তোলেনি। সংস্কৃত অলংকারের যথেচ্ছ প্রয়োগ কবি করেছেন। কবির পাণ্ডিত্য কাব্যে সুপ্রকট।

পাণ্ডিত্য কখনও কখনও গুরুভার হয়ে উঠেছে। তবে সংসারের বাস্তব চিত্র রচনায় কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। করুণ রসের বর্ণনাতেও তাঁর শক্তির পরিচয় আছে। পুত্রহারা সনকা ও পতিহারা বেহুলার বিলাপ মর্মস্পর্শী ভাবে বর্ণিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য মনসামঙ্গলের কবির মত আদিরসের বাড়াবাড়ী আছে জীবন মৈত্রের কাব্যে। গ্রাম্যতা দোষও আছে। এইগুলি জগজ্জীবন ঘোষালের প্রভাবের ফল বলে মত প্রকাশ করেছেন ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষষ্ঠীবর দত্ত ঃ

পূর্ববঙ্গের অন্যতম খ্যাতিমান কবি ষষ্ঠীবর দত্ত শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর কাব্য এবং কবিত্বখ্যাতি এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রণেতা বসন্তকুমার সেনগুপ্ত কুলপঞ্জী অনুসরণে লিখেছেন যে, ষষ্ঠীবর দত্ত শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত মৌলবীবাজার মহকুমায় ডায়ঘর গ্রামের দত্তবংশের পূর্বপুরুষ। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল গুণরাজ খাঁ। কবির পিতার নাম ভুবনানন্দ, পিতামহের নাম পুরুষোত্তম। কেউ কেউ মনে করেন যে কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম হৃদয়ানন্দ। ডঃ সুকুমার সেন ষষ্ঠীবরের মুদ্রিত কাব্যের ভাষা বিচারে স্থির করেছেন যে কাব্যটির রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্বে নয়। কাব্যের স্থানে স্থানে ভারতচন্দ্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গের কবি হওয়া সত্ত্বেও ষষ্ঠীবরের কাব্যে নারায়ণ দেবের প্রভাব লক্ষিত হয় না।

ষষ্ঠীবরের কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্তঃ দেবখণ্ড, বণিক খণ্ড ও স্বর্গারোহণ খণ্ড। দেবখণ্ডে পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই অংশটি সংক্ষিপ্ত এবং সংহত। হরগৌরীর কাহিনীতে মৌলিকতা আছে।

কাব্য বিচার

বণিক খণ্ড গতানুগতিক, এতে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নেই। স্বর্গারোহণ খণ্ডে বেহুলা-লখীন্দর বেশী ঊষা-অনিরুদ্ধের স্বর্গারোহণ বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠীবরের কাব্যে উচ্চ প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

বিষ্ণু পাল ঃ

বীরভূম জেলায় বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তা আছে। বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চলে এবং বীরভূমে বিষ্ণু পালের পুঁথি পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ কবি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। জনশ্রুতি এই যে কবি জাতিতে কুম্ভকার ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন কাব্যের ভাষা বিচার করে বিষ্ণু পালকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি বলেছেন।

বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলে ধর্মমঙ্গলের অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা আছে, ধর্মপূজা ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রভাবও আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অনুসরণে বিষ্ণু পাল তাঁর কাব্যকে আটটি পালায় বিভক্ত করেছেন। তাই বিষ্ণু পালের

কাব্য বিচার

কাব্য অষ্টমঙ্গলা নামেও পরিচিত। বিষ্ণু পালের ভাষা আধুনিক। রচনায় দৃঢ়বন্ধন নেই; ছন্দও শিথিল। সর্বত্র অক্ষরের সমতা নেই; কোথাও বা মিলও নেই। তাঁর কাব্যে বীরভূম অঞ্চলের কথ্য ভাষার প্রয়োগ আছে। ভাষার ইতিহাসের দিক থেকে কাব্যটির মূল্য আছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, প্রচুর লোকোক্তি ছড়া এবং মেয়েলী ছড়া থাকার জন্য বিষ্ণু পালের কাব্য বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। প্রহেলিকা জাতীয় পদগুলি কৌতুকরস সৃষ্টি করেছে। কবির পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে কাব্যে; কিন্তু পাণ্ডিত্য তাঁর রচনাকে সংহত আকার দান করেনি। রচনায় লোকপ্রচলিত কাহিনী স্থান পাওয়ায় কাহিনীটিও বিশিষ্টতা পেয়েছে। কিন্তু কাহিনীর বন্ধন শিথিল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, সহজ ভাষায় পৌরাণিক রস পরিবেষণের জন্য বিষ্ণু পালের জনপ্রিয়তা।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্ভব সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা না গেলেও ষোড়শ শতকের পূর্বে পঞ্চদশ কিম্বা চতুর্দশ শতাব্দীতে এর উদ্ভব একথা গ্রহণ করা চলে। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, "মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।"

এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মহাপ্রভুর সমকালে শুধু মঙ্গলচণ্ডীর পূজা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই নয়, চণ্ডীমঙ্গল গানও জনপ্রিয় হয়েছিল এবং রাত্রি জেগে মানুষ এই গান শুনতো। বোধহয়, জাগরণ পালারই ইঙ্গিত দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম তাঁর পূর্ববর্তী কবি মাণিক দত্তকে এই কাব্যের আদি কবিরূপে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং অনুমান হয় যে মাণিক দত্ত খৃষ্টীয় চতুর্দশ কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন।

চণ্ডীমঙ্গলের উদ্ভব

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুটি উপাখ্যান। একটি কালকেতুর উপাখ্যান, অন্যটি ধনপতির উপাখ্যান। প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীমঙ্গলের তিনটি খণ্ড—দেবখণ্ড, আখেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ড। দেবখণ্ডে পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা, দক্ষযজ্ঞ—সতীর দেহত্যাগ—হিমালয়কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ,—হরগৌরীর সংসাযাত্রা,—অভাব অনটন,—দাম্পত্য কলহ,—চণ্ডীর মর্তে পূজা প্রচারের বাসনা ও ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে মর্তে পূজা প্রচারের জন্য প্রেরণ—দেবখণ্ডের বিষয়বস্তু। আখেটিক খণ্ড এবং বণিক খণ্ডে যথাক্রমে কালকেতু ও ধনপতির উপাখ্যান।

উপাখ্যান

কালকেতুর উপাখ্যানঃ

দেবরাজ ইন্দ্র শিবপূজার জন্য পুত্র নীলাম্বরকে প্রতিদিন পাঠাতেন ফুল তুলতে। একদিন চণ্ডীর মায়ায় নীলাম্বর ফুল না পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে বিজু বনে এসে হাজির হলেন। এখানে ধর্মকেতু ব্যাধের হরিণ শিকার দৃশ্য দেখতে দেখতে নীলাম্বর নিজের কাজ বিস্মৃত হলেন। অনেক বিলম্বে তিনি ফুল তুলে আনলেন। ফুলের মধ্যে চণ্ডী কীট হয়ে লুকিয়ে রইলেন। ইন্দ্র সেই ফুল দিয়ে শিবপূজা করলে কীটরূপিনী চণ্ডী শিবকে দংশন করলেন। শিব যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হওয়ায় ইন্দ্র নীলাম্বরকে ডাকালেন। নীলাম্বর মর্তে ব্যাধের শিকার দৃশ্যদর্শনজাত বিলম্বের কথা ব্যক্ত করলে শিব অভিশাপ

দিলেন নীলাম্বরকে বাধ্য হয়ে জন্মাতে। তবে শিব নীলাম্বরকে এ আশ্বাসও দিলেন যে বিশ বৎসর পরে মর্তে চণ্ডীপূজা প্রচার করে নীলাম্বর স্বস্থানে ফিরে আসবেন। নীলাম্বর জাহ্নবী জলে আত্মবিসর্জন দিলেন; নীলাম্বর-পত্নী ছায়াও স্বামীর অনুমৃতা হলেন। দু'জনেই মর্তে ব্যাধের ঘরে জন্ম নিলেন।

নীলাম্বর ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্র কালকেতুরূপে জন্মগ্রহণ করলেন আর ছায়া সঞ্জয়কেতু ব্যাধের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। কালকেতু প্রচণ্ড শক্তিশালী; বাল্যকাল থেকেই অসীম তার সাহস ও শক্তি। তার বিশাল বক্ষ—লোহার শাবলের মত দুই বাহু। বাঘ ভাল্লুক নিয়ে তার খেলা—বাঁটুল তার পাখী মারার অস্ত্র। এগার বৎসর বয়সে কালকেতুর সঙ্গে ফুল্লরার বিয়ে হোল। কালকেতুর অত্যাচারে বনের পশুকুল সন্ত্রস্ত হয়ে চণ্ডীর কাছে দুঃখ নিবেদন করলে। চণ্ডী তাদের আশ্বাস দিলেন যে কালকেতু আর তাদের উত্যক্ত করবে না।

প্রভাতে উঠে কালকেতু শিকারে যাত্রা করলো। পথে দেখে একটি স্বর্ণ-গোধিকা। যাত্রাপথে গোধিকা অমঙ্গলসূচক। কালকেতু রাগ করে গোধিকাটিকে ধনুকের ছিলাতে বেঁধে নিয়ে গেল। বনে পশু পাওয়া গেল না। কালকেতু গোধিকাটিকে নিয়ে এল বাড়ীতে;—মাংসের অভাবে গোধিকাটিকে রান্না করে খাওয়া হবে। ফুল্লরা গেল প্রতিবাসিনী বিমলার বাড়ী থেকে ক্ষুদ ধার করতে আর কালকেতু চললো বাসি মাংস বিক্রী করতে। ফুল্লরা ফিরে এসে বিস্মিত হয়ে দেখলো আঙিনায় এক অপূর্ব সুন্দরী নারী। এই নারীই গোধিকারূপিণী চণ্ডী। ফুল্লরার জিজ্ঞাসার উত্তরে নারী জাগালেন যে কালকেতু তাঁকে বেঁধে এনেছে এবং তিনি এখানেই থাকবেন; তাঁর স্বামী ভিখারী বিষকণ্ঠ,—ঘরে সতীনের জ্বালা। ফুল্লরা নানাভাবে বুঝিয়ে সুন্দরীকে ফিরে যেতে বললো—ইনিয়ে বিনিয়ে নিজের দুঃখের কথা জানালো। কিন্তু দেবী ফিরলেন না। ফুল্লরা অভিমানে দুঃখে কালকেতুর কাছে গিয়ে এই আশ্চর্য নারীর কথা বিবৃত করলো। ফিরে এলো কালকেতু। সুন্দরীকে অনুনয় করলো স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে। সুন্দরী

অস্বীকৃতা হওয়ায় ধনুকে শর যোজনা করে কালকেতু,—কিন্তু শর আটকে গেল তার হাতে। দেবী তখন নিজের পরিচয় দিলেন—মহিষমর্দিনী রূপ দেখালেন,—কালকেতুকে দিলেন মহামূল্য অঙ্গুরীয়ক,—আর দিলেন সাতঘড়া ধন। তিনি গুজরাটে জঙ্গল কাটিয়ে নগর পত্তন করে রাজত্ব করতে নির্দেশ দিলেন কালকেতুকে। কালকেতু আঙ্গটি বেচে পেল সাতকোটি তংকা। বিপুল ধন নিয়ে গুজরাটে জঙ্গল কাটিয়ে নগর পত্তন করে রাজা হোল সে। বিশ্বকর্মা ও হনুমান কালকেতুর জন্যে প্রাসাদ তৈরী করলেন,—চণ্ডীর ইচ্ছায় প্রবল প্লাবনে কলিঙ্গ রাজ্য ভেসে গেল,—কলিঙ্গবাসীরা কালকেতুর রাজ্যে বসবাস করতে লাগলো। কালকেতুর রাজ্য সুখসমৃদ্ধির রাজ্য—অত্যাচারহীন শোষণহীন দেশ। শঠ ভাঁড়ুদত্ত কালকেতুর বিশ্বাসভাজন হয়ে প্রজাদের উপরে অত্যাচার করায় কালকেতু তাকে বিতাড়িত করে। ভাঁড়ুদত্তের প্ররোচনায় কলিঙ্গরাজ কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করলেন। ফুল্লরার নির্দেশে কালকেতু ধান্যঘরে লুকিয়ে রইলো। ভাঁড়ুদত্ত তাকে খুঁজে বার করে বন্দী করে নিয়ে গেল কলিঙ্গ রাজার কাছে। কলিঙ্গ রাজার কারাগারে কালকেতু দেবীর চৌতিশা স্তব করে,—দেবী তুষ্ট হয়ে কলিঙ্গরাজাকে স্বপ্ন দিলেন। কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে মুক্তি দিয়ে পূজা করে। ভাঁড়ুদত্ত পুনর্বার কালকেতুর তোষামোদ করতে এলে কালকেতুর আদেশে তার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গালে চুনকালি মাখিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। শাপের সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় ফুল্লরা ও কালকেতু পুত্র পুষ্পকেতুর হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে স্বর্গগমন করে।

ধনপতির উপাখ্যান ঃ

ইন্দ্রের রাজসভার নর্তকী রত্নমালার দেবসভায় নৃত্যকালে তালভঙ্গ হওয়ায় চণ্ডী শাপ দিলেন মর্তে জন্মগ্রহণ করতে। রত্নমালা উজানীনগরে লক্ষপতি সওদাগরের কন্যা খুল্লনারূপে জন্মগ্রহণ করলো।

উজানীনগরে সৌখিন যুবক ধনপতি সওদাগর একদিন ক্রীড়াচ্ছলে পায়রা

উড়াচ্ছিলেন। ধনপতির পায়রা শ্যেনপক্ষীর তাড়নায় ভীত হয়ে লক্ষপতি সওদাগরের কন্যা খুল্লনার অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করলো। ধনপতি পায়রা খুঁজতে এসে খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। লক্ষপতি রাজী হলেন। অলংকার দিয়ে ধনপতি লহনাকে বশীভূত করলো। বিবাহের পরে রাজার আদেশে ধনপতিকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গৌড় যাত্রা করতে হোল।

খুল্লনা লহনা দুই বোন—দুই সতীন,—বেশ সদ্ভাবেই কাল কাটাচ্ছিল। গোল বাধালো দুর্বলা দাসী। দুর্বলার প্ররোচনায় লহনা উত্তেজিত হয়ে ঈর্ষাতুরা হয়ে উঠলো খুল্লনার উপর। স্বামীর জাল চিঠি দেখিয়ে খুল্লনাকে ছাগল চরাতে, একবেলা খেতে দিতে, খুঞার বসন পরাতে এবং ঢেঁকিশালে শুতে দিতে উদ্যোগী হলে খুল্লনা চিঠি জাল সন্দেহ করায় দুই সতীনে হাতাহাতি চুলাচুলি শুরু হয়ে গেল। খুল্লনা পরাজিত হোল। লহনা তার কাপড় গহনা কেড়ে নিল। খুঞার বসন পরে দরিদ্র ভিখারিণীর বেশে খুল্লনা গেল বনে বনে ছাগল চরাতে,—রাত্রি কাটাল ঢেঁকিশালে। একদিন খুল্লনা পথশ্রান্ত হয়ে বনে ঘুমিয়ে পড়লে চণ্ডী স্বপ্ন দিলেন যে তার 'সর্বশী' ছাগীকে শৃগালে খেয়েছে। ছাগল খুঁজতে খুঁজতে পঞ্চ দেবকন্যার সাক্ষাৎ মিললো। তাঁরা খুল্লনাকে নির্দেশ দিলেন চণ্ডীপূজা করতে। চণ্ডীপূজা করে খুল্লনা ছাগল ফিরে পেল। দেবী তুষ্ট হয়ে তাকে পুত্রবর দিলেন—ধনপতির প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করলেন এবং খুল্লনার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য লহনাকে স্বপ্নে ভয় দেখালেন। লহনা ভয় পেয়ে খুল্লনাকে ফিরিয়ে আনলো এবং যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার শুরু করলো।

স্বপ্ন দেখে ধনপতি গৃহে ফিরলেন। ধনপতি আত্মীয়-স্বজনকে ভোজন করাতে ইচ্ছা করলেন। রান্নার ভার পড়লো খুল্লনার উপর। চণ্ডীর কৃপায় রান্না উত্তম হয়েছিল। দীর্ঘ বিরহের শেষে মধুর মিলনের আনন্দ যখন পরিব্যাপ্ত—সেই সময় খুল্লনা লহনার অত্যাচারের কথা ধনপতিকে জানাল এবং ভর্ৎসনা করতেও ছাড়লো না। লহনাও মিথ্যা নালিশ জানালো। পরিশেষে বিবাদ মিটে যায়।

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে চাঁদ সওদাগরকে বণিক প্রধান বলে সম্মানিত করায় অসন্তুষ্ট জ্ঞাতিকুটুম্বগণ বনে ছাগল চরানোর সুযোগ নিয়ে খুল্লনার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করে। খুল্লনাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়। জলে ডুবিয়ে, সর্প-দংশনে, তপ্তলৌহে বিদ্ধ করে, জতুগৃহে অগ্নিদগ্ধ করে খুল্লনা-হত্যার সকল প্রকার চেষ্টাই ব্যর্থ হোল। খুল্লনা সতীত্বের ধ্বজা উড়িয়ে নিজের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করলো।

রাজভাণ্ডারে চন্দনের অভাবহেতু রাজাজ্ঞায় ধনপতিকে যেতে হোল সিংহলে সপ্তডিঙ্গা মধুকর সাজিয়ে বাণিজ্য করতে। খুল্লনা তখন গর্ভবতী। ধনপতি যাত্রাকালে 'জয়পত্র' লিখে দিলে যে খুল্লনার গর্ভে পুত্র হলে তার নাম হবে শ্রীপতি ও কন্যা হলে নাম হবে শশিকলা। স্বামীর মঙ্গলকামনায় খুল্লনা ঘটে চণ্ডীপূজা করছিল। লহনা এই ব্যাপার ধনপতির গোচরে আনায় শৈব ধনপতি 'ডাকিনী' দেবতা বলে ঘটে লাথি মেরে চলে গেল। চণ্ডী হলেন কুপিতা। সমুদ্রে মেঘ ও ঝড় উঠলো—ডুবে গেল ছয়টি তরী। একমাত্র মধুকর ডিঙ্গাকে আশ্রয় করে ধনপতি পৌছাল সিংহলে। সিংহলের উপকূলে চণ্ডী মায়া করে দেখালেন কমলেকামিনী মূর্তি। পদ্মোপরি সমাসীনা এক অপরূপা রমণী একটি হস্তী গিলছেন ও উদ্গীরণ করছেন। ধনপতি সিংহলে উপস্থিত হয়ে রাজাকে সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা প্রসংগে 'কমলেকামিনী' মূর্তির বর্ণনা করলেন, কিন্তু সিংহলরাজকে দেখাতে না পারায় কারারুদ্ধ হলেন।

খুল্লনার পুত্র জন্মগ্রহণ করলে তার নাম হোল শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত। শিবের শাপে মালাধর গন্ধর্ব শ্রীমন্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করলো। শ্রীমন্ত বড় হোল—পাঠ-শালায় পড়তে গেল। অল্পকালেই সে নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠলো। গুরু একদিন তাকে তার জন্ম সম্পর্কে কটাক্ষ করে ভৎ'সনা করলে শ্রীমন্ত বাড়ী এসে মায়ের কাছে পিতৃপরিচয় জানতে চাইলো। মায়ের কাছে সব বৃত্তান্ত অবগত হয়ে শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে সিংহলযাত্রার সংকল্প গ্রহণ করলো,—কারও নিষেধ সে গ্রাহ্য করলো না। সপ্ত ডিঙ্গা সাজিয়ে সে পাড়ি দিল সমুদ্রে। সিংহলের

উপকূলে 'কমলেকামিনী' দেখে শ্রীমন্ত সিংহলের রাজাকে বিবরণ দিল। কিন্তু রাজাকে 'কমলেকামিনী' দেখাতে না পেরে লাভ করলে মৃত্যুদণ্ড। বধ্যভূমিতে স্তবস্তুতির দ্বারা শ্রীমন্ত দেবীকে তুষ্ট করে। দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে ডাকিনী, প্রেতিনী যোগিনী, ভূতপ্রেত প্রভৃতি সেনাবাহিনী নিয়ে সিংহলরাজের সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করলেন এবং শ্রীমন্তকে রক্ষা করলেন। সিংহলরাজ দেবীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং পিতাপুত্রকে মুক্তি দিলেন। পিতাপুত্রের মিলন হোল। সিংহলরাজকন্যা সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দিলেন। দেবীর কৃপায় রাজা দর্শন করলেন কমলেকামিনী মূর্তি। পিতাপুত্র ও নববধূ প্রচুর উপহার নিয়ে স্বদেশ যাত্রা করে। বিনষ্ট ধনসম্পদ সহ নৌকাগুলি দেবীর কৃপায় ভেসে উঠলো। উজানীনগরের রাজাও দেবীর কৃপায় কমলেকামিনী মূর্তি দেখলেন এবং কন্যা জয়াবতীর সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দিলেন। দেবী শিবভক্ত ধনপতিকে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখালেন। কিছুকাল সংসারধর্ম পালন করার পর শ্রীমন্ত পত্নী সহ স্বর্গগমন করে।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে চণ্ডীর বিচিত্র রূপ ঃ

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে চণ্ডীর রূপকল্পনার বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। কালকেতুর উপাখ্যানে প্রথমতঃ দেবীর যে রূপ প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাতে তিনি পশুকুলের দেবতা। কালকেতুর অত্যাচারে পশুকুল নিরুপায় হয়ে তাদের দেবতা চণ্ডীর কাছে তাদের দুঃখের কাহিনী নিবেদন করে। ভল্লুক, বানর, হস্তী, সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণ নিজ নিজ দুঃখ নিবেদন করলে দেবী চণ্ডিকা পশুদের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে তাদের দুঃখ দূর করার আশ্বাস দিলেন ঃ

> আজি হৈতে মনে কিছু না করিহ ভয়।
> না বধিবে মহাবীর কহিনু নিশ্চয়॥

দেবী চণ্ডিকা শুধু পশুকুলের রক্ষয়িত্রী নন, তিনি ব্যাধজাতিরও পূজিতা এবং ব্যাধকুলের শুভাকাঙ্ক্ষিণী। এখানে চণ্ডীর প্রকৃতি মঙ্গলকাব্যের দেব-

প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। দেবী এখানে ভয়ঙ্করী নন—অভয়া বরদা। কালকেতু মৃগয়ায় বহির্গত হওয়ার পূর্বে দেবী চণ্ডীকার পূজা করে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে। দেবীর কৃপায় দরিদ্র ব্যাধ কালকেতু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে,—বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়—কলিঙ্গরাজের কারাগারে বন্দী হয়েও মুক্তি পায়।

এই অংশেই দেবী গোধারূপিণী। কালকেতু মৃগয়াযাত্রার সময় যে স্বুবর্ণ গোধিকাটিকে দেখেছিল এবং যাকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে এনেছিল ঘরে, সেই স্বুবর্ণ গোধিকাই চণ্ডী. কালকেতু এবং ফুল্লরার অনুপস্থিতিতে দেবী মহিষমর্দিনী রূপ ধারণ করেছিলেন। এখানে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত মহিষমর্দিনী রূপে দেবীকে দেখতে পাই। চণ্ডীমঙ্গলের দেবখণ্ডে চণ্ডীর রূপ সম্পূর্ণ পুরাণানুসারে কল্পিত। এই অংশে দেবী পুরাণের সতী ও উমা। হরপার্বতীর বিবাহ ও উমার পতিগৃহে যাত্রায় এই কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে।

আবার ধনপতি সওদাগরের কাহিনীতে দেবীকে আর একরূপে দেখি। দেবী খুল্লনাকে ছাগল খুঁজে দিয়েছিলেন,—পুত্রবরও দিয়েছেন। আবার ধনপতি ও শ্রীমন্তকে তিনি কমলেকামিনী মূর্তিতে দেখা দিয়েছেন। এই দেবতার রূপকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। দেবী পদ্মের উপরে বসে একটি হস্তীকে একবার গলাধঃকরণ করছেন ও একবার উদ্গীরণ করছেন। এই মূর্তি পরিকল্পনায় গজলক্ষ্মীর প্রভাব সহজ লক্ষ্য। এই দেবীই প্রকৃত মঙ্গলচণ্ডী। এখানে দেবী ছলনাময়ী এবং ভয়ঙ্করী। অন্নদামঙ্গলে দেবী আবার নূতন রূপে আবির্ভূ'তা,—এখানে দেবী উমা চণ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডী নন—ইনি অন্নদা—অন্নপূর্ণা।

দেবী চণ্ডীর এই বিচিত্র রূপকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। সম্ভবতঃ বিভিন্ন সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য এসে দেবী চরিত্রে সমন্বিত হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে একটি অখণ্ডরূপ পরিগ্রহ করেনি।

ধনপতির উপাখ্যানে বিচিত্র প্রভাব ঃ

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে দেবীর যে চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, তাতে তিনি উগ্ররূপা নন। তাঁর প্রকৃতি অনেকটা শান্ত। ধনপতির উপাখ্যানেও দেবীর শান্তরূপ

প্রত্যক্ষ হয়। দেবীর এই শান্তরূপ বৈষ্ণবীয় প্রভাবের ফল বলে গণ্য করা যায়। দ্বিজ মাধবের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব অত্যন্ত গভীর। দেবী যদিও ছলনা করেছেন ধনপতি ও শ্রীমন্তকে, তথাপি তিনি এদের কল্যাণকারিণী বরদাত্রীরূপেই আবির্ভূতা। কমলেকামিনীর মূর্তিতে যে গজলক্ষ্মী স্থান পেয়েছেন তাও বৈষ্ণবীয় প্রভাব বলে গণ্য করা যায়। চরিত্রগুলির নমনীয় ভাবও বৈষ্ণব প্রভাবের কথাই স্মরণ করায়। খুল্লনার প্রতি লহনার দুর্ব্যবহার জটিলা-কুটীলার এবং খুল্লনার গভীর পতিপ্রেম এবং কঠোর সহিষ্ণুতা শ্রীরাধার কথা মনে করিয়ে দেয়।

বৈষ্ণব প্রভাব

ধনপতির উপাখ্যানটি মনসামঙ্গলের কাহিনীর আদর্শে পরিকল্পিত হয়েছে। ধনপতি কতকাংশে চাঁদ সওদাগরের প্রতিরূপ—যদিও চাঁদ সওদাগরের চারিত্রিক দৃঢ়তা ধনপতির চরিত্রে নেই। শিবভক্ত ধনপতি কর্তৃক চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত শৈব চন্দ্রধরের অনুরূপ মনসা-বিরোধিতার কথা স্মরণ করায়। দেবী চণ্ডীর প্রতিশোধস্পৃহা মনসার কাহিনীর প্রভাবে সৃষ্ট। অবশ্য মনসার হিংস্রতা চণ্ডীর চরিত্রে নেই। শ্রীমন্ত কর্তৃক পিতা ও ধনসম্পদ উদ্ধারের ঘটনা ও বেহুলার পতির জীবন লাভের ও হৃত সম্পদ লাভের কাহিনীর অনুরূপ। চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রার অনুসরণে ধনপতির বাণিজ্য যাত্রা বর্ণিত হয়েছে।

মনসামঙ্গলের প্রভাব

মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কাহিনীর মত ধনপতির কাহিনীতেও রামায়ণের প্রভাব পড়েছে। দুই সতীনের পরস্পর বিবাদ এবং দুর্বলার ভূমিকা অবশ্যই রামায়ণ কাহিনীর প্রভাব সঞ্জাত। খুল্লনার চরিত্র সীতার চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য ব্যঞ্জক। খুল্লনার অরণ্যবাস ও দুঃখকষ্টসহনে সীতার অরণ্যবাসের ছাপ পড়া সম্ভব। সীতার পরীক্ষার মত খুল্লনারও সতীত্বের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ধনপতির জ্ঞাতি কুটুম্বরা স্পষ্টতঃই সীতার উল্লেখ করেছে। এখানে তারা সবিস্তারে রামায়ণ কাহিনী বর্ণনা করেছে :

রামায়ণের প্রভাব

কলহে আরোপি মন রামদত্ত রামায়ণ
শুনে, ধনপতি বিড়ম্বিতে।
বিপক্ষ বণিক যত রামদত্ত অনুগত
শুনে রামায়ণ একচিতে॥

সীতার উদ্ধার বর্ণনার পর বণিকগণ সীতার পরীক্ষার উল্লেখ করেছে।

এমন শুনিয়া সীতা রামের ভারতী
পরীক্ষা করহ বলি দিলা অনুমতি॥
মরালবাহনে ব্রহ্মা কৈল অধিষ্ঠান।
পরীক্ষা দিলেন সীতা সভা বিদ্যমান॥
পরীক্ষাতে শুদ্ধ হৈল জনকনন্দিনী।
রাম সহ বাস ঘরে বঞ্চিলা রজনী॥

ধনপতি গৌড় থেকে ফিরে এসে লহনাকে সান্ত্বনা দান প্রসংগে রামায়ণ কাহিনীর উল্লেখ করেছে ঃ

সতীন কোন্দল যথা অবশ্য বিনাশ তথা
রামায়ণে শুন ইতিহাস।
কৌশল্যা রামের মাতা কৈকয়ী তাহার সতা
দোঁহার কোন্দলে সর্বনাশ॥

সমুদ্রবক্ষে বিপদে পড়ে শ্রীমন্ত পুরাণ কাহিনীর উল্লেখ করে দেবীর স্তব করেছে। এই প্রসংগে সগরবংশের বিবরণ, গঙ্গার মর্তাবতরণ এবং জগন্নাথ মাহাত্ম্যের সঙ্গে রামায়ণ কাহিনীরও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে শ্রীমন্ত। এখানে সীতার পরীক্ষা এবং রাম-সীতার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

সিংহল ও লংকা সমার্থক। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেবী দুর্গার আশ্রয় পেয়েছিলেন রামচন্দ্র, শ্রীমন্তও চণ্ডীর আশ্রয় পেয়েছে। সিংহলের রাজা ও দেবীর সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধ রাম-রাবণের যুদ্ধের দ্বারা প্রভাবিত। আবার, সিংহলে দেবীর সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে মৃত সৈন্যদের জীবন দানের

উদ্দেশ্যে হনুমান দেবীর আদেশে গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী ও অস্থি সঞ্চারিণী অনুপান নিয়ে এলেন এবং নিহত সৈন্যদের প্রাণ সঞ্চার করলেন।

হনুমান আনি দিল বিশল্যকরণী।
অস্থি সঞ্চারিনী আর মৃত্যুসঞ্জীবনী॥

মূল রামায়ণ অপেক্ষা কৃত্তিবাসের রামায়ণই বাঙ্গালাদেশে অধিক জনপ্রিয় এবং এই কাব্যটি বাঙ্গালা সাহিত্যে কম প্রভাব সঞ্চার করেনি। তাই মনে হয় মনসামঙ্গল ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় প্রভাব মিশ্রিত হয়ে ধনপতির উপাখ্যানটির সৃষ্টি হয়েছে। তথাপি কাহিনীর মৌলিকতাও উপেক্ষণীয় নয়। সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ কালকেতুর কাহিনীর মত ধনপতির কাহিনীকেও মৌলিকতা দান করেছে।

চণ্ডীমঙ্গলের কবি ঃ

মাণিক দত্ত ঃ

চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মাণিক দত্ত। মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে মাণিক দত্তের নাম করেছেন।

আগু কবি বন্দিলাম মহামুনি ব্যাস
মাণিক দত্তের দাস্তা করিয়ে প্রকাশ।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়
বিনয় করিয়া কবিকঙ্কনে কয়॥

আবার অন্যত্র আছে ঃ

মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়॥

কিন্তু মাণিক দত্তের রচিত বলে যে পুঁথি পাওয়া গেছে তাকে কোন রকমেই ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলা চলে না। ভাষার আধুনিকতা, সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যের বিবরণ, ফিরিঙ্গি শব্দের প্রয়োগ প্রভৃতি কারণে মাণিক দত্তের

রচনাকে প্রাচীন বলে গণ্য করা চলে না। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, প্রাপ্ত পুঁথির মাণিক দত্ত অষ্টাদশ শতাব্দের আগেকার লোক না হওয়াই সম্ভব।" তিনি আরও বলেছেন, "আলোচ্য কাব্যের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দের শেষভাগের আগে কিছুতেই নয়।" ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মাণিক দত্তের পুঁথির আত্মবিবরণী প্রক্ষিপ্ত—কবির রচনা নয়।

মাণিক দত্তের কাব্যে মালদহ বা নিকটবর্তী অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। তাঁর কাব্য এখনও মালদহ অঞ্চলেই প্রচলিত। মাণিক দত্তের আত্ম-বিবরণীতে জানা যায় যে কবির বাড়ী ছিল ফুলুয়া নগর। অনেকে মনে করেন যে ফুলুয়া নগর মালদহ জেলার ফুলবাড়ী। আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় যে মাণিক দত্ত কানা ও খোঁড়া ছিলেন। দেবী চণ্ডীর অনুগ্রহে তিনি রোগমুক্ত হন। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন যে, প্রাপ্ত পুঁথির মাণিক দত্ত খানিকটা পুরানো মালমসলা ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্যে, কিন্তু সে মাণিক দত্ত পূর্বতন কোন মাণিক দত্তের কাছ থেকে নেওয়াও অসম্ভব নয়। মুকুন্দরামের কাব্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে মাণিক দত্তের কাব্যও রূপান্তরিত হতেও পারে।

কাব্যবিচার

মাণিক দত্তের পুঁথিতে ধর্মমঙ্গলের অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ আছে। এতে দেবী কর্তৃক ধূম্রলোচন অসুরবধের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এছাড়াও শিব ও দক্ষের বিরোধ—দক্ষযজ্ঞ—সতীর দেহত্যাগ—পার্বতীর জন্ম—হরপার্বতীর পরিণয়—কার্তিক-গণেশের জন্ম প্রভৃতি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে,—শিবের কোচনী আসক্তির কথাও আছে।

কাব্যটি ছড়াবহুল,—ভাষা মার্জিত নয়,—ছন্দও শিথিলবদ্ধ। কিন্তু বর্ণনা-ভঙ্গী চিত্তাকর্ষক। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, রচনাটি আদিতে ব্রতকথা জাতীয় ছিল। চরিত্রগুলি মোটামুটি বিকাশ লাভ করলেও ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রটির গুরুত্ব আছে। সৃষ্টিপ্রকরণ বাদ দিলে মাণিক দত্তের কাব্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য তথা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। উনিশ শতকের মধ্যভাগের পূর্ববর্তী যাবতীয় আখ্যানকাব্যের মধ্যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা। কবি তাঁর কাব্যের নাম রেখেছেন অভয়া মঙ্গল। অভয়া মঙ্গল শব্দটিই তিনি কাব্যমধ্যে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। তবে চণ্ডীমঙ্গল নামেই তাঁর কাব্য প্রসিদ্ধ। কবির উপাধি ছিল কবিকঙ্কন। তাই কবিকঙ্কন চণ্ডী নামেই তাঁর কাব্য সুপরিচিত।

রচনা কাল

মুকুন্দরাম যখন দামুন্যা ছেড়ে মেদিনীপুরে যান জমিদার বাঁকুড়া রায়ের জমিদারীতে, তখন পথিমধ্যে তিনি চণ্ডীর কাছ থেকে কাব্য রচনার জন্য স্বপ্নাদেশ পান এবং বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালে তিনি কাব্য রচনা করেন। রঘুনাথের রাজত্বকাল ১৫৭৩ থেকে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ। রঘুনাথের পুত্র চক্রধর ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। মুকুন্দরামের কাব্যে চক্রধরের কোন উল্লেখ না থাকায় অনুমান হয় যে কাব্য রচনাকালে চক্রধরের জন্ম হয়নি। চক্রধরের রাজ্যলাভের কালে বিশ বৎসর বয়স অনুমান করে ডঃ সুকুমার সেন ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ নাগাদ মুকুন্দরামেব কাব্য সমাপ্ত হয়েছিল বলে স্থির করেছেন।

মুকুন্দরাম লিখেছেন যে মানসিংহের রাজত্বকালে ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন।

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ।
যে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিফ॥

মানসিংহ বিহারের সিপাহশালার হয়েছিলেন ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন। ১৫৯৪ থেকে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি

বিহার-বাঙ্গালা-উড়িষ্যার স্থবেদার ছিলেন। স্থতরাং মানসিংহের স্থবেদারীর আমলে রঘুনাথের রাজত্বকালে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুকুন্দরাম কাব্য সমাপ্ত করেছিলেন—এ অনুমান সঙ্গত।

কিন্তু কবি লিখেছেন যে মানসিংহের রাজত্বকালে তিনি দামুন্যা ত্যাগ করে-ছিলেন। স্থতরাং মানসিংহের শাসনকালে গৃহত্যাগ এবং রঘুনাথের রাজত্বকালে কাব্যরচনার মধ্যে সঙ্গতি বিধান অসম্ভব হয়ে পড়ে।

রামজয় বিদ্যাসাগর সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গলের মুদ্রিত সংস্করণের শেষে কাল-নির্দেশক দুটি ছত্র আছে।

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা॥

রস অর্থে ছয় ধরলে ১৪৬৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দের পরে চণ্ডী কবিকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন। রস অর্থে নয় ধরলে ১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকাল। এই সময়ে কবি স্বপ্ন দেখলে বাঁকুড়া রায়ের রাজত্বকালে কবির মেদিনীপুরে আগমন সম্ভব হয় না। কেউ কেউ ছত্র দুটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। ডঃ স্থকুমার সেনের মতে ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ কবির দেশত্যাগের কাল বলে গণ্য করলে অসঙ্গতি থাকে না। এই সময়ে কবি যুবক ছিলেন এবং পরে বৃদ্ধ বয়সে তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন—একথা গ্রহণ করা চলে। কিন্তু এক্ষেত্রেও অসঙ্গতি যায় না। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের শাসনকাল কোনমতেই পাওয়া যায় না। স্থতরাং কবির আত্ম-বিবরণীতে কোথাও একটা ত্রুটি আছে মনে হয়।

মুকুন্দরামের আত্মবিবরণী ঃ

মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে যে আত্মবিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে জানা যায় যে বর্ধমানের রত্না নদীর তীরে দামিন্যা বা দামুন্যা গ্রামে কবি বংশানুক্রমে কৃষিকার্য অবলম্বনে বসবাস করতেন। সেলিমাবাদ শহরবাসী গোপীনাথ নন্দীর

তালুকের অন্তর্গত দামিন্যা গ্রাম। এই তালুকে মুকুন্দরাম পুরুষানুক্রমে জমিজমা ভোগ করতেন। প্রজার পাপে অধর্মী রাজার অধিকার হোল এবং রাজকর্মচারী ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে প্রজার দুর্গতির সীমা রইলো না। দেশে দেখা দিল অরাজকতা—ধনী হোল নির্ধন, আর দরিদ্র হোল ধনী—ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সম্ভ্রম নষ্ট হোল—মজুরি দিয়েও মজুর মেলে না—ধান গরু কেনার লোক নেই।

উজির হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পোনের কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥
সরকার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥
ডিহিদার অবোধ যোজ কড়ি দিলে নহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে॥

গোপীনাথ নন্দী বন্দী হলেন। তাঁর তালুক বাজেয়াপ্ত হোল। প্রজাদের উপরে বাকি খাজনার চাপ পড়লো। পাছে প্রজারা পালায় তাই পেয়াদা প্রজার দুয়ার চেপে বসে রইলো। প্রজারা উপায়ান্তর না দেখে কাটারি কুড়াল সব বেচতে লাগলো—এক টাকার জিনিষ বিক্রী হোল দশ আনায়।

পেয়াদা সভার কাছে প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজারা হয়ে ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥

অতএব দেশের এই দুর্দিনে চণ্ডীবাটীর শ্রীমন্ত খাঁ এবং গম্ভীর খাঁর সঙ্গে যুক্তি করে কবি সপরিবারে চললেন গ্রাম ছেড়ে দক্ষিণ দিকে। পথে কবি অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন। কবির যৎকিঞ্চিৎ সম্বল রূপরাম ডাকাত কেড়ে নিয়েছিল।

যদুকুণ্ডু তেলির বাড়িতে কবি আশ্রয় পেয়েছিলেন—সেখানে তিন দিন কাটিয়ে আবার যাত্রা করলেন। পথে মুড়াই নদী—ডেঙুটিয়া-দ্বারিকেশ্বর—পাতুল গ্রাম অতিক্রম করে নারায়ণ—পরাশর—আমোদর নদী পার হয়ে অতি কষ্টে নিঃস্ব অবস্থায় এসে পৌছালেন গোচরিয়া গ্রামে। সেখানে একটি পুকুর পাড়ে আশ্রয় নিলেন। তৈলহীন অবস্থায় স্নান করে সঙ্গের সাথী গৃহদেবতাকে শালুকের ভাঁটার নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করে কবি পুকুরের জলে পেট ভরালেন। *সঙ্গের শিশুপুত্র অন্নের জন্য কান্না জুড়েছে।*

তৈল বিনা করি স্নান　　করিনু উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে ॥

রিক্ততার বেদনায় নৈরাশ্যে পথক্লান্তিতে কবি ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই সময়ে কবি চণ্ডীর কাছ থেকে স্বপ্নাদেশ পেলেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখতে।

ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে　　নিদ্রা গেনু সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।
করিয়া পরম দয়া　　দিয়া চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিল করিতে সঙ্গীত ॥

কবি শিলাই নদী পার হয়ে ব্রাহ্মণভূমি আরড়ার রাজা বাঁকুড়া রায়ের রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন। কবি শ্লোক পড়ে রাজাকে আশীর্বাদ করলে রাজা কবির পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে কবিকে আশ্রয় দিলেন, তৎক্ষণাৎ দশ আড়া ধান দিলেন এবং পুত্র রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কবির দুঃখের দিন শেষ হোল। তিনি স্বচ্ছলতার মুখ দেখলেন; ভুলে গেলেন দেবীর স্বপ্নাদেশ—তাঁর সঙ্গী দামোদর (ভামাল) নন্দী তাঁকে স্বপ্নের কথা মনে করিয়ে দিতেন মাঝে মাঝে। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর কবির ছাত্র এবং পোষ্টা রঘুনাথ রায় রাজা হয়ে কবিকে অনুরোধ করলেন চণ্ডীমঙ্গল রচনা করতে। এবার কবি কালবিলম্ব না করে কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

মুকুন্দরামের আত্মজীবনী মানবধর্ম ও সাহিত্য রসে উজ্জ্বল—একটি সুন্দর

গীতিকাব্য অথবা একটি নিটোল ছোট গল্পের মত। মধ্যযুগের কাব্যে আত্মজীবনী রচনা একটা গতানুগতিক নিষ্প্রাণ প্রথা মাত্র। এই বর্ণনায় না থাকে কবিত্ব না থাকে কোন উজ্জ্বলতা। অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভার অধিকারী মুকুন্দরাম গতানুগতিক আত্মকাহিনী পরিবেষণের মধ্যেও এমন যুগচেতনা ও আত্মভাবনা পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন যে মূল কাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেও এই আত্মকাহিনীটি একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্টতার দাবী রাখে। মধ্যযুগের কোন কবির রচনাতেই যুগ চেতনা ও আত্মভাবনার সমন্বয়ে এমন একটি অখণ্ড রসসৃষ্টি সম্ভব হয়নি।

আত্মজীবনীর বৈশিষ্ট্য

এই আত্মকাহিনীটি ছাড়াও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে কবির জীবনকাহিনী কখনও স্বনামে কখনও বেনামে অভিব্যক্ত হয়েছে। যে অত্যাচারী শাসকের অত্যাচারে কবিকে সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে আসতে হয়েছিল তার কথা কবি ভুলতে পারেন নি। তাই কালকেতুর নগর পত্তন ও প্রজা বসানোর মধ্যে যে অত্যাচার ও শোষণমুক্ত সমাজের কথা আছে তা কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতারই ফলস্বরূপ। কালকেতুর মুখে যখন শুনি :

কাব্য মধ্যে আত্মগত ভাবনা

নাহিক বাউড়ি দেড়ি রয়্যা বস্যা দিবে কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।

কিংবা যখন ভালুক বলে :

উইচারা খাই পশু নামেতে ভালুক
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক ॥

তখন কবির পূর্বজীবনের দামিন্যার চিত্রই ভেসে ওঠে মনে। তালুকদার গোপীনাথ নন্দী ডিহিদারের হাতে নির্যাতীত হয়েছিলেন, কিন্তু ভালুকের মত নিরীহ প্রজা যারা তাদের এই দুঃখের কারণ কি? খুল্লনা-লহনার বিবাদে কবির নিজ জীবনের ছায়াপাত হওয়াও আশ্চর্য নয়, কারণ কাব্যপাঠে অনুমান হয় যে কবির দুই পত্নী ছিলেন। লহনা ও খুল্লনার বিবাদ উপলক্ষ্যে মুকুন্দরাম বলছেন :

একজন সহিলে কোন্দল হয় দূর
বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্তী ঠাকুর।

তাই সম্ভবতঃ সপত্নী বিবাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কবির ছিল। কালকেতু যখন ফুল্লরাকে জিজ্ঞাসা করে ঃ

শাশুড়ী ননদী নাহি নাই তোর সতা
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কইলি রাতা।

তখন কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ দ্বন্দ্বমুখর জীবন চিত্রটি অংকিত দেখি। ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ কাহিনীতেও কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ দারিদ্র্যের কহিনী পরিবেষিত হতে দেখি। এইভাবে কবির আত্মকথন এই কাব্যে কবির দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও সমবেদনশীল করে তুলেছে। কবির আত্মভাবনা গতানুগতিক আখ্যান বর্ণনা অপেক্ষা কাব্যটিকে রসোজ্জ্বল ও প্রাণময় করে তুলেছে।

মুকুন্দরামের কবিত্ব ঃ

মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে গতানুগতিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু গতানুগতিকতার মধ্যেই স্বীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। বৈশিষ্ট্য কাহিনী নির্মাণে নয়—বৈশিষ্ট্য বাস্তব সমাজ চিত্রণে আর চরিত্র-চিত্রণে। কবির পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল গভীর—আর সেই শক্তি বলেই তিনি তুচ্ছতম বস্তুকেও তার নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তাই অধম ভালুক, ব্যাঘ্র, সিংহ, শশক প্রভৃতি ছোট বড় প্রাণী,—ছোট বড় মনুষ্য চরিত্র সবই কবির বর্ণনা-দক্ষতায় স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবি ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে, পুরাণ ইত্যাদিতে সুপণ্ডিত। সেই পাণ্ডিত্য তাঁর কাব্যে সর্বত্র লক্ষিত হয়, কিন্তু পাণ্ডিত্য কোথাও তাঁর কাব্যকে গুরুভার করে তোলেনি। মুকুন্দরামের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব চরিত্র সৃষ্টিতে। কবির সহানুভূতির স্পর্শে প্রত্যেকটি চরিত্রই উজ্জ্বল এবং জীবন্ত। আধুনিক ঔপন্যাসিকের মত বিশ্লেষণ এবং বাস্তবধর্মী বর্ণনা তাঁর কাব্যকে উপন্যাসের মর্যাদা দান করেছে। অলৌকিক কাহিনীর মধ্যেও কবি

সংসার জীবনের ছবি এঁকেছেন। মুকুন্দরামের কাব্যের বিচিত্র বর্ণনা —যেমন, কবির আত্মবিবরণী—হরগৌরীর সংসার,—কালকেতুর বাল্যলীলা—বিবাহ—জীবনযাত্রা—মুরারীশীলের শঠতা—নগর নির্বাণ ও প্রজাপত্তন,—ভাঁড়ু দত্তের শঠতা—খুল্লনা-লহনার সপত্নী কোন্দল প্রভৃতি অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা কেবলমাত্র নিষ্প্রাণ বর্ণনায় পরিণত হয়নি—কেবল বস্তু সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে পরিণত হয়নি,—কবি এই বর্ণনায় বাস্তব রস সঞ্চার করেছেন —জীবনের রসে তাঁর বর্ণনা মর্মস্পর্শী হয়েছে—চরিত্রগুলি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবনরসে ঝলমল করছে—মুকুন্দরাম তাই জীবন রসিক কবি। কবির ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা এই বর্ণনাকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে। এইখানেই কবির কৃতিত্ব। মুকুন্দরামের কাব্যে নাট্যগুণও লক্ষণীয়। চরিত্রগুলির কথোপকথনের সুযোগে কবি নিজে আড়ালে সরে গেছেন। ফলে নাট্যরস জমে উঠেছে। তবে নাটকে পাত্রপাত্রীগুলি যে মূল কেন্দ্রের চতুর্দিকে আবর্তিত হয়ে একটি বিশেষ পরিণতির দিকে ছুটে যায় মুকুন্দরামের কাব্যে সেই কেন্দ্রবিন্দুর অভাব। এর জন্য দায়ী কবি নন,—দায়ী গতানুগতিক আখ্যায়িকা। কিন্তু এই গতানুগতিক আখ্যায়িকাতে কবি যে প্রাণ সঞ্চার করতে পেরেছেন—নিষ্প্রাণ মানুষমাত্র তৈরী না করে যে জীবন্ত মানুষের সারি রচনা করেছেন—তাতেই মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্যাদা লাভ করেছে। চরিত্রসৃষ্টি, বাস্তবতা ও মানবতাবোধ মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করে।

মুকুন্দরামের কাব্যের বাস্তবতা ঃ

মুকুন্দরামের কাব্যের প্রধান গুণ বাস্তবতা। বাস্তবতা তাঁর কাব্যে সার্থক রস পরিণতি লাভ করেছে। কবি ব্যক্তিজীবনে যে দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করেছিলেন তাই তাঁর কাব্যে সার্থক রস পরিণতি লাভ করেছে। মানবচরিত্র সম্পর্কে কবির যে সূক্ষ্ম এবং গভীর অভিজ্ঞতা ছিল, তাই তাঁর কাব্যে সার্থক বাস্তব চরিত্র সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। ফুল্লরা, কালকেতু, মুরারী শীল, ভাঁড় দত্ত

প্রভৃতি চরিত্রগুলি কবির এই বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল। কাহিনী, চরিত্র ও বাস্তব মানবজীবন সৃষ্টিতে কবি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মুকুন্দরামের চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এই যে, চরিত্রগুলিকে তিনি তাদের বাস্তব পরিবেশে স্থাপন করে দক্ষ রূপকারের মত তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। ব্যাধ কালকেতুর জীবন চিত্রণে কবি ব্যাধকে ব্যাধরূপেই বর্ণনা করে কাহিনীর আদ্যন্ত সঙ্গতি বিধান করেছেন। তিনি কালকেতুর চরিত্রে আভিজাত্য আরোপ করে তাকে ভদ্র করে গড়েননি—এটাই কবির প্রতিভার গৌরব। ফুল্লরা লহনা খুল্লনা যেন আমাদের প্রতিদিনের দেখা চিরপরিচিত চিত্র। গুজরাটে নগরপত্তন বর্ণনা প্রসংগে তিনি দেশ, সমাজ ও শ্রেণী সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। মুসলমান সমাজের বর্ণনাতেও কবি খুঁটিনাটি তথ্য পরিবেষণ করেছেন একান্ত অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে। কবির সমাজজ্ঞান যে কত গভীর ছিল তা এই বর্ণনা থেকে প্রতিভাত হয় গ্রন্থোৎপত্তির কারণ প্রসংগে আত্মজীবন কাহিনী পরিবেষণ, হরগৌরীর সংসার বর্ণনা, প্রসূতির ভোজনে অরুচি, গর্ভবেদনা,—নবজাতকের জন্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানসমূহ—কালকেতুর ব্যাধ জীবন,—বণিক মুরারী শীল ও ভাঁড়ুদত্তের শঠ চরিত্র,—খুল্লনা লহনার সপত্নী বিবাদ প্রভৃতির নিখুঁত বাস্তব বর্ণনায় কবি আশ্চর্য বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। কবি হরগৌরীর যে জীবনচিত্র বর্ণনা করেছেন তাতে সে যুগের নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের নিখুঁত বাস্তব চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কবি যেন এখানে একজন নিপুণ ঐতিহাসিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাই কেউ কেউ বলেছেন যে- মুকুন্দরাম এযুগে জন্মালে একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হতে পারতেন।

কবি যা কিছু দেখেছেন তাতেই তাঁর কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়েছে। তিনি লোকব্যবহার, মেয়েলী ক্রিয়াকাণ্ড, ঘরকন্নার ব্যবস্থা, রন্ধন, ছেলেখেলা প্রভৃতি বিষয়ে আশ্চর্য অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালী মানুষের এমন পরিপূর্ণ চিত্র আর কোথাও মিলে

কিনা সন্দেহ।” মুকুন্দরামের কাব্যে কালকেতুর সঙ্গে পশুকুলের যুদ্ধটিকে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন গূঢ় তাৎপর্যমণ্ডিত রাজনৈতিক বিপ্লবের চিত্র বলে মনে করেছেন। তিনি লিখেছেন, “মুকুন্দ কবি সংসারের খাঁটি রূপ ভিন্ন অন্য কিছু কল্পনা করেন না, তিনি মিথ্যা কল্পনার একান্ত বিরোধী। যেখানে বাধ্য হইয়া কোন দীর্ঘ রূপকথার অবতারণা করিয়াছেন, সেখানেও ইহলোকের কথার দ্বারা যথাসাধ্য সংযত ও সত্যের আভাষযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন।”

কেবল বাস্তব উৎপাদন সংগ্রহ ও কাব্যে বাস্তবতার বিবরণ শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ নয়। মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালার সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর কাব্য প্রতিভা স্তূপীকৃত বস্তুসঞ্চয়েই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। কবি বাস্তবতাকে রসে পরিণত করেছেন। তিনি বাস্তব তথ্যপুঞ্জকে সাহিত্যের সত্যে উন্নীত করতে পেরেছেন। বাস্তব তথ্য ও জীবনরস,—জীবনসত্য ও সাহিত্য-সত্যকে তিনি বিস্ময়কর কৌশলে সমন্বিত করেছেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “মুকুন্দরাম প্রসন্ন মধুর দৃষ্টির সাহায্যে বাস্তবতাকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছেন এবং তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী বিবর্ণ ব্যাপারকেও রচনার গুণে সুখপাঠ্য করিয়াছেন।” ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মুকুন্দরাম আদর্শবাদী রোমান্টিক কবি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, “মুকুন্দরাম কবি হিসাবে রোমান্টিক ; প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যকে তাঁহার কাব্যে তিনি নিজের স্বকীয় উপলব্ধি দ্বারা অনুভব করিয়া লইয়াছিলেন।” প্রকৃতপক্ষে মুকুন্দরাম বস্তুতান্ত্রিক কবি নন,—বাস্তব রসিক কবি। নিজের জীবনের প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতার রসে জরিত করে প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎ থেকে আহরিত বস্তু সমষ্টিকে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। এই দিক থেকে বিচার করলে মুকুন্দরামের কাব্যকে কবির জীবনালেখ্য বলা যেতে পারে। কবির কাব্যে বস্তুধর্ম, জীবনধর্ম রস এবং আদর্শবাদ সমন্বিত হয়ে জীবনের চরম সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। তাই মুকুন্দরামকে রোমান্টিক বলা অযৌক্তিক নয়।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের চরিত্র বিচার ঃ

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যে সুনিবিড় সংযোগ সাধিত হয়েছে তা ইতঃপূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। কবি যেমন বিচিত্র জীবনচিত্র এঁকেছেন দক্ষতার সঙ্গে, তেমনি সেই জীবনের রঙ, রস ও অভিজ্ঞতা মিশিয়ে দিয়েছেন।

জীবন রসিক কবি

তাই কবির কাছে কল্পনার লীলাবিলাস অপেক্ষা বাস্তব জগতের আকর্ষণ অনেক তীব্র হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র কাব্যের মণ্ডনকলায় যেরূপ দক্ষ, চরিত্রাঙ্কনে ততটা নয়। শব্দ এবং ভাষার কারুকার্যে মধ্য যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্র দ্বিতীয় রহিত। কিন্তু জীবনের বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্য মুকুন্দরামের সহানুভূতি ও পর্যবেক্ষণ দক্ষতায় যে জীবনরসের সৃষ্টি করেছে তার তুলনাও অন্যত্র দুর্লভ। মুকুন্দরাম বর্ণিত দেবচরিত্র মানবীয় গুণে সমৃদ্ধ। কিন্তু মানব চরিত্র অংকনে নিপুণ চিত্রকরের মত, দক্ষ ঔপন্যাসিকের মত কবি যে স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাতেই চরিত্রগুলি উপন্যাসের উপযোগী হয়ে উঠেছে। মুকুন্দরাম সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন, "The thoughts and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali Literature." E. B. Cowell মুকুন্দরামের কাব্য পড়ে লিখেছেন, "It is this vivid realism which gives such a permanent value to the description."

প্রকৃতপক্ষে মুকুন্দরাম জীবন চিত্র অংকন করেননি,—তিনি পরিবেষণ করেছেন জীবনের রস,—তাই সহানুভূতির স্পর্শে চরিত্রগুলি শুধু যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাই নয়—সর্বযুগের এবং সর্বকালের মানুষের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। মুকুন্দরাম তাই প্রকৃতই জীবন রসিক কবি।

কালকেতু ঃ

কালকেতু ব্যাধসন্তান। শিশুকাল থেকেই দেহে তার অমিত শক্তি।

তার দুই বাহু লোহার শাবলের মত,—বিশাল বক্ষ, হাতে লোহার বালা। বাল্যকাল থেকেই সে সজারু ধরে, বাঁটুলে পাখী মারে। কালকেতু বড় হয়ে মৃগয়া করে প্রতিদিন। তার বিক্রমে অরণ্যের পশুকুল সন্ত্রস্ত। সে লেজ মুচড়ে বাঘ মারে,—দেবীর বাহন বলে সিংহ বধ না করলেও ধনুকের বাড়ি দিয়ে এমন শিক্ষা দেয় যে সিংহ তৃষ্টায় আকুল হয়ে জল পান করতে ছুটে। দিনান্তে মৃতপশুর ভার কাঁধে নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে কালকেতু। কালকেতুর যেমন শক্তি, তেমনি তার ভোজন। মুকুন্দরাম কালকেতুর ভোজন বিলাসিতার একটি কৌতুককর চিত্র দিয়েছেন।

মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে॥
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ।
ছয় হাণ্ডি মুসুরি সুপ মিশ্যা তথি লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।
কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া॥
অম্বল খাইয়া বীর বনিতারে পুছে।
রন্ধন কর্য্যাছ ভাল আর কিছু আছে।
এনেছি হরিণী দিয়া দধি এক হাঁড়ি।
তাহা দিয়া অন্ন বীর খায় তিন হাঁড়ি॥
শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
ছোট গ্রাস তোলে যেন তে-আটিয়া তাল॥

কবি কালকেতু চরিত্রে আভিজাত্য আরোপ করে কালকেতুকে ভদ্র বীর করে তোলেননি। তিনি কালকেতুর চরিত্রে আদিম শবর জাতির শক্তিমত্তা এবং সরলতা দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। চণ্ডীর ছলনায় অরণ্যে পশু না পেয়ে গোধিকারূপিণী চণ্ডীকে বাড়ীর উঠানে ফেলে কালকেতু যখন গেল বাসি মাংস বিক্রী করতে, ফুল্লরা তখন সখীর কাছ থেকে ক্ষুদ ধার করে

এনে অপরূপা চণ্ডীকে দেখে এবং দেবীর কথা শুনে কালকেতু সুন্দরী পরনারীর রূপে আসক্ত হয়েছে এই প্রত্যয়ে দেবীকে কোনক্রমে তাড়াতে না পেরে কালকেতুর কাছে গেল সংবাদ দিতে। কালকেতু ফুল্লরাকে ক্রন্দনরতা দেখেই বলে ওঠে :

শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা॥

বাঙ্গালী ঘরের সহজ স্বাভাবিক চিত্রটি সরল প্রকৃতির ব্যাধের মনে উদয় হয়েছে। ফুল্লরার মুখে সুন্দরীর আবির্ভাব বৃত্তান্ত শুনে কালকেতু অবিশ্বাস করে। পরস্ত্রী তার কাছে জননী তুল্য। "পরস্ত্রী দেখিয়ে যেন নিদয়া জননী।" ফুল্লরার তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হয় কালকেতু। হোক পত্নী। তবু সে যদি মিথ্যা দোষে স্বামীকে অভিযুক্ত করে তখন তার প্রাপ্য উপযুক্ত শাস্তি। তাই সে বলে :

সুব্যক্ত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা।
মিথ্যা হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥

কালকেতুর উপযুক্ত শাসন! ঘরে ফিরে চণ্ডীকে দেখে কালকেতু নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে দেবীকে স্বস্থানে পৌছে দিতে চেয়েছে। কিন্তু দেবী নিরুত্তর থাকায় কালকেতু ধনুতে শর যোজনা করেছে সুন্দরী পরনারীকে শাসন করতে। "ভানু সাক্ষী করি বীর জুড়িলেক শর।"

দেবীর কৃপায় মাটি খুঁড়ে সাত ঘড়া ধন পেয়ে সেই ধন নিয়ে যাবার সময় কালকেতু দেবীকে দু'এক ঘড়া ধন কাঁথে নিতে বললে দেবী রাজী হলেন এবং ধনপূর্ণ ঘড়া নিয়ে চললেন কালকেতুর ঘরে। তখন কালকেতুর মনে যে ভাবটির উদয় হয়েছিল তা সরল প্রকৃতির ব্যাধের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। কালকেতুর এই অকৃত্রিম সরলতা পাঠককে বিস্মিত না করে পারে না।

পশ্চাতে চণ্ডিকা যান আগে কালু রায়।
ফিরি ফিরি কালকেতু পিছু পানে চায়॥

মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি।
ধনঘড়া নিয়া পাছে পালায় পার্বতী ॥

ধূর্ত মুরারী শীলের কাছে দেবী-প্রদত্ত অঙ্গুরী বিক্রয় কালে কালকেতুর সরলতা ও নির্ভিক সত্যপ্রিয়তা তার চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। শঠ ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে কালকেতুর ব্যবহারও সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

কালকেতু রাজা হয়েছে, নগর পত্তন করেছে,—তার রাজকীয় প্রতাপও প্রকাশ পেয়েছে। তথাপি তার সহজাত সরল প্রকৃতিটি অবিকৃতই আছে। ভাঁড়ু দত্তের প্ররোচনায় কলিঙ্গের রাজা কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করলে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধলো। কিন্তু পত্নী ফুল্লরা কালকেতুকে পরামর্শ দিলে যুদ্ধ না করে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাতে। পত্নীর পরামর্শে কালকেতু সত্যই লুকিয়ে পড়লো।

বনিতার কথা শুনি হিতাহিত মনে গুণি
লুকাইল বীর ধান্য ঘরে ॥

এমন স্বাভাবিক এবং সুসমঞ্জস চরিত্র চিত্রণ প্রথম শ্রেণীর কবির পক্ষেই সম্ভব। কালকেতুর রাজকীয় মহিমা খর্ব হয়েছে, কিন্তু তার চরিত্রটিতে পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় থেকেছে। ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে কালকেতুর ব্যবহার এবং ভাঁড়ু দত্তের শাস্তিবিধান কালকেতুর চরিত্রের পক্ষে সুসঙ্গতই হয়েছে।

ধনপতি ঃ

ধনপতির চরিত্রটি পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ না করলেও কাহিনীর প্রথমাংশে এই চরিত্রটিকে কবি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে তাঁর লোকচরিত্র জ্ঞানের সুগভীর পরিচয় মেলে। ধনপতি প্রতিষ্ঠাবান ধনবান বণিক,—বিলাসী নায়ক, —নাগরিক আচার আচরণে সু-অভিজ্ঞ। সৌখিন নাগরিক ধনপতি পায়রা উড়িয়ে খেলা করে। ঘরে পত্নী থাকা সত্ত্বেও সম্পর্কে শ্যালিকা খুল্লনার রূপ দেখে সে মুগ্ধ হয়। রূপ-যৌবনবতী খুল্লনাকে বিয়ে করতে সে উৎসুক। কিন্তু ঘরে আছে প্রথমা পত্নী লহনা। লহনাকে বশীভূত না করতে পারলে সুন্দরী

খুল্লনাকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তাই সুচতুর ধনপতি দক্ষ অভিনেতার মতই লহনাকে বলেছে :

রূপনাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে
চিন্তামণি নাশ কৈলে কাঁচের বদলে।
স্নান করি আসি শিরে না দেও চিরণী
রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিন্ধে পাণি।

* * * *

মাসী পিসী মাতুলানী ভগিনী সতিনী
কেহ নাহি রহে ঘরে হইয়া রান্ধনী ॥

অতএব পত্নীর দুঃখমোচনের উপায় ধনপতি সুকৌশলে ব্যক্ত করেছেন।

যুক্তি যদি লয় মনে কহিব প্রকাশি।
রন্ধনের তরে তব কর‍্যা দিব দাসী ॥
বরিষা বাদলেতে উন্নানে পাড় ফুক।
কর্পূর তাম্বুল বিনা রসহীন মুখ ॥

কবি মানবচরিত্রের মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন। ধনপতি আহারে বসলে লহনা তার মনের বেদনা প্রকাশ করলো। চতুর ধনপতি নারীর চিরকালের আকর্ষণের সামগ্রী শাড়ী আর গহনা দিয়ে মিষ্ট বাক্যে লহনাকে বশীভূত করে বিবাহের অনুমতি আদায় করে নিয়েছে।

পরিতোষে লহনারে দিয়া পাট শাড়ী।
পাঁচ পল সোনা দিল গড়িবারে চুড়ি ॥
সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মম মনে।
যেমন আছিলা পূর্বে বিবাহের দিনে ॥
রত্ন পেয়ে যত্নে নিল লহনা যুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি ।

কালির অল্প কয়েকটি আঁচড়েই কবি ধনপতিকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন।

মুরারী শীল ও তৎপত্নী ঃ

খল কুটিল চরিত্র অংকনে মুকুন্দরাম অদ্বিতীয়। স্বল্প পরিসরে অল্প কয়েকটি কথায় এক একটি চরিত্র নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ধূর্ত বণিক মুরারী শীল ও মুরারী গৃহিণীর চরিত্র দুটি মুকুন্দরামের কাব্যে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। এই চরিত্র দুটি কবির নিজস্ব সৃষ্টি।

মুরারী শীল জাতিতে বেণে। সে কুসীদজীবী—'লেখা জোখা করে টাকা কড়ি'। সরল প্রকৃতির শবর সন্তান কালকেতু তাঁর কাছে দেবী চণ্ডী প্রদত্ত অঙ্গুরী বিক্রী করতে গিয়েছিল। মুরারী অত্যন্ত ধূর্ত,—তার সঙ্গে কালকেতুর পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল। সে কালকেতুর কাছ থেকে মাংস কিনতো,—দামও কিছু কিছু বাকী থাকতো। কালকেতুর কাছে তার দেড় বুড়ি ঋণ ছিল। কালকেতু আঙ্‌টী বিক্রীর জন্য ডাকাডাকি করাতে ঋণ শোধ করার ভয়ে মুরারী ঘরের ভিতরে আত্মগোপন করলো।

পাইয়া বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর বেড়া
মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি।

মুরারীর যোগ্য সহধর্মিণী বান্যানী বাইরে এসে নির্জলা মিথ্যা বললে যে বণিক বাড়ীতে নেই। শুধু তাই নয়,– সে আবার নতুন কিছু ধারে কেনার জন্য ফর্দও দিয়ে দিল।

বীরের শুনিয়া বাণী আসি বলে ব্যান্যানী
ঘরেতে নাহিক পোতদার।
প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক পাড়া
কালি দিব মাংসের উধার।
আজি কালকেতু যাহ ঘর।
কাষ্ঠ আন্য একভার একত্র শুধিব ধার
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর।

এই কয়েকটি কথায় বান্যানীর চরিত্রটি যে ভাবে ফুটে উঠেছে তার তুলনা মেলে না। কালকেতুকে বিদায় দেবার সুন্দর কৌশল সে গ্রহণ করেছে। বেনে এবং বান্যানীর আচরণে ও কথায় এই কুসীদজীবী পরিবারটির একটি সম্পূর্ণ চিত্র প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। মিষ্ট কথায় এবং আরও কিছু ক্রয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বণিকপত্নীর ঋণশোধের অনিচ্ছাটি কবি সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

কালকেতু জানায় যে সে এসেছে আঙ্‌টী ভাঙ্গাতে। মুরারীকে না পেয়ে সে অন্য বণিকের কাছে যাবে।

আমার জুহার খুড়ী কালি দিহ বাকী কড়ি
অন্য বণিকের যাই বাড়ী।

কালকেতুর এই বাক্যে বণিকপত্নী ধনলোভে লোলুপ হয়ে ওঠে। পাছে অঙ্গুরী বেহাত হয় এই ভয়ে সে কণ্ঠে মধু ঢেলে বলেছে ঃ

সরস করিয়া বাণী হাসি কয় বান্যানী
দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন।

ধনের গন্ধ পেয়েই ধূর্ত লোভী মুরারী খিড়্কীর দ্বার দিয়ে উপস্থিত হয়েছে,— পায়ে ধূলা মেখে সে যে দূরে গিয়েছিল, তাও প্রমাণিত করতে প্রয়াসী হয়েছে।

ধনের প্পাইয়া আশ আসিতে বীরের পাশ
ধায় বেনে খিড়কির পথে।
মনে বড় কুতূহলী কান্ধেতে কড়ির থলি
সাপড়ি তরাজু লইয়া হাতে॥
খুড়া খুড়া বীর ডাকে বান্যা পায়ে ধূলা মাখে
করে বীর বান্যার জোহার।

ধূর্ত বেণের চরিত্রটি এই বর্ণনায় একেবারে সজীব হয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। এবারে বেণে কালকেতুকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ অসাক্ষাতের জন্য মৃদু অনুযোগও করেছে।

বাণ্যা বলে ভাইপো এবে নাই দেখিতো
এ তোর কেমন ব্যবহার।

অঙ্গুরী নিয়ে পরীক্ষা করে বেণে বলেছে গম্ভীর ভাবে ঃ

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপা কর‍্যাছ উজ্জ্বল ॥

বেণের প্রচণ্ড লোভ এবং মহামূল্য অঙ্গুরীটি ঠকিয়ে নেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তাই ঘষে মেজে উজ্জ্বল করা নিতান্তই মেকি এই অঙ্গুরীটির সামান্য কিছু মুল্য এবং পূর্বের ঋণ একত্র দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। পাছে মুরারীর শঠতা প্রকাশ পায় কোন প্রকারে তাই সঙ্গে সঙ্গে মুরারী আঙ্‌টীর দাম ও কালকেতুর মোট প্রাপ্য সম্পর্কে একটা হিসাব খাড়া করে কালকেতুকে প্রলুব্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছে।

রতি প্রতি হৈল বীর দশ গণ্ডা দর।
দুই ধানের কড়ি তায় পাঁচ গণ্ডা ধর ॥
অষ্টপণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাংসের পিছিলা ধার ধারি দেড়বুড়ি ॥
একুনে হৈল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি।
চালু খুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি ॥

কালকেতু জানে, দেবী প্রদত্ত এই অঙ্গুরীয়কের মূল্য প্রচুর। তাই পূর্বের ধার সমেত অষ্টপণ আড়াই বুড়িতে সে খুশী হতে পারলো না। কালকেতু বলে ঃ "যে জন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাঁই।" বেণে সঙ্গে সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করেছে ঃ

বেণে বলে দরে বাড়াইলুঁ পঞ্চবট।
আমা সঙ্গে সওদা কর না পাবে কপট ॥

এই সঙ্গে ধূর্ত বণিক কালকেতুর পিতার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মৃদু গঞ্জনা দিয়েছে তাকে অবিশ্বাস করার জন্য।

ধর্মকেতু দাদা সঙ্গে ছিল লেনা দেনা।
তাহা হৈতে ভাইপো হয়্যাছ সেয়ানা॥
কোন্ কথা লাগি বাপু কর হুড়াহুড়ি।
যদি না লও চাল্য খুদ সব দিব কড়ি॥

কিন্তু কালকেতু তাতেও রাজী না হওয়ায় বেণে আরও আড়াই বুড়ি দাম বাড়ায়।

বেণে বলে দরে বাড়াইলুঁ আড়াই বুড়ি।
চালু খুদ না লইও গুণে লও কড়ি॥

আকাশ থেকে দেবী চণ্ডী অঙ্গুরীর মূল্য ঘোষণা করলেন: "সাত কোটি তঙ্কা হয় অঙ্গুরীর মূল্য।" 'আকাশ ভারতী' শুনে বণিকের চৈতন্য হোল। কিন্তু এই প্রবঞ্চনাজাত অপ্রতিভতাকে সারল্যের আবরণে ঢেকে কপট হাসি হেসে সে বলে:

"এতক্ষণ পরিহাস কৈঁলু ভাইপো রে।"

এই ধূর্ত প্রবঞ্চক বণিক মুরারী শীল ও তার যোগ্য পত্নীর চরিত্র কত অনায়াস দক্ষতায়, কত সংক্ষিপ্ত পরিসরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে! এরা যে আমাদের অতি পরিচিত প্রতিবেশী—এতটুকুও নেই অতিরঞ্জন—এ কথা উপলব্ধি করতে মুহূর্তও বিলম্ব হয় না। নিপুণ চিত্রকর মুকুন্দরাম বণিক ও বণিকপত্নীকে চিরস্মরণীয় করে তুলেছেন।

ভাঁড়ু দত্ত:

মুরারী শীলের পরেই ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। এইটি মুকুন্দরামের দ্বিতীয় অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। কালকেতুর নূতন রাজধানীতে বসবাস করবার জন্য যারা এসেছিল, ভাঁড়ুদত্ত তাদের অন্যতম।

ভাঁড়ু দত্ত নিঃস্ব, শঠ, নীচ ও ধূর্ত। তার জীবনের একমাত্র সম্বল জাত্যাভিমান। সে কায়স্থ এবং কুলশীলে শ্রেষ্ঠ,—একথা সে সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছে। দীন দরিদ্র ব্যাধ কালকেতু হঠাৎ রাজা হয়েছে আর ভাঁড়ু যেমন

ছিল তেমনি দরিদ্রই আছে,—এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা ভাঁড়ুর মত ঈর্ষাকাতর ব্যক্তির সহ্য হওয়ার কথা নয়। ভাঁড়ু সহ্য করতেও পারলে না। প্রথমতঃ সে পরম আত্মীয় সেজে কালকেতুকে পরামর্শ দিতে এলো। কালকেতুর রাজ্যে ভাঁড়ুর প্রথম আবির্ভাবের বর্ণনাতেই মুকুন্দরাম তাকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

ভেট লয়ে কাঁচাকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগু ভাঁড়ুদত্তের পয়াণ।
ফোঁটা কাটা মহাদন্ত ছিঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশান॥

প্রবেশের পরেই ভাঁড়ুর প্রয়াস কালকেতুর সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্ক পাতানোর।

প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে,
সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলে বসি মুখে মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেয় বাহুনাড়া।

ভাঁড়ু নিজের কুলগৌরব সম্পর্কে বলেছে:

যতেক কায়স্থ দেখ, ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ,
কুলশীল মহত্ত্ব বিচারে॥

অবশেষে ভাঁড়ু কালকেতুর কাছে নিবেদন করেছে প্রাণের কথা:

আমি পাত্র তুমি রাজা, আগে কর মোর পূজা
অবশেষে ভাঁড়ুরে জানিবা॥

প্রথমে কালকেতু ভাঁড়ুর কথায় বিশ্বাস করে তাকে বহু মান দিয়েছে। অতঃপর ভাঁড়ু রাজকার্য সম্পর্কেও কালকেতুকে উপদেশ দিয়েছে অযাচিত-ভাবে। কি ভাবে প্রজাকে শোষণ করতে হয় তার একটি চমৎকার মতলব ভাঁড়ু কালকেতুকে দিয়েছে।

তাড় বালা দিবা মান   করজ বলদ ধান
উচিত বলিতে কিবা ভয়।
জিনিতে প্রজার মায়া   পত্র নিবা এক ছেয়া
বন্দে বন্দে প্রজা যেন রয়।
যখন পাকিবে খন্দ   পাতিবা বিষম ফন্দ
দরিদ্রের ধানে নিবে নাগা।
খাইয়া তোমার ধন   না পলায় কোন জন
অবশেষে নাহি পায় দাগা॥

কালকেতু ভাঁড়ুর কথায় নীরব থাকে। প্রথমতঃ সে ভাঁড়ুর কথায় বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ভাঁড়ুর উপদেশ সে গ্রহণ করেনি। মনে হয়, ভাঁড়ুর চরিত্রের আভাষ সে পেয়েছিল। কালকেতুর কাছে মোড়লি না পেলেও ভাঁড়ু মোড়ল সেজে হাটে গিয়ে অন্যায়ভাবে উৎপীড়ন করে হাটুরিয়াদের কাছ থেকে তোলা নিতে আরম্ভ করেছিল।

এমন সময়ে ভাঁড়ু দত্ত হাটে আইসে।
পসারি পসার ঢাকে ভাঁড়ুর তরাসে॥
পসরা লুঠিয়া ভাঁড়ু পূরয়ে চুবড়ি।
যত দ্রব্য লয় লুঠি নাহি দেয় কড়ি॥
লণ্ডে ভণ্ডে গালি দেয় বলে শালা শালা।
আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা॥
টানাটানি করে ভাঁড়ু পসারি না ছাড়ে॥
চুলে ধরে কিল লাথি মারে তার ঘাড়ে॥

সুতরাং অত্যাচারিত হাটুরে প্রজারা রাজা কালকেতুর কাছে নালিশ জানাল।

ভাঁড়ু জানে কত কলা   পর দ্বন্দ্বে পাতে ছলা
টাকা সিকা নিত্য যায় খতি।

ভাঁড়ু যত পীড়া করে, কেবা তা সহিতে পারে
না জানি পালায়ে যাব কতি ॥

এই অত্যাচারের কাহিনী শুনে কালকেতু ভাঁড়ুকে ডেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। ভাঁড়ু 'ঋণ বাড়ি' দেয় না,—করও দেয় না, নিজে মোড়ল সেজে প্রজার কাছ থেকে তোলা নেয়,—আবার ভাঁড়ুর উপযুক্ত পুত্রটির জ্বালাতেও বৌ ঝি বাড়ীর বার হতে পারে না।

বহুড়ি জলেতে যায় আহরে থাকিয়া চায়
দূর হইতে ফেলি মারে ঢেলা ॥

এ হেন ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর কাছে অপমানিত হয়ে মনের ক্ষোভ চাপতে পারে না,—তার অন্তরের তীব্র দাহের কারণটি ব্যক্ত করে ফেলে।

তিন গোটা শর ছিল একখান বাঁশ
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস ॥
দৈবযোগে আমি যদি ছিলাম কাঙ্গাল।
দেখিয়াছি খুড়া গো তোমার ঠাকুরাল ॥

কঠোর নির্মম ব্যঙ্গমিশ্রিত জ্বালাময়ী এই উক্তি। কালকেতু কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে পথে বেরিয়ে ভাঁড়ু প্রতিজ্ঞা করেছে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার।

(যদি) হরিদত্তের বেটা হঙ্ জয় দত্তের নাতি।
হাটে যদি বেচাঙ্ বীরের ঘোড়া হাতী ॥
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনর্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা ॥

ভাঁড়ু দত্তের ঈর্ষার জ্বালা ও কঠোর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি এই উক্তিতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এইবার ভাঁড়ু চিরকালীন বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কালকেতুকে শায়েস্তা করতে সে প্ররোচিত করলো কলিঙ্গ-রাজকে। কলিঙ্গরাজ খোঁজ খবর নিয়ে আক্রমণ করেছে কালকেতুর গুজরাট

রাজ্য। কিন্তু মহাবীর কালকেতুর সঙ্গে গুজরাট সৈন্য এঁটে উঠতে পারেনি। গুজরাট সেনা রণে ভঙ্গ দেওয়ায় ভাঁড়ুদত্তের কী বিষম মনস্তাপ!

রাজ সেনা ভঙ্গ দিল ভাঁড়ু ভাবে দুখ।
আজি ভাঁড়ু দত্তে হৈল বিধাতা বিমুখ॥

ভাঁড়ুর তর্জনে গর্জনে কোটাল পুনর্বার গুজরাট আক্রমণ করলো,—কারণ কলিঙ্গ রাজের কাছে বন্দী কালকেতুকে পৌঁছে দিতে হবে। কালকেতুও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ফুল্লরার পরামর্শে সে যুদ্ধ ত্যাগ করে ধান্যঘরে লুকিয়ে রইলো। সরলা ব্যাধকন্যা ফুল্লরাকে চিনতে ভাঁড়ুর দেরী হয়নি। সে জানতো যে লুক্কায়িত কালকেতুর সন্ধান ফুল্লরার কাছেই পাওয়া যাবে। ফুল্লরার কাছে কালকেতুর সংবাদ সংগ্রহের জন্য ভাঁড়ু কালকেতু ও ফুল্লরার হিতৈষী সেজেছে। ভাঁড়ু বলেছে যে কলিঙ্গরাজ অন্যের প্ররোচনায় রুষ্ট হয়ে কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করেছে। ভাঁড়ু কালকেতুকে বাঁচাবার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছে।

করিলুঁ অনেক ন্যায়, ঘুচাইলুঁ সব দায়
ভয় কিছু না করিহ মনে॥
রাজা হয়ে পরিতোষ ক্ষমিলা সকল দোষ
বীরকে করিবে সেনাপতি।
গুজরাট জায়গিরি আর দিবে অষ্টপুরী
এবে তুমি হবে ভাগ্যবতী॥

'ঠকের বাণী' শুনে ফুল্লরা ধান্যঘরের দিকে তাকিয়েছে। ফুল্লরার মনের ভাব বুঝতে ভাঁড়ুর মুহূর্ত বিলম্ব হয় নি।

"সুচতুর ভাঁড়ু দত্ত বুঝিল কার্যের তত্ত্ব।"

অতঃপর কালকেতু বন্দী হয়েছে, নির্যাতীত হয়েছে, পরে চণ্ডীর কৃপায় মুক্তি পেয়ে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলে ভাঁড়ু ধোওয়া তুলসী পাতা সেজে আবার এসেছে কালকেতুর কাছে। কাঁচাকলা, শাক, বেগুন, কচু, মূলা প্রভৃতি ভেট দিয়ে

কালকেতুর বন্দিত্বের জন্য দুঃখ এবং মুক্তিতে অপার আনন্দ সে প্রকাশ করেছে—কালকেতুর গৌরব প্রকাশিত হওয়ার জন্য নিজের কৃতিত্বও জাহির করেছে।

প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
খুড়া দেখি ঘুচিল আঁধার।
আছিলে গুপত বেশে প্রকাশ করাল্য দেশে
সম্ভাষা করালুঁ নৃপমণি।

* * *

খুড়া তুমি হৈলে বন্দী অনুক্ষণ আমি কান্দি
খুড়ী মোর নাহি খায় ভাত।
দেখিয়া তোমার মুখ দূরে গেল সব দুখ
দশদিশ হৈল অবদাত॥

শঠ শিরোমণি ভাঁড়ুর চরিত্রটি চোখের সামনে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। ভাঁড়ুর চরিত্রে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করে কবি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। মুকুন্দরামের ভাঁড়ুদত্ত type চরিত্র নয়—একটি রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ। এই জাতীয় ঠক্ চরিত্র সর্বদেশে সর্ব কালেই আছে। কিন্তু এমন অপূর্ব সৃষ্টি মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নেই—আধুনিক সাহিত্যেও সুলভ নয়।

শ্রীমন্তের গুরুমশায়ঃ

শ্রীমন্তের গুরুর চরিত্রে তেমন কোন বিশেষত্ব নেই। কাব্যের প্রয়োজনেই চরিত্রটির উপস্থাপনা। গুরু জনার্দন ওঝার নানা শাস্ত্রে পারদর্শিতার কথা কবি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই জাতীয় চরিত্রে যে মহত্ত্ব এবং উদারতা আশা করা যায় জনার্দন ওঝার তার একান্ত অভাব। জনার্দন বড় নির্মম ও নীচমনা। ছাত্রের কাছে পরাজয় কামনা করেন যে গুরু জনার্দন তেমন নন। শ্রীমন্ত গুরুর টীকার ত্রুটি বিচার করায় তিনি ছাত্রের জন্ম সম্পর্কে ইতরজনোচিত কুৎসিৎ মন্তব্য করেছেন। জনার্দন পরমত অসহিষ্ণু। নিজের ছাত্রের প্রতি

এইরূপ কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ অনুচিত এবং অশোভন। লোভী এবং ইতর মনোভাব সম্পন্ন এই গুরু চরিত্রে কবি গ্রাম্য লোভী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চিত্রটিই ফুটিয়ে তুলেছেন।

ফুল্লরা ঃ

ফুল্লরার চরিত্রটিকে কবি আরণ্য পরিবেশে গড়ে তুলে সজীব ও স্বাভাবিক করে তুলেছেন। "মুকুন্দরাম এই বন্য পরিবেশের মধ্যেই ফুল্লরাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া তাহার যথার্থ সৌন্দর্যের প্রকাশ হইয়াছে। এইখানেই মুকুন্দরামের প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি নিজে অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া তাঁহার প্রতিবেশী অনার্য জীবনকে গভীর মমতার সহিত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার সমগ্র রস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই নারী চরিত্রটি এখানে চিত্রিত করিয়াছেন। কবির নিজস্ব শুচিদৃষ্টি এই অনার্য নারীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহার নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে ইহাকে তিনি নিঃসংকোচ ও স্বাধীন গতিবিধির অধিকার দিয়াছেন—এই জন্যই এই চরিত্রটি সকল দিক দিয়া এত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।" (ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য)

ফুল্লরা কালকেতুর ধর্মপত্নী। কালকেতুর বিয়ের পরই ফুল্লরা শ্বশুর পত্নীর সঙ্গে কাশী চলে গেছে। ফুল্লরা ও তার স্বামী—দুজনের সংসার। কালকেতু সারাদিন পশু শিকার করে মৃতপশুর ভার নিয়ে অপরাহ্নে বাড়ী ফেরে। ফুল্লরা যত্ন করে স্বামীর জন্য রন্ধন করে রাখে। স্বামীর সাড়া পেয়েই সে স্বামীর আহারের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

দূর হৈতে ফুল্লরা বীরের পেয়ে সাড়া।
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণ-চামড়া॥
মোচা নারিকেলেতে পুরিয়া দিল জল।
ঝাটি জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল॥

শুধু গৃহকর্ম এবং স্বামী সেবা নয়, ফুল্লরা মাংসের পসরা নিয়ে হাটে বিক্রী করতেও যায়—শাকপাতা তুলে উদরান্নের ব্যবস্থাও করে। ফুল্লরার প্রকৃত পরিচয়,

সে স্বামী সোহাগিনী। সংসারের অভাব দারিদ্র্য সে হাসিমুখে সহ্য করে। ঘরে খাবার না থাকলে সখীর বাড়ী থেকে ক্ষুদ ধার করে আনে, নয়ত শাকপাতা ফলমূল খেয়ে থাকে। নিজের দুঃখ দারিদ্র্যের জন্য সে অদৃষ্টকে নিন্দা করেছে,—দরিদ্রের ঘরে বিয়ে দেওয়ার জন্য বাবা মাকেও দোষারোপ করেছে—কিন্তু কখনও স্বামীকে দোষী করেনি। চণ্ডীর নিকট বারোমাসের দুঃখকাহিনী বর্ণনা কালে ফুল্লরা তার নিদারুণ দারিদ্র্যের চিত্রটি তুলে ধরেছে,—এই অসহ দারিদ্র্যের জন্য অদৃষ্টকে বিধাতাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে,—নিজের মৃত্যু কামনা করেছে, কিন্তু স্বামীর নিন্দা করে নি।

বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি
কত শত জোঁক খায় নাহি খায় ফণী॥

এই দুঃখের মাঝেই ফুল্লরার সুখ তার স্বামীকে নিয়ে। কিন্তু এই দুঃখসুখের সংসারের মাঝে যখন সে চণ্ডীর কথা থেকে বুঝতে পারে যে এই আশ্চর্য রূপ-যৌবনৈশ্বর্যময়ী নারী তার স্বামিত্বের অধিকারে ভাগ বসাতে এসেছে তখনই ফুল্লরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। নানাভাবে সে এই সুন্দরীকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেছে,—শুনিয়েছে সতীত্ব-মাহাত্ম্য-কাহিনী—শুনিয়েছে পুরাণকাব্য, সবশেষে বর্ণনা করেছে নিজের বারমাসের দুঃখ। এখানে সতীত্বমহিমাসূচক পুরাণ কথা ফুল্লরার মুখে স্বাভাবিক হয়নি। মঙ্গলকাব্যের রীতিকে স্বীকার করে নিতে গিয়ে মুকুন্দরাম সমাজনীতির আদর্শ ফুল্লরার মুখ দিয়ে প্রচার করেছেন। এখানে ফুল্লরা যন্ত্র মাত্র। কিন্তু ফুল্লরার প্রকৃত স্বরূপ এখানেও চাপা পড়েনি। চণ্ডী সপত্নীর জ্বালায় গৃহত্যাগ করেছেন, একথা শুনে ফুল্লরা চণ্ডীকে বলছে:

সতিনে কোন্দল করে দ্বিগুণ শুনাবে তারে
কেন ঘর ছাড় হয়ে মানী।
কোপে কৈলে বিষপান, আপনি ত্যজিবে প্রাণ
সতীনের কিবা হবে হানি॥

এইখানেই ফুল্লরা ফুল্লরা। কোনমতে চণ্ডীকে তাড়াতে না পেরে ফুল্লরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে—স্বামীর উপর নিঃসপত্ন অধিকার বুঝি সে হারাতে বসেছে।

বিষাদ ভাবিয়া কান্দে ফুল্লরা রূপসী।
নয়নের লোহেতে মলিন মুখশশী ॥

ফুল্লরা ছুটলো গোলাহাটে যেখানে কালকেতু গেছে বাসি মাংস বিক্রী করতে। ফুল্লরা কালকেতুকে তীব্র ভৎর্সনা করেছে :

পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে ॥
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটিয়া ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী ॥

এই দ্বন্দ্বের অবসানের পর চণ্ডী কালকেতুকে দিয়েছেন মহামূল্য অঙ্গুরীয়ক। দেবী প্রদত্ত একটি মাত্র অঙ্গুরী ফুল্লরা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি। সে ঐ সামান্য অনুগ্রহ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে কালকেতুকে। সামান্য ধন নিয়ে দুর্নাম কেনার কি প্রয়োজন ?

বীরহস্তে দিলা চণ্ডী মাণিক্য অঙ্গুরী।
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী ॥
এক গোটা অঙ্গুরীতে হবে কোন কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম ॥

এই আঙটীর মূল্য সাতকোটি টাকা জেনেও ফুল্লরা প্রসন্ন হতে পারেনি। হয়ত সে বিশ্বাস করেনি, নয়ত সাতকোটি টাকার পরিমাণ উপলব্ধি করতে পারেনি।

এই অঙ্গুরীর মূল্য সাতকোটি টাকা।
ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ করে বাঁকা ॥

কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে ধনের লোভে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ স্বাভাবিক হয়েছে ফুল্লরার পক্ষে।

এরপর ফুল্লরা রাজরাণী হয়েছে। কিন্তু রাজরাণী ফুল্লরার কোন বিবরণ

কবি দেননি। ফুল্লরাকে তার স্বরূপে দেখি কলিঙ্গরাজের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধকালে। অমিত শক্তিশালী বীর কালকেতু, একথা ফুল্লরার অজানা নয়। প্রথম বারের যুদ্ধে কলিঙ্গসৈন্য পর্যুদস্ত হয়েছে। তথাপি ফুল্লরা এই মহাবীর স্বামীকে উপদেশ দিয়েছে ধান্যঘরে আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা করতে।

যদি থাকে জীবের আশা ত্যজিয়া দেশের বাসা
প্রাণ লয়্যা চল মহাবীর।

* * *

ফুল্লরার কথা রাখ, কিছুকাল জীয়া থাক
না যাইহ রাজার সমরে ॥

কালকেতু পত্নীর কথা শুনে ধান্যঘরে লুকিয়েছে। কিন্তু ভাঁড়ুদত্তের কপট বাক্য শুনে ফুল্লরা ধান্যঘরের দিকে চোখ ফিরিয়ে গুপ্তস্থানেব নির্দেশ দিয়েছে।

ঠকের মধুর বাণী এক চিত্তে রামা শুনি
ধান্যঘরে করে নিরীক্ষণ ॥

ফুল্লরা ফুল্লরাই আছে। মনে হয় সে ভাঁড়ুর কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেনি। তাই নারীসুলভ দুর্বলতায় ধান্যঘর নিরীক্ষণ করে স্বামীর বিপদ এনে দিয়েছে। কবি অল্প কয়েকটি কালির আঁচড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ব্যাধ-রমণী ফুল্লরা রাজরাণী হয়েও সরলা ব্যাধ-রমণীই আছে। স্থানে স্থানে ফুল্লরার মুখের পুরাণকথাগুলি বাদ দিলে ফুল্লরা চরিত্রটির আদ্যন্ত সঙ্গতি অত্যন্ত দক্ষতায় সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে—একথা নিঃসংকোচে বলা যায়।

বিমলা ঃ

বিমলা ফুল্লরার সখী। তার ভূমিকা একান্ত নগণ্য। কালকেতু অরণ্যে শিকার না পাওয়ায় ফুল্লরা সখী বিমলার বাড়ীতে কিছু ক্ষুদ ধার করতে গেছে। 'আইস আইস বলি' বিমলা সখীকে আহ্বান করলো; সখীর দীর্ঘ অদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করলো; তারপরে সখীর পরিচর্যা শুরু করে বিমলা।

শিরে তৈল দিয়া তার বান্ধিল কবরী।
সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচরী॥
চাপিয়া বসিতে দিল গান্ধারের পিঁড়ি।
আঁচল ভরিয়া দিল খই আর মুড়ি॥

এমন আন্তরিক আতিথেয়তা বাঙ্গালা দেশের মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব। আতিথেয়তা ও পরিচর্যা শেষ হলে বিমলা বলে ঃ

আইস প্রাণের সই ধরহ চিরণি।
মোর মাথে গোটা কত দেখহ উকুনি॥

ফুল্লরার প্রাণের সই বিমলার প্রকৃত পরিচয় এইখানে। পা ছড়িয়ে মাথার উকুন বাছার চিত্র বাঙ্গালার পল্লীর বাস্তব চিত্র। এই সামান্য একটু কথাতেই সরলা পল্লীবধূ বিমলার চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

লহনা ঃ

লহনা বাঙ্গালী ঘরের অতি সাধারণ বধূ। কোন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য জীবন রসিক কবি তার চরিত্রে আরোপ করেননি। লহনা ধনপতির প্রথমা পত্নী। প্রথম জীবনে স্বামীর স্নেহভালবাসা সে পেয়েছিল। স্বামিত্বের ভাগ যে কোন নারীর মতই সেও দিতে নারাজ। যখন সে শুনলো যে তার স্বামী তারই ভগ্নী রূপসী খুল্লনার রূপে মোহিত হয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইছে তখনই নিদারুণ অভিমান তাকে গ্রাস করেছে।

লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর।
অভিমান ভরে রামা না দেয় উত্তর॥

ধনপতি কপটতা করে লহনাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছে। রন্ধনের শালে রূপযৌবন নষ্ট হতে চলেছে—এই ক্ষোভে ধনপতি লহনার জন্য দাসী এনে দেবে বলেছে। লহনা স্বামীকে পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করিয়ে ক্ষোভে দুঃখে ধনপতিকে ভর্ৎসনা করতেও কুন্ঠিত হয়নি। ধনপতির

বাক্যে কপটতার আভাষ সে স্বাভাবিক বুদ্ধি বলেই পেয়েছিল। আজ সে বিগতযৌবনা,—তায় আবার সন্তানহীনা। স্বামী তার একমাত্র সম্বল, তাও অন্যের হাতে যেতে বসেছে। লহনা বলেছে:

কপট সম্ভাষ তেজ পরিহাস
সে সব আদর গেল।
কোন মূঢ়মতি, দিনে জ্বালে বাতি,
সে বা কিনা করে আলো॥
স্ত্রী গতযৌবনে পুরুষ নির্ধনে
কি আর আদরে চিন।
কামদেব পাপ নাহি ধরে চাপ
করি রাখে গুণহীন॥

কিন্তু চতুর ধনপতি শাড়ী আর গহনা দিয়ে অভিমানিনী লহনার চিত্ত জয় করে নিয়েছে। যে কোন সাধারণ রমণীর মত শাড়ী গহনা ও ধনপতির মিষ্ট বাক্যে লহনা বশীভূত হয়েছে। পাঁচ পল সোনা ও পাটশাড়ী পেয়েই লহনা ধনপতিকে বিবাহের অনুমতি দিয়েছে।

রত্ন পায়্যা যত্নে নিল লহনা যুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি॥

লহনা খল—কুটবুদ্ধি সম্পন্না নয়। সে সাধাসিধা সরল প্রকৃতির মেয়ে। ধনপতি বাণিজ্য যাত্রার কালে লহনার হাতে খুল্লনাকে অর্পণ করে জননীর মমতায় পালন করতে অনুরোধ জানিয়েছে। লহনা সে অনুরোধ রক্ষা করেছে। সে পরম স্নেহে সযত্নে খুল্লনার পরিচর্যা করেছে।

দু সতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া লাগয়ে ধন্দ
সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা।

কিন্তু দাসী দুর্বলা দুই সতীনের প্রেমবন্ধ দেখে সহ্য করতে পারলো না। তার কুমন্ত্রণায় লহনার বুকে সপত্নীর প্রতি ঈর্ষানল জ্বলে উঠলো। সে গুরু

করলো খুল্লনার প্রতি অত্যাচার। সখী লীলাবতীর সঙ্গে পরামর্শ করে সে ধনপতির নামে জাল চিঠি লিখিয়ে খুল্লনার প্রতি অত্যাচারে ধনপতির নির্দেশ জ্ঞাপন করলো। এমনকি খুল্লনাকে মারধোর করতেও সে দ্বিধা করেনি। দৈহিক শক্তিতেও সে খুল্লনা অপেক্ষা প্রবলা। আবার দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে সে ছুটেছে অরণ্যে খুল্লনার সন্ধানে। লহনা খুল্লনার নিকটে নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করেছে। দুই সতীনের বিবাদ মিটে গেছে। লহনা খুল্লনাকে প্রবোধ দিয়ে বলেছে:

যে ঘরে নিবসে সতা, অবশ্য কোন্দল তথা
বৈরভাব না ভাবিও মনে।
যার সনে বার মাস একত্র করিবে বাস,
অবশ্য কোন্দল তার সনে॥

লহনার এই কথায় আন্তরিকতার অভাব লক্ষিত হয় না। কিন্তু সন্তানহীনা এই নারী স্বামীটিকে হাতছাড়া করার আশংকায় সতত সন্ত্রস্ত। ধনপতির প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পওয়া মাত্রই লহনা বশীকরণের ঔষধ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে বলেছে দুর্বলাকে। পতিসোহাগবঞ্চিতা বিগতযৌবনা বন্ধ্যা নারীর এই মর্মান্তিক সকরুণ প্রয়াস লহনা চরিত্রটিকে সকরুণ করে তুলেছে।

পতি আগমন বার্তা শুনি দূতমুখে।
দুর্বলারে বলে রামা বিষাদ কৌতুকে॥
বর্ষপরে প্রাণনাথ ঘরে এল মোর।
খুল্লনার রূপ দেখি হইবে বিভোর॥
এড়িয়াছ কোথা মোর ঔষধ উপায়।
প্রাণনাথে কর বশ হইয়া সহায়॥

শুধু ঔষধ দ্বারা স্বামী বশের ব্যবস্থা করেই লহনা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি—খুল্লনা সুসজ্জিতা হয়ে স্বামী সম্ভাষণে গেছে জেনে লহনাও সজ্জিতা হয়েছে, ধনপতির সম্ভাষণের উত্তরে সে খুল্লনার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে পতির

প্রিয় হবার চেষ্টা করেছে—সুসজ্জিতা লহনা প্রিয়মিলনে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'লে নানা অজুহাতে সে খুল্লনাকে নিবৃত্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস করেছে। আবার ধনপতি জ্ঞাতি-কুটুম্ব ভোজনের আয়োজন করলে খুল্লনার রন্ধনে অপটুতার কথা ব্যক্ত করে লহনা নিজেই রন্ধনকার্যে ব্রতী হ'তে চেয়েছে পতির পরিতুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ধনপতি লহনাকে উপেক্ষাই করেছে। তাই ভোজনকালে কুটুম্ববর্গ রান্নার প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠলে অভিমানিনী লহনা ভেসেছে চোখের জলে।

> প্রশংসা করয়ে সবে রন্ধন সকল।
> শুনি লহনার ক্ষরে নয়নের জল ॥

সপত্নী কোন্দলের বিচিত্র গতি—ঈর্ষা বিবাদ—মান-অভিমান—মানভঞ্জনের মধ্য দিয়ে খুল্লনা-লহনা চরিত্র দুটি প্রাণময়ী বাস্তব নারীরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। লহনা চরিত্রটিতেও কবি বাস্তব জীবনরস সার্থক ভাবে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। ঈর্ষাতুরা নারীর বিচিত্র ভাবভঙ্গীগুলি ত্রুটিহীন ভাবে বর্ণনা করেছেন মুকুন্দরাম। শ্রীমন্ত গুরুমশায়ের গঞ্জনা শুনে বাড়ীতে এসে রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করায় খুল্লনা যখন পাগলিনী প্রায় চলেছে পুত্রের সন্ধানে, লহনা তখন কৌতুক বোধ করেছে, সখীর কাছে খুল্লনার কুৎসা করেছে।

> খুল্লনা চলিল যদি পুত্রের তল্লাসে।
> আঁখি ঠারে লহনা সখীর সঙ্গে হাসে ॥

কবি লহনার সবটুকুই তুলে ধরেছেন—কোন কিছুই গোপন করেননি। তার ভালমানুষি—তার ঈর্ষা—তার ব্যর্থতা সবটুকুই সম্পূর্ণ করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। আর সেইজন্য লহনা চরিত্রটি পাঠকের সর্বাধিক সহানুভূতি লাভ করে। কবিরও গভীর সহানুভূতি পড়েছিল লহনার উপরে। এই বিগতযৌবনা বন্ধ্যানারী স্বামীর সোহাগ-বঞ্চিত হওয়ার আশংকায় কত মর্মান্তিক প্রয়াসই না করেছে। বশীকরণের ঔষধপত্র প্রয়োগ,—বোন সতীন খুল্লনার উপর নির্যাতন,—নানাবিধ ছলনার আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি কত পন্থাই সে

গ্রহণ করেছে! কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তার সকল প্রয়াস। যেদিন লহনা ঈর্ষার জ্বালায় দগ্ধ হয়ে স্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'রে রূপসী যুবতী পত্নীতে আসক্ত স্বামীর দ্বারা লাঞ্ছিত হ'য়ে বিলাপ করেছে সেই দিনই সে সমগ্র বিশ্বের কৃপার পাত্রী হয়ে গেছে। যার জন্য এত কাণ্ডকারখানা করলো লহনা—সেই স্বামীই তাকে 'বাঁজি' বলে ঘর থেকে বিতাড়িত করে দিলে।

চল ঘর ছাড়ি বাঁজি চল ঘর ছাড়ি।
যদি নাই যাবি বাঁজি পাহুড়ির বাড়ি॥

স্বামীর সান্ত্বনা বাক্যেও লহনা আর আশ্বাস খুঁজে পায়নি। সে আক্ষেপ করে দুর্বলাকে বলেছে :

দুয়া ঝাট আনি দেহ মোর সই।
পেচার অধিক ভীত নিমের অধিক তিত।
এবে হৈনু বাস ঘরে মুই॥
গিয়াছে যৌবনকাল এবে সতীনের জ্বাল
তৃণসম আপনারে বাসি।
ঔষধ করিলুঁ যত সে হইল বিপরীত
ঠাকুরাণী হ'য়ে হইলুঁ দাসী॥

কবির সহানুভূতি যেমন পড়েছে এই বঞ্চিতা নারীটির উপরে, তেমনি তিনি সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পেরেছেন পাঠক কুলেরও।

খুল্লনা :

খুল্লনা চরিত্রটি লহনারই পরিপূরক। তথাপি খুল্লনা লহনা থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। যে ধনপতির দ্বিতীয়া পত্নী—অপরূপা সুন্দরী—পরিপূর্ণা যুবতী এবং রসিকা। ধনপতি পলাতক পারাবতটিকে ফিরিয়ে নেবার জন্য খুল্লনার শরণাপন্ন হলে খুল্লনা ধনপতির সঙ্গে পরিহাস করতে ছাড়ে না।

ঈষৎ হাসিয়া রামা করে পরিহাস।
পারাবত হেতু সাধু তুমি ছাড় আশ ॥
আজিকার মত ছাড় মোর অনুরোধ।
আপনা আপনি সাধু করহ প্রবোধ ॥

বিয়ের পরে খুল্লনা জ্যেষ্ঠা ভগিনী তথা সপত্নীর অনুগত হয়েই ছিল। কিন্তু লহনার সপত্নী বিদ্বেষের সঙ্গে সেও জড়িয়ে পড়েছে। খুল্লনা নিতান্ত নির্বোধ নয়। ধনপতির নামে লেখা চিঠিখানিকে সে জাল বলেই গ্রহণ করেছে। লহনা তার উপরে দৈহিক উৎপীড়ন শুরু করলে সেও নীরবে সহ্য করেনি। নিজে দুর্বলা হলেও সে লহনার অত্যাচারের প্রত্যুত্তর দিতে অগ্রসর হয়েছে।

চুলা চুলি দোঁহে অঙ্গনেতে করে।
চেয়ে রহে সবে নিবারিতে নারে ॥

কিন্তু লহনার শক্তির কাছে এঁটে উঠতে পারেনি খুল্লনা।

বড় বহুড়ী প্রবলা ছোটজন একেলা
কলহ হইল সেই দিন।
চক্ষে চক্ষে চাহিয়া রোষযুতা হইয়া
খুল্লনা হৈল বলাধীন ॥

লহনার শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে খুল্লনাকে বাধ্য হয়ে লহনার আদেশ মেনে চলতে হয়েছে। লহনা বেশ চতুরাও। স্ত্রীজাতি সুলভ স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিতে সে কোন অংশে কম নয়। মহামায়া চণ্ডী যখন কাননমধ্যে খুল্লনাকে বর দিতে চাইলেন, খুল্লনা তখন সুকৌশলে নিজের মনোভাবটি ব্যক্ত করেছে।

পুত্রবর মাগিব কি স্বামী নাহি ঘরে।
কি করিব বহুধন আছয়ে ভাণ্ডারে ॥

স্বামীর প্রত্যাগমন এবং পুত্রলাভ—উভয় কামনাই খুল্লনা সুকৌশলে চণ্ডীর কাছে ব্যক্ত করেছে। খুল্লনা শান্ত স্বভাবা। দুরদৃষ্টকে সে মেনে নিয়েছিল লহনার আজ্ঞামত। কিন্তু সুযোগ মত সে দুকথা শুনিয়ে দিতেও ছাড়েনি।

পতিমিলনে গমনকালে বাসকসজ্জিতা খুল্লনাকে লহনা যখন যুক্তিতর্ক দ্বারা নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছে তখনও সুরসিকা খুল্লনা তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছে। খুল্লনা স্বামী-সৌভাগ্যবতী। এই কারণেই সে লহনার ঈর্ষার পাত্রী। সময় সুযোগ বুঝে স্বামীকে তৃপ্ত করে খুল্লনা তাব কাছে লহনার অত্যাচারের কাহিনীটিও সবিস্তারে বর্ণনা করেছে। খুল্লনা সহনশীলা বা ক্ষমাশীলা নয়। সপত্নীর সঙ্গে বাদবিসম্বাদেও সে পিছপা নয়। লহনা খুল্লনা সম্পর্কে সখীকে বলছে, "দ্বন্দ্ব কোন্দলের বেলা দেয় বাঘের খোঁটা।" পুত্রহীনা লহনাকে বন্ধ্যা বলে নিষ্ঠুর গালাগালি দিতেও তার দ্বিধা হয়নি।

খুল্লনা চরিত্রে কিছু কিছু আলৌকিকতা আছে। তৎসত্ত্বেও চরিত্রটিতে বাস্তব মানবীয় সুখ দুঃখ ঈর্ষা অভিমান পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। লহনার প্রকৃত পরিচয়, সে প্রেমিকা—ধনপতির প্রেমময়ী পত্নী। পতিব বিরহে সে অস্থি-চর্মসার হয়েছে। শেষ দিকে সে শ্রীমন্ত-জননী—কৃষ্ণ-জননী—যশোদার সমতুল্যা। খুল্লনার চরিত্রটিতে নারী চরিত্রের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

দুর্বলা ঃ

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র দুর্বলা দাসী। দুর্বলা দাসীর চরিত্র রামায়ণের মন্থরাব চরিত্রের আদর্শে পরিকল্পিত কিন্তু মন্থরার সঙ্গে তার পার্থক্য প্রচুব। নিজের এবং মনিবানী কৈকেয়ীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পাকা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যেই মন্থবা সপত্নী কলহের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু দুর্বলা ভিন্ন প্রকৃতির। লহনার প্রতি তার সহানুভূতি কিছুটা থাকলেও দুই সতীনের ঝগড়া বাধিয়ে মজা দেখার উদ্দেশ্যেই সে লহনাকে উত্তেজিত করেছে। দুই সতীনের ভাব,—এটা তার ভাল লাগে না। দুই সতীনে চুলোচুলি না হলে যেন ঠিক মানায় না।

দু সতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া দুর্বলা।
হৃদয়ে হইল তার কালকূট জ্বালা॥

লহনা খুল্লনা যদি থাকে একস্থানে।
গাত্রদাহ হয় তার, সুখ নাহি মনে ॥
যেই ঘরে দু সতীনে না হয় কোন্দল।
সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল ॥
একের করিতে নিন্দা যাব অন্যস্থান।
সে ধনী বাসিবে ভাল প্রাণের সমান ॥

মুকুন্দরামের লোকচরিত্রজ্ঞান আমাদের বিস্ময় উদ্রিক্ত করে। দুর্বলা যেন নারদ ঠাকুরের ভূমিকা নিয়েছে। সে নিছক কোন্দল বাধাবার উদ্দেশ্যেই লহনাকে খুল্লনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। কোন পক্ষের প্রতি বড় রকমের পক্ষপাতমূলক মনোভাব না থাকলেও লাহনার প্রতি একটু স্নেহ ও সহানুভূতির ভাব ছিল তার মধ্যে। স্বার্থবুদ্ধি যে তার ছিল না তা নয়,—তবে তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। দুই সতীনের কোন্দলের সুযোগে তার দর বাড়বে—এই তার অভিপ্রায়—এর মধ্যে কিঞ্চিৎ আর্থিক লাভের সম্ভাবনাও ত থাকতে পারে। মানবজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোভঙ্গীর রূপায়ণে মুকুন্দরাম সার্থক রূপকার।

দুর্বলা লহনাকে যুক্তি দিয়েছে যে বিদেশ প্রত্যাগত ধনপতি রূপযৌবনবতী তরুণী ভার্যা খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হবে, ফলে লহনা হবে উপেক্ষিতা।

ঋজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কালসাপ ॥
নানা উপহার দিয়া পুষিছ সতিনী।
আপনার কর্মনাশ করিছ আপনি ॥
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে ওই তোমা বধিবে পরাণে ॥
রূপ দেখি খুল্লনার সাধু হবে ভোর।
চাবে না তোমায় ফিরি, সার আঁখি লোর ॥

পুরুষ চরিত্র তথা ধনপতির চরিত্র সম্পর্কে দুর্বলার অভিজ্ঞতা আছে। অতঃপর

লহনার শুভ কামনায় দুর্বলা লহনার সখী লীলাবতীর কাছে স্বামী বশী-করণের ঔষধ সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছে। আবার ঔষধ সংগ্রহের ছলে দুর্বলাই ইছানি (উজানী) নগরে গিয়ে খুল্লনার পিতামাতার কাছে খুল্লনার দুর্দশার কাহিনী বিবৃত করেছে। খুল্লনার মা ও ভাই দুর্বলাকে ধনরত্ন দিয়ে কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেছে।

দুর্বলার হাতে দিয়ে করি আরোপন।
বিদায় দিলেন তারে দিয়া নানা ধন ॥

কিন্তু দুর্বলা খুল্লনার কাছে নির্জলা মিথ্যা বলেছে এবং ধনরত্নের প্রায় সবটাই আত্মসাৎ করেছে। সুচতুরা দুর্বলা খুল্লনাকে বলেছে ঃ

একত্র আছিল বসি পিতা আর মাতা।
কহিনু সবার স্থানে তব দুঃখ কথা ॥
শুনি ভাল মন্দ না বলিল লক্ষপতি।
মৌনেতে রহিল তব মাতা রম্ভাবতী ॥
দেখিলুঁ তোমার পিতা বড়ই কৃপণ।
দিলেন তোমার তরে কড়ি চারি পণ ॥

ধনপতি দুর্বলাকে পাঠালে হাটবাজার করতে জ্ঞাতিকুটুম্ব ভোজনের উদ্দেশ্যে। দুর্বলাকে হাটের হাটুরেরা চেনে। তারা আগে ভাগেই ভাল জিনিষ লুকিয়ে ফেলে।

দুর্বলা হাটেতে যায়, দুবারে লোক চায়
ঐ আসে সাধু ঘরের ধাই।
বুঝিয়া এমত কাজ যার আছে ভয় লাজ
ভাল বস্তু রাখিল লুকাই ॥

দুর্বলা হাট করে এনে ধনপতিকে যে হিসাব দিয়েছে তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সে প্রথমেই ভূমিকা করে নিয়েছে ঃ

হাটের কড়ির লেখা একে একে দিব বাপা,
চোর নহে দুর্বলার প্রাণ।
লেখাপড়া নাহি জানি, কহিব হৃদয়ে গুণি
একদণ্ড কর অবধান ॥

দুর্বলা টাকাপয়সার যে হিসাব দিয়েছে তা নিছক কাল্পনিক। দুর্বলা লোভী। সে বাজারের পয়সা থেকে যে মোটা রকম চুরি করেছে, তা শুধু কাব্যের পাঠক কেন, ধনপতিও বুঝতে পেরেছে।

প্রাণভয়ে জয়া কয়, সাধু বলে নাহি ভয়,
দুর্বলা করিল প্রাণপণে ॥

সপত্নীকোন্দল বাধানোর মধ্যেও দুর্বলার এই লোভটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল। কবিকঙ্কন দুর্বলা চরিত্রের মনোভাব ব্যক্ত করতে কোথাও কিছু বাকি রাখেননি। লোভ শুধু ধনে নয়, দুর্বলার লোভ অন্যত্রও সঞ্চারিত হয়েছে। ধনপতির জন্য শয্যা রচনা করে দুগ্ধফেননিভ সুগন্ধি শয্যায় একটু গড়িয়ে না নিয়ে পারেনি দুর্বলা :

শয্যা বিছায় দাসী ধরিতে পারে না হাসি
বার চারি গড়াগড়ি খায় ॥

এক হিসাবে দুর্বলা মন্থরার চেয়েও চতুরা। সে গোপনে লহনাকে যে পরামর্শ ই দিক বাইরে সে খুল্লনার সঙ্গে কোন বিবাদ করেনি। দুজনেরই মন যুগিয়ে চলেছে। শয্যা রচনার পর ধনপতির মন বুঝে সে খুল্লনাকে মনোরম সাজে সাজিয়ে দিয়েছে। দুর্বলা চরিত্র ভাঁড়ুদত্তের সমধর্মী হলেও দুর্বলা ভাঁড়ুর মত শঠ এবং কৃতঘ্ন নয়। যৌথ পরিবারের দাসীর ভূমিকাটি সে নিখুঁত ভাবে অভিনয় করেছে। মুকুন্দরাম নিতান্ত অপ্রধান চরিত্র দুর্বলার চরিত্রটিকেও স্বল্প পরিসরে অবিস্মরণীয় করে তুলেছেন।

পুরুষ ও নারী চরিত্র :

মুকুন্দরামের কাব্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীচরিত্রগুলি উজ্জ্বলতর। ভদ্র চরিত্র

অপেক্ষা নিম্নজাতীয় স্ত্রী-পুরুষ শঠ ইত্যাদি চরিত্র বর্ণনায় মুকুন্দরামের কুশলতা অধিকতর। ধনপতি ও শ্রীমন্ত চরিত্র দুটিতে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি। ধনপতি চরিত্রে নাগরিক বিলাস ও চতুরতা প্রথমাংশে প্রকাশ পেলেও অবশিষ্টাংশে আর কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। শ্রীমন্ত গতানুগতিক বিশিষ্টতা বর্জিত। কালকেতুর চরিত্র প্রথমাংশে সুচিত্রিত। তার সরল ব্যাধ প্রকৃতির অপরূপ আলেখ্য নির্মিত হয়েছে। কিন্তু রাজা কালকেতুর সদাশয়তা ও উদারতা ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অবশ্য ধান্যঘরে আত্মগোপনের মধ্যে কালকেতুর পূর্বজীবনের আভাস আছে। অপরপক্ষে বণিক মুরারীশীল ও ভাঁড়ুদত্ত সুচিত্রিত। কিন্তু নারী চরিত্রগুলি প্রায় সবই সু-অংকিত হয়েছে। ফুল্লরা লহনা খুল্লনা দুর্বলা দাসী ফুল্লরার সখী বিমলা ও লহনার সখী লীলাবতী—কেউই অস্পষ্ট নয়—কেউই গতানুগতিক নয়। খুল্লনার জননী রম্ভাবতী চিরন্তনী বাঙ্গালী জননী। প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বাতন্ত্র্য নিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এই চরিত্রগুলির অন্তঃকরণের সুগভীর তলদেশ পর্যন্ত কবি দক্ষতার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করেছেন। দু'একটি ভদ্র চরিত্র ছাড়া বাকী চরিত্রগুলি সবই কবির সহানুভূতির জীয়নকাঠির স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মুকুন্দরামের কাব্যে উপাখ্যানদ্বয়ের পৃথক বৈশিষ্ট্য ঃ

কালকেতুর উপাখ্যান ও ধনপতির উপাখ্যান,—এই দুটি কাহিনী রচনাতেই মুকুন্দরামের দক্ষতার পরিচয় আছে ঠিকই, তথাপি উপাখ্যান দুটি রচনায় কবির দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। কালকেতুর উপাখ্যান রচনাকালে কবির বাস্তব দৃষ্টি যতখানি প্রখর, ধনপতির উপাখ্যানে ঠিক ততটা নয়। আদিম শবর জাতির জীবনের রূপায়ণে যে সহৃদয়তা এবং নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় আছে, অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ধনপতি ও শ্রীমন্তের' কাহিনীতে সেই সহৃদয় পর্যবেক্ষণ শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র ইতর শঠ চরিত্র

অংকনে কবিকঙ্কনের যতটা সহানুভূতি—যতটা বাস্তব দৃষ্টি—ভদ্র চরিত্রে ততটা নেই। কালকেতুর উপাখ্যানে কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারী ও তৎপত্নী এমনকি ফুল্লরা সখী বিমলা প্রত্যেকটি ছোটবড় চরিত্র কবির সহানুভূতিতে এমনই উজ্জ্বল যে মনে হয় প্রত্যেকটি চরিত্র যেন জীবন রসে ঝলমল করছে—প্রত্যেকটি চরিত্র স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকের মনের মণিকোঠায় স্থান পায়। কবির নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা কালকেতুর উপাখ্যানের চরিত্রগুলিকে এমন প্রাণবন্ত ও সরস করে তুলেছে। অপরপক্ষে ধনপতির উপাখ্যানের চরিত্রগুলি যেন কিছুটা নিষ্প্রাণ। অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ধনপতি ও শ্রীমন্ত চরিত্র দুটিতে তেমন একটা বিশিষ্টতা চোখে পড়ে না। বিলাসী নায়কের উপযুক্ত চতুরতা ছাড়া ধনপতির চরিত্রে আর কোন বিশিষ্টতা পাওয়া যায় না। একমাত্র বঞ্চিতা লহনাই কবির সহানুভূতি লাভ করেছে এবং প্রাণরসে টলমল করছে। দুর্বলা দাসীর চরিত্র কতকটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং জীবন্ত, কিন্তু ভাঁড়ুদত্তের মত এমন খলতার মূর্তিমান বিগ্রহ নয়। কালকেতুর সঙ্গে ধনপতির এবং ফুল্লরার সঙ্গে খুল্লনার তুলনা করলেই দুইটি কাহিনীর মধ্যে চরিত্রসৃষ্টির পার্থক্য সুস্পষ্ট হবে। খুল্লনা চরিত্রে কিছুটা বিশিষ্টতা থাকলেও তা ফুল্লরার তুলনায় নিষ্প্রভ। মুকুন্দরাম নিজে ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান; তার উপরে তাঁর আত্মবিবরণী বলে যে, মামুদ সরিফের অত্যাচারে গৃহত্যাগ করে তিনি অসীম দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন। তাই দরিদ্র, লাঞ্ছিত, বঞ্চিতের প্রতি তাঁর অসীম দরদ আর সহানুভূতি। ধনপতির উপাখ্যানে লহনা ছাড়া বঞ্চিত দুঃখী চরিত্র আর নেই। ধনপতি লক্ষপতি ত সম্ভ্রান্ত ধনবান্। রাজা কালকেতু অপেক্ষা দরিদ্র কালকেতুই কবির অধিকতর সহানুভূতির পাত্র। মুকুন্দরামের আত্মবিবরণীতে—শবর জাতির জীবনধারা বর্ণনায়,—শঠ ও ধূর্ত চরিত্র-চিত্রণে, পশুদের দুঃখের বিবরণে, সর্বোপরি কালকেতুর নগর পত্তন ও প্রজা স্থাপনে মুকুন্দরাম সেকালের বাঙ্গালী সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে বাস্তব রসোজ্জ্বল। কালকেতু যখন কলিঙ্গ দেশাগত বুলান মণ্ডলকে নিজ রাজ্য

গুজরাটে বসবাস করার আবেদন জানাচ্ছে, তখন কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-জনিত সহানুভূতির রসে উজ্জ্বল সেকালের সমাজচিত্রই দেখতে পাই।

শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর, সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব কনক কুণ্ডল॥
আমার নগরে বৈস যত ভূমি চাহ চষ,
তিন সন বাহি দাও কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা না করো কাহার শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোরধর॥

কবি যে সমাজ প্রত্যক্ষ করেছেন, এ তার ঠিক বিপরীত। সর্ববিধ অবিচার ও শোষণ মুক্ত সমাজ। এমনি বাস্তবরসোজ্জ্বল সমাজচিত্রণ ধনপতির উপাখ্যানে পাই না। এই উপাখ্যানের চরিত্রগুলি যেমন সম্ভ্রান্ত ধনবান সমাজের, তেমনি এখানে দেশের সাধারণ সমাজ-জীবন অপেক্ষা রাজসভার চিত্রই প্রধান হয়ে উঠেছে। ধনিক পরিবারের জীবনযাত্রায় কবির আন্তরিক সহানুভূতি ততটা প্রখর না হওয়ায় এই সমাজের চিত্রও তেমন অপূর্বত্বলাভ করেনি। গৌড় রাজের সভা ও সিংহলরাজ শালিবাহনের সভা এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই অংশে প্রাধান্য লাভ করেছে। ধনপতির গতানুগতিক কাহিনীতে সর্বসাধারণের জীবন-চিত্রণের সুযোগও তেমন ছিল না। তবে বিত্তবান সম্ভ্রান্ত চরিত্রের প্রয়োজনও ছিল। ধনপতির উপাখ্যানে ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত পরিবার ও রাজারাজড়ার ব্যাপার কালকেতুর উপাখ্যানের সাধারণ জনসমাজের বৈপরীত্য সূচিত করেছে এবং বাঙ্গালার সমাজের এক অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ চিত্রকে সার্থক করে তুলেছে। ধনী সম্ভ্রান্ত সমাজ বাদ দিলে কেবল কালকেতুর উপাখ্যান সমাজের একপেশে চিত্র মাত্র বিবৃত করতো। গতানুগতিক আখ্যায়িকাতে ও সপত্নী-কলহ—দাসী-চাকরের ঈর্ষা,—জ্ঞাতিকুটুম্বের মধ্যে ঈর্ষা ও হীনতা,—বিবাহের বিচিত্র শাস্ত্রীয় ও মেয়েলী ক্রিয়াকাণ্ড—পাঠশালা,—গুরুমশায়ের হীনতা,—বণিকের বাণিজ্য

প্রভৃতি সমকালীন সমাজের বাস্তব বিবরণ বর্ণনা করে এবং লহনা, খুল্লনা, দুর্বলা, ধনপতি, গুরুমশায় প্রভৃতি বাস্তবদৃষ্টি দ্বারা বিশ্লেষিত এবং সুচিত্রিত চরিত্রগুলি মুকুন্দরামের প্রখর বাস্তবতাবোধ এবং জীবনচিত্রণে দক্ষতা সুপ্রমাণিত করে, তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বে নিঃসংশয়িত প্রত্যয় জন্মায়। ধনপতির উপাখ্যানের কাহিনীও শিথিলবদ্ধ। কাহিনী ও সমাজ-চিত্রণে যেটুকু ঘাটতি হয়েছে, কবি কয়েকটি চরিত্রকে নিপুণভাবে সৃষ্টি করে সেটুকু পূর্ণ করেছেন। তবে একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর উপাখ্যান অপেক্ষা ধনপতির উপাখ্যান কথঞ্চিৎ নিষ্প্রভ। কবির ব্যক্তিজীবন এবং গতানুগতিক আখ্যায়িকাই এজন্য দায়ী।

মুকুন্দরামের দুঃখবাদ ঃ

মুকুন্দরাম দুঃখের কথায় যত বড়, সুখের কথায় তত বড় নন। তাঁর কাব্যে দুঃখ দারিদ্র্য ব্যথা বেদনার চিত্রের ছড়াছড়ি। কবির আত্মবিবরণীতেই এই দুঃখের গভীরতর প্রকাশ। অত্যাচারী শাসকের ভয়ে কবি সাতপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়েছেন, পথে অসহ দুঃখ ভোগ করেছেন,—দস্যু তস্করে শেষ সম্বলটুকুও লুঠ করেছে। কবির জীবনের এই দুঃখ দারিদ্র্য তাঁর কাব্যের সর্বত্র ছায়া ফেলেছে।

কালকেতুর বিপুল বিক্রমে পশুকুল সন্ত্রস্ত হয়ে পশুরাজের কাছে যে নালিশ জানিয়েছে, তাতে সেই যুগের সেই অত্যাচারী শাসকের নির্মম অত্যাচারে প্রজা-পুঞ্জের দুর্গতিই বর্ণিত হয়েছে।

আর্তনাদে কান্দে গজ নিবেদয়ে দুঃখ।
তোমা সেবি দশন বর্জিত হৈল মুখ॥
মহিষ আইল মুণ্ডে গলয়ে রুধির।
কহিল এতেক দুঃখ দিল মহাবীর॥

আন্দাস করয়ে আসি চমরীর ঘটা।
দেখ পশুরাজ সবাকার লেজ কাটা॥
গণ্ডক বলেন আমি বড় দুঃখ পাই।
খড়্গের জ্বালায় মোর মৈল সাত ভাই॥

*　　　*　　　*

রাণ্ডী হইয়া হরিণী কান্দযে উভরায।
পতিসুতহীন পাপ প্রাণ নাহি যায়॥

পশুরাজ সিংহ দেবী অভয়াকে স্মরণ করে কেঁদে কেঁদে দুঃখ নিবেদন করেছে।

কান্দে সিংহ আদি পশু স্মঙরি অভয়া।
অপরাধ বিনা মাতঃ দূর কৈলা দয়া॥
ভালে টীকা দিয়া মাতা কৈলা পশুরাজ।
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ॥
সুখে রাজ্য করিতে আখেটি হৈল কাল।
কেন হেন দিলা মাতা বিষম জঞ্জাল॥
প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক।
উদরে জ্বালা তাহে সোদরের শোক॥

হরপার্বতীর সংসারযাত্রা ও কোন্দলেও এই দুঃখ এবং দারিদ্র্য। শিব যখন বহুবিধ ব্যঞ্জন রাঁধতে আদেশ দিলেন পার্বতীকে পার্বতী তখন বলছেন:

রন্ধন করিতে ভাল বলিলে গোঁসাই।
প্রথমে যা পাত্রে দিব তাই ঘরে নাই॥
কালিকার ভিক্ষা নাথ উধার শুধিলুঁ।
অবশেষে যাহা ছিল রন্ধন করিলুঁ॥

পার্বতী বিলাপ করছেন শিবের সঙ্গে কলহ করে:

কি কহিব আরে সখি মনোদুঃখ-কথা।
মিছাই করিয়া মোরে সৃজিল বিধাতা॥

দারুণ কর্মের দোষে রহিলুঁ দুখিনী।
ভিক্ষার ধনে দারুণ বিধি করিল গৃহিণী ॥

দরিদ্র কালকেতুর পত্নী ফুল্লরা চণ্ডীর কাছে বার মাসের দুঃখ কথা শুনিয়েছে,—আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের দূরদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছে। তার দারিদ্র্যের চরম অবস্থাটির চিত্র ফুটে তখনই যখন ফুল্লরা জানায় যে সে এক সের চালের পরিবর্তে শেষ সম্বল মাটির পাথরখানি বাঁধা দিয়েছে এবং দেবীকে দেখায় মেঝেতে আমানি খাবার গর্ত। "আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান"। কালকেতু পশু-শিকারে ব্যর্থ হয়ে গোধিকা নিয়ে ঘরে ফিরলে দরিদ্র ব্যাধ-পত্নী শিবগৃহিণী পার্বতীর মতই দুঃখ করেছে।

কপালে আঘাত হানি কান্দে ব্যাধ নিতম্বিনী
নিশ্বাসে মলিন মুখচান্দে।
দারুণ দৈবের গতি, কপালে দরিদ্র পতি
পড়িলুঁ সম্বল-চিন্তা ফাঁদে ॥

পতিসৌভাগ্যে বঞ্চিতা লহনার যেমন মনোবেদনা, সপত্নী নির্যাতিতা খুল্লনার বেদনাও তদপেক্ষা কম নয়। সিংহলরাজ-কারাগারে ধনপতিকে বিনা দোষে নির্যাতিত হতে হয়েছে,—শ্রীমন্তও বিনা অপরাধে গুরু মহাশয় কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছে,—বিনা অপরাধে শ্রীমন্ত বধ্যভূমিতে নীত হয়েছে,—কালকেতুকেও শঠের শঠতায় কলিঙ্গরাজের কারাগারে অবরুদ্ধ থাকতে হয়েছে। সুতরাং মুকুন্দরামের কাব্যে যে দুঃখের ছড়াছড়ি—একথা বলা অযৌক্তিক নয়। অনেকে তাই মুকুন্দরামকে দুঃখবাদী কবি বলে থাকেন। কিন্তু মুকুন্দরাম দুঃখবাদী কবি নন। দুঃখকেই জীবনের একমাত্র প্রাপ্য বলে তিনি স্বীকার করেননি। বরঞ্চ দুঃখের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃত সুখের আস্বাদ পায়, দেবী মহামায়া অভয়ার কৃপা লাভ করলে সর্ব দুঃখের অবসান হয়,—এ তত্ত্ব তাঁর কাব্যে সর্বত্র ছড়ানো আছে। কবি নিজেও দুঃখ থেকে উত্তরিত হয়েছিলেন বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় পেয়ে। পশুকুল দেবীর কৃপায় বিপন্মুক্ত হয়েছে,—কালকেতু-ফুল্লরার দুঃখ ঘুচেছে,—খুল্লনা-লহনারও

বিবাদ মিটেছে,—কালকেতু-ধনপতি-শ্রীমন্তের দেবীর কৃপায় বন্দীত্ব মোচন ঘটেছে,—তারা ধন-সম্পদ-রাজ্য-রাজকন্যা লাভ করেছে। দুঃখ যেখানে সুখ-লাভের সোপানমাত্র, সেখানে দুঃখকেই জীবনের একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না। আবার গভীর পর্যালোচনায় দেখা যাবে যে সব দুঃখের বর্ণনাগুলি প্রকৃত দুঃখের চিত্র নয়। হরপার্বতীর দারিদ্র্য ও তজ্জাত দুঃখ বেদনা দেবতার লীলা মাত্র। যে দেবী কালকেতুর দারিদ্র্য অনায়াসে দূর করেছেন বিপুল ধন-সম্পদ দিয়ে তিনি নিজের দারিদ্র্য দূর করতে পারেন না,—একথা বিশ্বাস্য নয়। ফুল্লরার বার মাসের দুঃখের কাহিনী নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জিত। যে সুন্দরী রমণীর প্রতি স্বামী আসক্ত বলে ফুল্লরা মনে করেছে,—যাকে স্বামী নিজগুণে বেঁধে এনেছে,—সেই রূপযৌবনসম্পন্না নারীকে বিতাড়িত করতে গিয়ে পুরাণ কথা এবং সতীধর্ম ব্যাখ্যান যখন ব্যর্থ হয়েছে তখন শেষ চেষ্টা হিসাবে নিজের দারিদ্র্যের কথা অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করাই স্বাভাবিক। কালকেতুর ভোজনের যে বিবরণ কবি দিয়েছেন, তাতে কালকেতু ও ফুল্লরাকে বারমাসই অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হতো—এ কথা যথার্থ বলে মেনে নেওয়া যায় না। মুকুন্দরামকে তাই দুঃখবাদী বলা সঙ্গত নয়। দুঃখদৈন্যের মধ্যে থেকেও নির্বিকার হয়ে দুঃখময় জীবনের রস উপভোগই মুকুন্দরামের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। বোধহয় বাঙ্গালী জীবনেরই বৈশিষ্ট্য এই। এই বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন জীবনরসিক কবি তাঁর কালের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনীই বিবৃত করেছেন। তাই একটা জীবন্ত সমাজচিত্র, গার্হস্থ্য জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ পাওয়া যাচ্ছে মুকুন্দরামের কাব্যে। এই যুগের দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট অত্যাচারিত মানুষ তাই বারংবার কামনা করেছে দেবী অভয়ার করুণা, এবং বিশ্বাস করেছে, দেবীর কৃপায় তারা খুঁজে পাবে দুঃখোত্তরণের পন্থা। নিজের জীবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতাই কবির কাব্যে রূপায়িত হয়েছে দুঃখোত্তরণের পন্থারূপেই। এক বলিষ্ঠ জীবনবোধই মুকুন্দরামের কাব্যে ভাষারূপ লাভ করেছে,—দুঃখ নৈরাশ্য নয়।

মুকুন্দরামের কাব্যে হাস্যরস ঃ

। মুকুন্দরামের কাব্যে গভীর জীবনবোধ এবং বাস্তবতা-প্রিয়তা গম্ভীর বর্ণনার মধ্য দিয়ে পরিবেষিত না হয়ে মাঝে মাঝে কৌতুকের আলোকে রসোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গভীর জীবনবোধ ব্যতীত প্রকৃত হাস্যরসের অবতারণা সম্ভব নয়। যে লেখক নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, তিনিই জীবনের যাবতীয় অসঙ্গতিগুলিকে নির্বিকার চিত্তে তুলে ধরতে পারেন। জীবনের অসঙ্গতি থেকেই হাস্যরসের উদ্ভব। মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রথাবদ্ধ রীতিতে কাহিনী পরিবেষণের ফলে হাস্যরসের অবতারণার সুযোগ নিতান্তই স্বল্প। সে যুগের কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিরসাত্মক বর্ণনা দ্বারা হাস্যরসের অভাবকে পূর্ণ করেছেন। ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতা যে উচ্চাঙ্গের হাস্যরসের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না এ বোধ একান্তই আধুনিক কালের। হাস্যরসিক এক নৈর্ব্যক্তিক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখে থাকেন এবং জীবনের অসঙ্গতিগুলিকে সুগভীর সহানুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ করে তোলেন। হাস্যরস তাই কারুণ্যের অতি নিকট আত্মীয়।

জীবনরসিক মুকুন্দরাম সমকালীন জীবনে ও সমাজে যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন সেগুলি নির্লিপ্ত দর্শকের মতই প্রত্যক্ষ করেছেন এবং কাব্যে তুলে ধরেছেন একান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে। জীবনের কঠোর দুঃখ দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতাকে তিক্ত মর্মজ্বালা সহকারে প্রকাশ না করে স্নিগ্ধ কৌতুক রসোজ্জ্বল করে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বত্র। আদিরসাত্মক বর্ণনা মুকুন্দরামের কাব্যে নেই তা নয়,—তবে তা গতানুগতিক রীতিরক্ষা মাত্র। ভাঁড়ামি ও অশ্লীল বর্ণনা দ্বারা তিনি পাঠকের মনে সুড়সুড়ি দিয়ে না হাসিয়ে স্নিগ্ধোজ্জ্বল কৌতুকের বর্ণচ্ছটা সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্যে মুকুন্দরাম এই জন্য এক অনন্য সাধারণ মহিমায় সমাসীন।

মানসিংহের সুবেদারীর আমলে প্রজার পাপের ফলে ডিহিদার মামুদ

সরিফের শাসন প্রবর্তিত হল। প্রজার-সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হঠাৎ তিরোহিত হয়ে গেল। এই দুর্দিনে মানুষ সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে পালিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। কবি যেন কৌতুক ভরে প্রত্যক্ষ করেছেন প্রজার এই দুর্গতি। কোন ক্ষোভ কোন আক্রোশ প্রকাশ না করে ঈষৎ কৌতুকের সুরে কবি নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা নিয়ে ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন।

উজির হলো রায়জাদা বেপারিবে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পনের কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥
সরকার হৈলা কাল খিলভূমি লিখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥

যেন এক আশ্চর্য দিনের আবির্ভাব হয়েছে—উজির রায়জাদা হয়েছে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের শত্রুতা করছে,—জমি মাপা হচ্ছে দড়ি দিয়ে—কুড়ি কাঠার বদলে পনের কাঠায় বিঘে ধরা হচ্ছে, সরকার বিনা উপকারে ধুতি ঘুষ খাচ্ছে, মহাজন সাড়ে তের আনায় টাকা ধরছে,—দিনে এক পাই সুদ নিচ্ছে। এমনি কত কৌতুককর বিবরণ মুকুন্দরাম দিয়েছেন তাঁর আত্মবিবরণীতে।

হরগৌরীর বিবাহকালে বর দেখে মেনকার খেদ—হরগৌরীর সংসারযাত্রা, কোন্দল প্রভৃতি বর্ণনাতেও কবি প্রচুর কৌতুকরস পরিবেষণ করেছেন। বর দেখে গৌরী-জননী মেনকা বলছেন ঃ

চরণে নূপুর সর্প সর্প কটিবন্ধ
পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম দেখি লাগে ধন্ধ ॥
অঙ্গদ বলয়ে সাপ সাপের পইতা।
চক্ষু খেয়ে হেন বরে দিলাম দুহিতা।

গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছোঁ॥
ওষধি সহিত ঘৃত দিলাম কপালে।
ঘৃতযোগে ললাটে লোচন বহ্নি জ্বলে॥

বরবেশী শিবকে দেখে পুরনারীগণের পতিনিন্দা সংস্কৃত পুরাণে এবং মঙ্গলকাব্যে একটা সাধারণ বর্ণিতব্য বিষয়। মুকুন্দরামের কাব্যে এই গতানুগতিক বর্ণনা কৌতুক রসে উচ্ছলিত হয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। গোদা, কুঁজা, খোঁড়া, কানা, কালা প্রভৃতি বিচিত্র গুণবন্ত স্বামীর পত্নীরা যে ভাবে আক্ষেপ করেছে, তাতে কারুণ্য অপেক্ষা কৌতুকরসই উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে।

এক নারী বলে সই গোদা মোর পতি।
কোঁয়া জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি॥
ভাদ্রপদ মাসে পায়ে পাঁকুই দুর্বার।
গোদে তৈল দিতে মোর উঠয়ে নেকার॥
ফুলে যদি গোদ কেয়ো জ্বর করে বল।
কত বা বাঁটিব আর ওকড়ার ফল॥

কুঁজোর পত্নীর দুঃখ নিম্নরূপ ঃ

আর নারী বলে সখী পতি মোর কুঁজা।
কুঁজ ভাল হইলে পূজিব দশভুজা॥
চিত হয়ে শুতে নারে মরি মরি করে।
আড়াই হাত খাদ করে মেঝের ভিতরে॥

কালকেতুর হাতে লাঞ্ছিত পশুকুলের রোদন, পশুরাজের কাছে নালিশ ও চণ্ডীর কাছে অনুযোগ বর্ণনায় সমকালীন সমাজের চিত্র কৌতুকরসের সঙ্গে পরিবেষিত হয়েছে। ভালুক আক্ষেপ করে চণ্ডীকে জানাচ্ছে ঃ

উইচারা খাই পশু জাতিতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক॥

সাতপুত্র মারে বীর বান্ধি জাল পাশে।
সবংশে মজিনু মাতা তোমার আশ্বাসে॥
প্রতিদিন মহাভয় বীরের তরাসে।
পত্নী মৈল পুত্র মৈল দুটি নাতি শোষে॥
কান্দয়ে ভালুক শিরে করি করাঘাতি।
জরাকালে হৈল মোর অশেষ দুর্গতি॥

হনুমান জানাচ্ছে তার মনের ব্যথা ঃ

হু হু হুক্ করি কান্দে বানর মর্কট।
জীবনে নাহিক কার্য বীর সনে হট॥
বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রাম সেনাপতি।
সাগর লঙ্ঘিয়া হৈল সে গণে পদাতি॥
কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে।
সাতপুত্র ধরি বীর বান্ধে ফাঁদ জালে॥

এই বর্ণনাগুলি যেমন সমকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে করুণ ও বাস্তবানুগ তেমনি পশুকুলের মুখে কৌতুকাবহ। আবার কালকেতুর 'বিট্‌কাল' ভোজনের বর্ণনাতেও কবি পাঠককুলকে হাসিয়েছেন। চণ্ডীর নিকট বারমাসের দুঃখ-কাহিনী বর্ণনা করে চণ্ডীকে বিতাড়িত করার জন্য ফুল্লরার মর্মান্তিক প্রয়াস কৌতুকরস উৎসারিত করেছে। মুরারী শীল, ভাঁড়ুদত্ত, দুর্বলা দাসী প্রভৃতি খল চরিত্র বর্ণনাতেও কবি যেমন গভীর জীবনবোধের পরিচয় রেখেছেন, তেমনি প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। কালকেতুর কাছে ভাঁড়ুদত্তের আবির্ভাবটিই পাঠকের মনকে হাস্যরসে উতরোল করে তোলে।

ভেট লয়ে কাঁচাকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগু ভাঁড়ুদত্তের পয়াণ।
ফোঁটাকাটা মহাদম্ভ ছিঁড়া ধুঁতি কোঁচা লম্ব,
শ্রবণে কলম খরশান॥

প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥

কালকেতুর নিকট থেকে বিতাড়িত ভাঁড়ু যখন চলেছিল কলিঙ্গরাজের কাছে তখনকার ভাঁড়ুর বর্ণনা আরও মনোরম।

রাজভেট নিল কাঁচকলা পুঁইশাক॥
চুপড়ি ভরিয়া নিল কদলীর মোচা।
মাগের বসন পরে দোলে লম্বা কোঁচা॥
পাগখানি বান্ধে ভাঁড়ু নাহি ঢাকে কেশ।
কেশরের তিলকে রঞ্জিত কৈল বেশ॥
কৈফিয়তী পাঁজিখান নিল সাবধানে।
শ্রীহরি স্মরিয়া ভাঁড়ু কলম গোঁজে কানে॥

ভাঁড়ুর ভাইএর পায়ে গোদ,—পঁচিশ বছরেও তার বিয়ে হয়নি,—তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হলে বিয়ের লোভ দেখাতে হয়। লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ কবি ভাঁড়ুকে দিয়ে তাই করিয়েছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে হাস্যকৌতুকের স্নিগ্ধজ্যোতিচ্ছটা চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

ভাঁড়ুর কনিষ্ঠ ভাই তার নাম শিবা।
পঁচিশ বছরে তার নাহি হয় বিভা॥
ছোটভাই শান্তবাক্যে নিবারিল ক্রোধ।
বিয়া নাহি হয় তার দুই পদে গোদ॥
বলে ভাঁড়ু দত্ত ভাই দৃঢ় কর হিয়া।
এবার মণ্ডলী পাইলে দিব তোর বিয়া॥

খুল্লনা-লহনার সপত্নী-কোন্দলেও কবি প্রচুর হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। লহনার

প্রতি ধনপতির সান্ত্বনাবাক্য কৌতুকে সমুজ্জ্বল। বিভিন্ন জাতির বর্ণনাতেও কৌতুকরস বর্তমান। গুজরাট নগরে আগত ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে কবি বলছেন,

চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে
চাউলের বোঁচকা বান্ধে টান।

কবিকঙ্কনের বাস্তবানুগ জীবনবোধ জীবনের বিচিত্র অসঙ্গতিগুলিকে উদ্ঘাটিত করে হাস্যরসের বর্ণচ্ছটায় চরিত্রগুলিকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। মুকুন্দরামের হাস্যরসে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ খোঁচা বা তীব্র জ্বালা নেই। মুকুন্দরামের হাস্যরস স্নিগ্ধ কৌতুকরস—humour-এর সগোত্র—কবির গভীর সহানুভূতিতে এই হাস্যরস অশ্রুতে ভেজা। মুকুন্দরাম তাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাব্যকার।

দ্বিজ মাধব ঃ

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি দ্বিজ মাধব বা মাধবানন্দ। কেউ কেউ কবিকে মাধবাচার্যও বলে থাকেন।

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথি ও ব্রতকথা ধরনের ছোট ছোট পালাগান চট্টগ্রাম অঞ্চলে ও উত্তরবঙ্গে সুপরিচিত। চট্টগ্রাম অঞ্চলেই দ্বিজ মাধবের কাব্যের সকল পুঁথি পাওয়া গেছে এবং এই অঞ্চলেই দ্বিজ মাধবের জনপ্রিয়তা। অপরপক্ষে মুকুন্দরামের কাব্যের পুঁথি পশ্চিম বঙ্গেই পাওয়া গেছে এবং কবির জনপ্রিয়তাও পশ্চিম বঙ্গে। পশ্চিম বঙ্গে দ্বিজ মাধবের কাব্যের একখানি পুঁথিও পাওয়া যায়নি। এ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে দ্বিজ মাধব পূর্ব বঙ্গের, সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে যে আত্ম-পরিচয় আছে, তাতে পঞ্চগৌড়, সপ্তদ্বীপ ও ত্রিবেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

কবির বাসভূমি

সেই পঞ্চ গৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥

অনেকে তাই মনে করেন যে কবি ত্রিবেণীর নিকটবর্তী সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। আবার কোন কোন পুঁথিতে নদীয়া বা নবদ্বীপের নাম পাওয়া যায়। সুতরাং কবির আদি নিবাস নবদ্বীপ অথবা সপ্তগ্রাম—এ সন্দেহ থেকেই যায়। অনেকে মনে করেন যে কবি নবদ্বীপ বা সপ্তগ্রাম থেকে উঠে গিয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে নির্ভুল কোন তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিজ মাধবের আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় যে তিনি পরাশরের পুত্র ছিলেন।

পরাশর সুত হয়, মাধব তার নাম।
কলিযুগে ব্যাসতুল্য গুণে অনুপাম ॥

কবি পরিচয়

পরাশর ব্যক্তিনাম অথবা গোত্রনাম,—এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ডঃ সুকুমার সেন। আত্মবিবরণীতে মাধব আচার্য নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু অন্যত্র 'আচার্য' উপাধি পাওয়া যায় না। কাব্যের মধ্যে সর্বত্রই তিনি দ্বিজ মাধব বা মাধবানন্দ। ডঃ সেনের মতে কবির উপাধি আচার্য ছিল না।

দ্বিজ মাধব ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, জ্যোতিষ প্রভৃতিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। মুকুন্দরামের কাব্যের মত পৌরাণিক কাহিনীর ঘনঘটা না থাকলেও মাধব প্রয়োজন মত পুরাণকথাগুলি কাজে লাগিয়েছেন। কবির বৈষ্ণব-সাহিত্যপ্রীতি ছিল। তাঁর কাব্যের বিষ্ণুপদগুলি উৎকৃষ্ট পদাবলীর পর্যায়ে পড়ে।

দ্বিজ মাধবের প্রায় সকল পুঁথিতে কালজ্ঞাপক পয়ারটি নিম্নরূপ ঃ

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত ॥
দ্বিজ মাধব গায়ে সারদা চরিত ॥

সুতরাং ১৫০১ শকাব্দে বা ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজ মাধবের সারদাচরিত রচিত হয়।

সময়

আত্মবিবরণীর অপর একস্থানে মুঘল সম্রাট আকবরের নাম আছে ঃ

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার॥

ডঃ সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে এই কালজ্ঞাপক পয়ারটিতে যথেষ্ট গোলমাল আছে। তিনি 'ধাতা শক'এর স্থানে 'ধাতা মুখ' (অর্থাৎ ৪) অথবা 'দাতা শক' (অর্থাৎ ২) ধরে এবং শককে সাল অর্থে গ্রহণ করে ১০৫৪, ১০৫১, অথবা ১০৫২ সাল অর্থাৎ ১৬৪৭, ১৬৪৪ অথবা ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দ দ্বিজ মাধবের কাব্য রচনার কাল বলে গ্রহণ করেছেন। এই সময়ে আকবর বাদশাহকে পাওয়া যায় না।

অপর পক্ষে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ দ্বিজ মাধবের কাব্য রচনার কাল বলে গ্রহণ করলেও আকবরকে নিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় প্রকৃত মুঘল অভিযান শুরু হয়েছিল। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতে এবং বঙ্গদেশে আকবর নূতন রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করলেও এই সময়ে পূর্ববঙ্গে বার ভুঁইয়াদের রাজত্ব ছিল। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার হয়ে বারভুঁইয়াদের দমন করতে চেষ্টা করেন। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের শাসনকালে বাঙ্গালার ভুঁইয়াগণ দুর্বল হওয়ায় বাঙ্গালা-দেশে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে যদি কবি চট্টগ্রামে বসে কাব্য রচনা করে থাকেন, তবে এই সময়ে পূর্ববঙ্গে আকবরের আধিপত্য ছিল না। পশ্চিমবঙ্গেও মুঘল শাসনের প্রভাব তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। কবি যদি সপ্তগ্রাম বা নবদ্বীপে কাব্য রচনা করে থাকেন তা হলেও আকবরের উল্লেখ হয়ত অসম্ভব নয়। কিন্তু কবি আকবরকে রামরাজা ও অর্জুন অবতার বলেছেন। সুতরাং আকবরের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ার পরেই এরূপ উক্তি সম্ভব। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, আকবরের নামোল্লেখের জন্যই ১৫০১ শকাব্দ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। আকবরের পুত্র-পৌত্রের আমলেও আকবরের রাজত্বের সুখশান্তি উল্লেখ করা অসম্ভব নয়।

পণ্ডিতদের মতে দ্বিজ মাধব নবদ্বীপ বা সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, পরে তিনি চট্টগ্রামে বসবাস করেন। হয়ত বা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্যই তিনি দেশত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু সপ্তগ্রাম বা নবদ্বীপে কাব্য রচনা করলে পশ্চিমবঙ্গে একখানি পুঁথিও না পাওয়া বিস্ময়কর বোধ হয়। মনে হয় কবির আত্মবিবরণীতে কোথাও গোলমাল আছে। নবদ্বীপ নিবাসী কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধবাচার্যের আত্মবিবরণীর সঙ্গে দ্বিজ মাধবের আত্মবিবরণীর মিল আছে। মাধবাচার্যের আত্মবিবরণীর প্রভাবে দ্বিজ মাধবের কাব্যে আত্ম-বিবরণীটি প্রক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

দ্বিজ মাধব ও মাধবাচার্য :

শ্রীমদ্‌ভাগবতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য রচয়িতা দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য নামক এক কবি বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে এবং বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্যে তিনি নিজেকে পরাশরের পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছেন :

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥

এই কবি নবদ্বীপে বাস করতেন। তিনি লিখেছেন :

সুরধুনী তীরে বিশেষ নবদ্বীপ।
যথা চৈতন্য চন্দ্র অদ্বৈত সমীপ ॥

ভণিতা থেকে মনে হয় কবি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধবের বংশধরগণ বর্তমানে মৈমনসিংহ জেলার সদর মহকুমার গোঁসাই চান্দুরা গ্রামে এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমার গোসাইগঞ্জ গ্রামে অদ্যাপি বসবাস করছেন। ডঃ ভট্টাচার্য আরও জানিয়েছেন যে মাধবের বংশধরদের বাড়ীতে রক্ষিত 'মাধব বংশতত্ত্ব' নামক কুল পঞ্জিকানুসারে পরাশরের পুত্র মাধব গঙ্গাতীর থেকে এসে পূর্ববঙ্গে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই চণ্ডীমঙ্গলের কবি ও কৃষ্ণমঙ্গলের কবিকে

ভিন্ন ব্যক্তি বলে স্বীকার করেছেন। মনে হয়, এক দ্বিজ মাধবের আত্মবিবরণী অপর দ্বিজ মাধবের কাব্যে গায়ন প্রভৃতির দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "নবদ্বীপবাসী মাধব আচার্য ষোড়শ শতাব্দে কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারই আত্মপরিচয় অংশ মাধবের কাব্যে ঢুকিয়া পড়া বিচিত্র নয়।" কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে কৃষ্ণমঙ্গলের কবির বংশধারা পূর্ববঙ্গে এখনও বর্তমান এবং উপরোক্ত কুলপঞ্জিকা মতে ইনি গঙ্গাতীর থেকে পূর্ববঙ্গবাসী হয়েছিলেন। অথচ দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পুঁথি সবই পূর্ববঙ্গে পাওয়া গেছে—পশ্চিম বঙ্গে পাওয়া যায় নি। পূর্ববঙ্গের এবং উত্তর বঙ্গের চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতারা দ্বিজ মাধবের কাব্যরীতি অনুসরণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে দ্বিজ মাধবের কাব্যের কোন প্রভাব নেই। সুতরাং কোন্ দ্বিজ মাধব পূর্ববঙ্গবাসী হয়েছিলেন—সে সম্পর্কে সংশয় মেটে না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চৈতন্যপ্রভাব স্বল্প নয়। বিষ্ণুপদগুলি যদি মাধবের নিজের রচনা হয়, তবে কবি বৈষ্ণব ছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। দুই কবিই প্রায় সমকালীন। দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীভূষণ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে মাধবের কাব্যে পশ্চিম বঙ্গের ভাষারই প্রভাব বেশী। পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রভাব অত্যন্ত গৌণ। পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থানের নামোল্লেখও আছে মাধবের চণ্ডীমঙ্গলে। কৃষ্ণমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কবি একই ব্যক্তি কিনা—এ বিষয়টি অনুসন্ধান ও গবেষণার বিষয়। আবার গঙ্গামঙ্গল কাব্য রচয়িতা দ্বিজমাধব এই দুই কবি থেকে ভিন্ন অথবা এই দুই মাধবের কোন একজনের সঙ্গে অভিন্ন,—কিম্বা তিনটি কাব্যের রচয়িতা একই ব্যক্তি,—এ বিষয়েও নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। অনেকে মনে করেন যে কৃষ্ণমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল রচয়িতা একই ব্যক্তি।

দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যের নামকরণ করেছেন সারদাচরিত বা সারদামঙ্গল।

'দ্বিজ মাধব গায় সারদা চরিত।'

'দ্বিজ মাধবে গায় সারদা মঙ্গল।'

দ্বিজ মাধবের কাব্যের সম্পাদক (ক. বি.) শ্রীযুক্ত সুধীভূষণ ভট্টাচার্য কাব্যটির নাম দিয়েছেন 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'। চট্টগ্রাম অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের কাব্যকে জাগরণ বলা হয়।

কাব্যের নামকরণ

দ্বিজ মাধবের কাব্যকাহিনীর বৈশিষ্ট্য ঃ

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলে কিছু কিছু কাহিনী-গত স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। দ্বিজ মাধব দেবদেবীর বর্ণনা, আত্মবিবরণী ও ধর্মঠাকুরের সৃষ্টিপ্রকরণের অনুরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ বর্ণনার পরেই কাব্য শুরু করেছেন। কবি পুরাণাশ্রিত হরগৌরীর উপাখ্যান সম্পূর্ণই বাদ দিয়েছেন। কাব্যারম্ভে কবি দেবী কর্তৃক শিববরে বলীয়ান মঙ্গলদৈত্য বধের কাহিনী বিবৃত করেছেন।

শিবের বরে মঙ্গলদৈত্য হোল সর্ব জীবের অজেয়—লাভ করলো ইন্দ্রপদ। শিবের নিকটে উৎপীড়িত দেবগণ বিলাপ করতে থাকায় শিবের নির্দেশে দেবগণ চণ্ডীর শরণাপন্ন হলেন। দেবতাদের স্তবে তুষ্টা চণ্ডীদেবী রণসাজে সজ্জিতা হয়ে ঘোরতর যুদ্ধে মঙ্গলদৈত্যকে বধ করে মঙ্গলচণ্ডী নামে খ্যাতা হলেন। কাহিনীটি ব্রতকথা জাতীয়। মঙ্গলদৈত্য বধের পরে দেবী স্বর্গে পূজিতা হলেন। দেবীর কৃপায় ঋষি গৌতমের শাপে অভিশপ্ত দেবরাজ ইন্দ্রের দেহ থেকে ভগরূপ ব্যাধি দূর হোল, ইন্দ্র হলেন সহস্রাক্ষ। ইন্দ্র দেবীর পূজা করলেন এবং দেবীকে পঞ্চসখী দান করলেন। পঞ্চ সখীর সঙ্গে পরামর্শ করে দেবী মর্তে পূজা প্রচারে মনোনিবেশ করলেন। দেবীর আদেশে বিশ্বকর্মা কলিঙ্গ দেশে কংসনদীর তীরে দেবীর দেউল নির্মাণ করলেন। দেবী কলিঙ্গরাজকে দেউল মধ্যে চণ্ডিকা পূজার স্বপ্নাদেশ দিলে কলিঙ্গরাজ সাড়ম্বরে দেবীর পূজা করে সুখ সমৃদ্ধি লাভ করলেন।

অতঃপর নীলাম্বরের শাপ বৃত্তান্ত। এখানেও সামান্য বৈশিষ্ট্য আছে। লোমশমুনির কাছে নীলাম্বর জানতে পারে যে ত্রিভুবনে একমাত্র অমর দেব মহাদেব। শিবের সাক্ষাতে শিবের স্তব করে শিবকে তুষ্ট করে নীলাম্বর। শিব

তাকে ফুল তোলার ভার দেন। নীলাম্বর ফুল তুলতে গিয়ে ব্যাধের মৃগয়া দেখতে দেখতে বিলম্ব করে ফেলে। রুষ্ট হয়ে মহাদেব নীলাম্বরের বিলম্বের কারণ জানতে চাইলে নীলাম্বর সত্য গোপন করে। শিব ধ্যানযোগে সকল ঘটনা জেনে নীলাম্বরকে ব্যাধের ঘরে জন্মাবার অভিশাপ দিলেন। নীলাম্বর ও তার পত্নী অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করে কালকেতু ও ফুল্লরা রূপে মর্তে জন্মগ্রহণ করে। এখানে পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে নীলাম্বরকে শাপ দেওয়ার মধ্যে দেবীর কোন কৌশল নেই। দেবী পশুকুলের পূজা পাননি। তবে কালকেতুর বিক্রম সহ্য করতে না পেরে তারা দেবীর কাছে নালিশ জানিয়েছে। এর পরের কাহিনী গতানুগতিক। মুকুন্দরামের কাহিনী থেকে অল্পস্বল্প পার্থক্য দেখা যায়। কালকেতু কর্তৃক সোমদত্ত বণিকের নিকট আংটী বিক্রী—কালকেতুর প্রজাপত্তন প্রভৃতি অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। কালকেতুর পিতা ধর্মকেতু সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয় ও মাতা নিদয়া সহমরণে যায়। ফুল্লরা সখীর বাড়ী গিয়েছিল বঁটি ধার করতে গোধিকা কাটার জন্য।

কলিঙ্গ রাজ্যে বন্যার বিবরণ দ্বিজ মাধবের কাব্যে নেই। প্রজারা দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কলিঙ্গ ছেড়ে গুজরাটে বাস করতে এসেছে। ভাঁড়ুদত্তের কাহিনীটি এখানে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যশেষে শাপমুক্ত নীলাম্বর তন্ত্র-সম্মত মহাজ্ঞান শিবের কাছ থেকে লাভ করেছে।

দ্বিজ মাধবের কাব্যে ধনপতির উপাখ্যান হরগৌরীর পাশাখেলা দিয়ে শুরু হয়েছে। পাশা খেলায় ইন্দ্রপুত্র মণিকর্ণকে মধ্যস্থ করা হয়েছিল। শিব গৌরীর সঙ্গে চাতুরী করছিলেন। মণিকর্ণ শিবের ইঙ্গিতে জানাল যে কোন পক্ষেরই জয়পরাজয় হয়নি। এতে দেবী ক্রুদ্ধা হয়ে মণিকর্ণকে মর্তে ধনপতি হয়ে জন্মাতে অভিশাপ দিলেন। মিত্রভাবে জন্মালে মণিকর্ণ পৃথিবীতে তিন জন্ম গ্রহণ করবে, আর শত্রুভাবে এক জন্মেই মুক্তি পাবে। মণিকর্ণ পত্নী চন্দ্ররেখার সঙ্গে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ধনপতি ও

লহনা রূপে জন্ম পরিগ্রহ করে। নৃত্যকালে তালভঙ্গ হওয়ার অপরাধে রূপবতী অপ্সরা মর্তে খুল্লনা রূপে জন্মগ্রহণ করে। কাহিনীর অবশিষ্টাংশ গতানুগতিক। সামান্য একটু আধটু বৈচিত্র্য আছে। যেমন, ধনপতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে গৌড় থেকে ফিরে এসে সুসজ্জিতা খুল্লনাকে দেখে পরস্ত্রী মনে করে তিরস্কার করে, অবশেষে লহনা খুল্লনার পরিচয় দিলে তবে চিনতে পারে। দ্বিজ মাধবের কাব্যে কাহিনী ভাগ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

দ্বিজ মাধবের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব ঃ

দ্বিজ মাধব বৈষ্ণব অথবা শাক্ত ছিলেন, বলা সহজ নয় তবে তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব ভাব প্রচুর আছে। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে উপাদান গ্রহণ করে কাব্যের পটভূমি নির্মাণ করেছেন। মাধবের চণ্ডীমঙ্গলে বৈষ্ণব প্রভাব খুবই গভীর। কবি যেখানেই রাধাকৃষ্ণলীলার সঙ্গে অথবা চৈতন্যলীলার সঙ্গে কাব্যবর্ণিত বিষয়ের দূরতম সাদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ করেছেন, সেখানেই বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে ছোট ছোট পদ রচনা করেছেন। এইগুলিকে কবি বিষ্ণুপদ আখ্যা দিয়েছেন। মাধবের কাব্যে কুড়িটি বিষ্ণুপদ আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা—কৃষ্ণ যশোদার বাৎসল্যলীলা—নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে বিষ্ণুপদগুলি রচিত। এই বিষ্ণুপদগুলি বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক অবস্থা বিবৃত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীমন্ত গুরুমহাশয়ের নিকটে তিরস্কৃত হয়ে ক্ষোভে দুঃখে রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করলে শ্রীমন্তকে খুল্লনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই সময়ে খুল্লনার মানসিক অবস্থা বিবৃত করতে মাধব একটি বিষ্ণুপদের সহায়তা গ্রহণ করেছেন :

তোমরা নি মোর যাদব দেখিয়াছ।
চান্দ মুখের বাণী বাঁশীতে খুঁজিয়াছ ॥

* * *

অরুণ উদয় কালে গোধেনু লইয়া চলে
নবনী খুঁজিল মায়ের আগে।
মুই অভাগিনী শুনি উত্তর না দিলুম পুনি
কোন্ দিকে গেলা যাদু রাগে॥

দেবীর মর্তলীলা বর্ণনার প্রাক্কালে কবি দেবীকে আসরে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। এই সময়ে দেবীর রূপ বর্ণনা প্রসংগে কবি শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করেছেন।

আজু এমন বেশে কথায় সাজনী।
ঐরূপ দেখিলে প্রাণ না ধরে কামিনী॥
চিকন কালিয়া যায়ে নানা আভরণ গায়ে
তাহে শোভে মুকুতার ঝুরি।
পিন্ধন পাটের ধরা গলে শোভে বরমালা
নীলমেঘে করিছে বিছুরি॥

গৌড় প্রত্যাগত ধনপতি সুসজ্জিতা খুল্লনাকে চিনতে না পেরে পরস্ত্রী ভেবে তিরস্কার করে ও পরে লহনার কথায় পত্নীকে চিনতে পেরে খুল্লনাকে রন্ধন করতে নির্দেশ দেয়। স্বামীকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানোর সময়ে খুল্লনার মনের আকাঙ্ক্ষা কবি প্রকাশ করেছেন শ্রীরাধার গভীর প্রেমার্তি দিয়ে।

বন্ধু কানাই পরান ধন মোর।
যুগে যুগে না ছাড়িমু চরণখানি তোর॥
জাতি দিলুঁ যৌবন দিলুঁ আর দিমু কি।
আর আছে শুধু প্রাণ তারে বোল দি॥
আজি মোর আয়ত যাপন
কি করিব অনঙ্গ অবিসর পঞ্চবাণ॥

এই বিষ্ণুপদগুলি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব কবি রচিত পদাবলীর সমতুল্য। মাঝে মাঝে কতকগুলি ধুয়া গান আছে। সেগুলিও বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে রচিত।

বিষ্ণুপদ ও ধুয়াগানগুলি গীতিরস উচ্ছ্বসিত করে তোলায় দ্বিজ মাধবের কাব্যে বাস্তব রস জমাট বাঁধার অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু এই পদগুলি শাক্ত-কাব্যে একটি বৈষ্ণবীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করে কবির বৈষ্ণবীয় মনোভাবটি প্রকট করে তুলেছে।

কাব্যবিচার ঃ

দ্বিজ মাধবের সারদাচরিত বা সারদামঙ্গল কতকটা ব্রতকথা ধাঁচের রচনা। রচনার পারিপাট্য বা বর্ণনা কুশলতা না থাকলেও বাস্তবতা বোধ এবং চরিত্র সৃষ্টিতে স্বাভাবিকতা ও সঙ্গতিবিধানই দ্বিজ মাধবের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। দ্বিজ মাধবের কাব্যের কাহিনীতেও বেশ সামঞ্জস্য আছে। কবি গল্পের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ করেননি। কাহিনীর সঙ্গতি বজায় রেখেই তিনি লৌকিক এবং অলৌকিক চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। সর্বপ্রকার আতিশয্য-বর্জিত কাহিনীতে পালাবিন্যাস, চরিত্র ও ঘটনার সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা দ্বিজ মাধবের কাব্যে অপূর্বত্ব সূচিত হয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চরিত্র সৃষ্টির এমন মৌলিক প্রয়াস পূর্বে আর খুব বেশী কবি দেখাইতে পারেন নাই।" মানবচরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান ছিল মাধবের। চরিত্র অংকনে তিনি মানব চরিত্র সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কবির ভাষায় পাণ্ডিত্য নেই,—অলংকার বাহুল্যও নেই। অনাড়ম্বর ভাষায় বর্ণিত কাহিনী চরিত্র এবং চিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মুকুন্দরামের পূর্বে আবির্ভূত হয়ে মাধব বর্ণনায় এবং চরিত্রে যে স্বাভাবিকতা দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। সব থেকে উজ্জ্বল এবং স্বাভাবিক হয়েছে ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রটি। ভাঁড়ুর শঠতা ও স্বার্থপরতা কবি উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করেছেন। কালকেতুর চরিত্রেও কবি সঙ্গতিবিধান করেছেন। কালকেতু ভীরু নয়। কলিঙ্গ-রাজের সঙ্গে জয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন কালে অস্ত্রহীন অবস্থায় সে বন্দী হয়েছে।

লহনা-খুল্লনার বিবাদ বর্ণনাতেও কবি সে যুগের বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের নিপুণ চিত্র অংকিত করেছেন। তবে ভাঁড়ু দত্ত ভিন্ন অন্যান্য চরিত্র চিত্রণে কবি খুব বেশী দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। বিশেষতঃ খুল্লনা-লহনার চরিত্রে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "মাধুর লহনা ও খুল্লনা ততদূর পরিষ্কার নহে—উহারা মুকুন্দের লহনা ও খুল্লনার রেখাপাত মাত্র।" মাধবের কাব্যকাহিনীর পরিসর অত্যন্ত স্বল্প। সাধাসিধা কাহিনী বর্ণনা ছাড়া কাহিনী রচনায় তেমন কোন শিল্প কুশলতার ছাপ নেই। কাহিনীতে নাটকীয় গুণ এবং উপন্যাস রসও কবি পরিবেষণ করতে পারেননি। তবে মাঝে মাঝে কৌতুকরস পরিবেষণে কবি সার্থক হয়েছেন। লহনা-খুল্লনার বিবাদ মিটে যাবার পরে দুই সতীনে একে অপরকে মাছের মুড়ো খাওয়াবার ব্যস্ততার সুযোগে মাছের মুড়োর বিড়াল-কবলিত হওয়ায় কথা কবি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন :

খুল্লনায়ে বোলে দিদি মুড়া খাও তুহ্মি।
তবে এক লক্ষ ধন পাই আজু আহ্মি॥
মুড়া লইয়া পেলাপেলি কেহ নাই খায়ে।
উভার উপরে থাকে বিড়াল আড় চোখে চাহে॥
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে॥
মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ী পিছে॥

বিষ্ণুপদগুলি মাধবের কাব্যে আখ্যানবস্তুর জমাট ঘনত্ব সৃষ্টির পক্ষে বাধার সৃষ্টি করেছে। তথাপি গীতিরস হিসাবে এগুলির স্বতন্ত্র মূল্য আছে। দ্বিজ মাধবের কাব্যে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। নীলাম্বর মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে শিবের কাছে গিয়েছিলেন। শিব ফুল তুলতে পাঠালে বিলম্ব হওয়ার জন্য নীলাম্বর অভিশপ্ত হন। অভিশাপ মোচনের পরে নীলাম্বর স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করলে শিব মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান দান করেছিলেন। এই তত্ত্বজ্ঞানের যে বিবরণ মাধব দিয়েছিলেন, তাতে তান্ত্রিক সাধনার তত্ত্বই ব্যক্ত হয়েছে।

হৃদি পদ্মে বসি হংসে করে নানা কেলি
কর্মযোগে জানি করে পিণ্ডের বলাবলী ॥

*   *   *

সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীরেতে বৈসে
ইঙ্গলা পিঙ্গলা তার বৈসে দুই পাশে ॥

*   *   *

শিরে সহস্রদল পদ্ম কহি তার তত্ত্ব।
অধোমুখে থাকি কমল বরিষে অমৃত ॥
নহি টলিবেক পথ সুস্থির পরাণ।
মেরুদণ্ডে ভর করি করিবেক ধ্যান ॥

এই তান্ত্রিক পটভূমিকায় বৈষ্ণবতাকে গ্রহণ করেও কবি যে কাহিনীতে সঙ্গতি এবং চরিত্রগুলিতে স্বাভাবিকতা রক্ষা করতে পেয়েছেন এতেই কবির কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিজ মাধবের কাব্যের চরিত্র ঃ

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলে চরিত্র সৃষ্টিতে কোন অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ না পেলেও চরিত্রগুলিতে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে। দ্বিজ মাধবের কাব্যেই সর্বপ্রথম সচেতন সহানুভূতি প্রবণ কবি হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। বালক কালকেতুর বর্ণনা প্রসঙ্গে মাধব বলেছেন ঃ

কালকেতু

বাড়ে হে বীরবর,   যেন মত্ত করিবর
গজশুণ্ড জিনি দুই কর।
আখেটির সুত সব   তারা সব পরাভব
খেলায় জিনিতে নাহি পারে ॥

বীর কালকেতুর চরিত্রটি কবি শেষ পর্যন্ত বীররূপেই চিত্রিত করেছেন। ফুল্লরা যখন কালকেতুর কাছে সুন্দরী নারীর ছদ্মবেশধারিণী চণ্ডিকাকে ঘরে আনার সংবাদ দেয় তখন কালকেতু স্বভাব বশেই ফুল্লরার নাককান কেটে দেবার ভয় দেখায়।

মহাবীরে বোলে যদি নার দেখাইবাবে।
নাকে চুলে দিমু শাস্তি কহিনু তোমারে॥

ভাঁড়ূদত্ত রাজসভায় কালকেতুকে শাসালে কালকেতু তাকে উত্তম মধ্যম দেবার আদেশ দিয়েছে।

মহাবীরে বলে মোর ধারে আছ কে।
নির্জাস করিয়া ভাঁড়ুর গালে চোয়াড় দে॥

শবর বীর কালকেতুর পক্ষে এই আদেশ দেওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছে। কালকেতু কলিঙ্গ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে অসীম বীরত্ব দেখিয়েছে ঃ

যুঝয়ে বীরবর করে পাইয়া গণ্ডা শর
কটকে মারয়ে আশে পাশে॥
যেই দিগে দেহি হানা লক্ষ লক্ষ পড়ে সেনা
তুলা ভস্ম পাবক পরশে॥

রণে জয়ী কালকেতু যখন নিরস্ত্র অবস্থায় বাড়ী ফিরছিল সেই সময়ে কলিঙ্গ-রাজের সৈন্যদল তাকে বেষ্টন করে বন্দী করে।

গণ্ডীশর এড়ি বীর যায়ে শূন্য হাতে।
হেনকালে রাজসৈন্য আবরিল পথে॥
পন্থ বান্ধি সেনাগণ করে নানা সন্ধি।
শূন্য হাতে কালকেতু হইয়া গেল বন্দী॥

দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কলিঙ্গরাজ যখন কালকেতুকে মুক্তি দিলেন তখন মহাবীর কালকেতুকে রাজসভায় আনা হোল। কিন্তু কালকেতু রাজার কাছে মাথা নত করেনি।

নৃপ সভা দেখি বীরে প্রণাম নাহি করে।
রাজা বলে ব্যাধ বেটা মদগর্ব ধরে॥

রাজা যখন কালকেতুর সামনে মত্ত হস্তী ফেলে দিয়েছেন, তখন কালকেতু মত্ত হস্তীকে দুই চির করে ফেলেছে।

কুঞ্জর দেখিয়া প্রণাম কৈল মহাবীর।
উভে সমানে কুঞ্জর হইল দুই চির॥

কালকেতু চরিত্রে কবি পূর্বাপর সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

ভাঁড়ু দত্তঃ

দ্বিজ মাধব ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রটি সবিস্তারে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাব্যে এই চরিত্রটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "এই চরিত্র বর্ণনায় কবি কঙ্কন হইতে মাধবাচার্য বেশী ক্ষমতা দেখাইয়াছেন।" মুকুন্দরামের থেকে মাধবের ভাঁড়ু দত্ত উজ্জ্বলতর কিনা—এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু ভাঁড়ু দত্ত চরিত্র চিত্রণে মাধবও যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে সংশয় নেই।

ভাঁড়ু দত্ত অত্যন্ত দরিদ্র—তার ঘরে একটি মুষ্টিও চাউল নেই। উপবাসে দিন কাটে। ক্ষুধার তাড়নায় ভাঁড়ু দত্ত পত্নীর কাছে অন্ন চাইলে পত্নী জানায় যে ঘরে চাল নেই।

ভাঁড়ু দত্ত বলে শুন তপন দত্তের মা।
ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্ব গা॥
কালুকার অন্ন যদি এক মুষ্টি পাস।
বেলান্ত নিশ্চিন্ত হইয়া দেয়ানেতে যাস॥

ভাড়ুর পত্নী তখন ভাঁড়ুকে বলেঃ

যেমত কথা কহ তুহ্মি লোকে বলে আউল।
কালু কৈলা উপবাস আজু কথা চাউল॥

ভাঁড়ু তখন বাজারে গেল চাল সংগ্রহ করতে ভাঙ্গা কড়ি নিয়ে।

ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বান্ধিয়া।
ছাওয়ালের মাথায় বোঝা দিলেক তুলিয়া ॥
কড়ি বুড়ি নাই ভাঁড়ু বাক্যমাত্র সার।
ত্বরায় পাইল গিয়া নগর বাজার ॥

ভাড়ুদত্তের বাজার করার যে বিবরণ কবি দিয়েছেন, তাতে তাঁর চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। ভাঁড়ু গেল ধনার কাছে চাল কিনতে। ধনা তাকে চাল দেবে না। কারণ ভাঁড়ু চাল নেয়,—দাম দেয় না।

ভাঁড়ুদত্ত বোলে ধনা চাউল দেয় মোরে।
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে ॥
ধনাঞি বোলে ভাঁড়ু চাউল নাই এথা।
বারে বারে খাও চাউল কহি মিথ্যা কথা ॥

ভাঁড়ু তখন উৎপীড়নের ভয় দেখায় ধনাকে। ধনা ভয় পেয়ে চাল দিয়ে দেয় ভাঁড়ুকে। সে বলে ঃ

পরিহাস কৈলাম তাই করি দরাদরি।
চাউল নিয়া খাও তুহ্মি কড়ি দিয় বাড়ি ॥

ভাঁড়ু তখন বিনামূল্যে যথেচ্ছ চাল সংগ্রহ করে।

এথেক শুনিয়া ভাঁড়ু বসিল চাপিয়া।
সের অষ্টদশ চাউল লইল মাপিয়া ॥

এই ভাবে লোককে ভয় দেখিয়ে মিথ্যা কথায় বশীভূত করে ভাঁড়ু আনাজ, তেল, লবন, পান, গুয়া, চিড়া, মিঠাই, সন্দেশ, মাছ প্রভৃতি সংগ্রহ করলো। গুবাক বিক্রেতা ধারে গুবাক দিতে অস্বীকার করায় ভাঁড়ু জানালো যে কালকেতুর রাজসভায় তার বিপুল সম্মান, কাল সকালে প্যাদা পাঠিয়ে জব্দ করবে সকলকে।

যথ কথা কহে বীর আহ্মা করি বড়া।
গাড়ু কম্বল দিল পাটের পাছোড়া ॥

কালুকা প্রভাতে পাইক পাঠাইমু থরে থরে।
তুলিয়া দিবেক টান গাছের উপরে॥

গোয়ালিনী বিনা কড়িতে দই দিতে অস্বীকার করলে ভাঁড়ু তাকে চুরিকরা গাইএর জন্য মামলার ভয় দেখাল।

চোরা গাই কিনিয়া বুড়া তোমার বসত
এহার বাদী হইয়াছে গ্রামের রায়ত॥

ভয় পেয়ে গোয়ালিনী ভাঁড়ুকে দই দিল। কিন্তু মেছোনী ভাঁড়ুকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে। সে মাছ ধরে টানাটানি শুরু করে। শেষ পর্যন্ত—

গালাগালি করিল বহুল হুড়াহুড়ি।
কচ্ছ হোতে ভাঁড়ুদত্তের পড়ে ভাঙ্গা কড়ি॥
ভাঙ্গা কড়ি পড়ে ভাঁড়ু বহু লজ্জা পায়ে।
মৎস্য এড়িয়া ভাঁড়ু উঠিয়া পলায়ে॥

কালকেতুর সভায় ভাঁড়ু জাঁকিয়ে বসেছে। কিন্তু রাজসভায় সমাদর পেল বুঢ়ন মণ্ডল। ঈর্ষাকাতর ভাঁড়ু তৎক্ষণাৎ কালকেতুর সমৃদ্ধিতে ঈর্ষা প্রকাশ করে তাকে ধ্বংস করবে বলে শাসায়।

দত্তকুল অল্প জাতি তোমার জ্ঞেয়ান।
ভাঁড়ু থাকিতে চন্দন পায় অন্যজন॥
যখনে আছিল ঘর নগর গোলাটে।
মাংসের পসরা লই ফুল্লরা যাইত হাটে॥
অখনে পরের ধনে হইছে ঠাকুরাল।
হেন জান সেই ধন তোমার হইছে কাল॥

কালকেতুর পাইকের হাতে মার খেয়ে ভাঁড়ু বাড়ী ফিরে এলে তার দুর্দশা দেখে দত্তগিন্নী কেঁদে উঠলো। তখন ভাঁড়ু নির্জলা মিথ্যা বলে ঘরণীকে প্রবোধ দিলে।

ভাঁড়ু দত্ত বোলে প্রিয়া শুনয়ে কর্কশা।
মহাবীরের সঙ্গে আজু খেলাইছি পাশা ॥
ক্রমে ক্রমে বীরে হারিছে দশ পাড়ি
রসের রসিক হই কৈলাম ধ্রাধ্রি ॥
ধ্রাধ্রি করিয়া পাইছি বড় রস।
মহাবীরের গায়ে দিছি এমন দ্বাদশ ॥

ভাঁড়ু কলিঙ্গরাজের কাছে নালিশ করতে চললো,—ভেট সংগ্রহ করলো চুরি করে।

দেয়ানেতে যায়ে ভাঁড়ু মনে নাহি হেলা।
চুরি করি লইলেক ফুল কাঁচাকলা ॥
ভেট সজ্জা লয়ে ভাঁড়ু কবি পরিপাটি।
বাড়ীর বাথুয়া শাক তুলি বান্ধিলেক আঁটি ॥
বীরের খাসি লইয়া ভাঁড়ু দেয়ানেতে যায়ে।

কালকেতু কলিঙ্গরাজের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ভাঁড়ুর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। অশ্বমূত্রে মাথা ভিজিয়ে পাঁচখানা ক্ষুর দিয়ে মাংসসুদ্ধ চুল উজান টানে চেঁছে নেওয়া হোল। নগরবাসী তার মাথায় লবনজল ঢেলে দিল।

উজানী ক্ষুরের টানে　　মাংস সহিতে আনে
মনে ভাবে কেন আইলু এথা।
মাথায়ে তিন চির ফাড়ে　　রুধির বহয়ে ধারে
ব্যাথায় ভাঁড়ু কান্দিয়া বিকল ॥
নগরুয়া ইতরগণে　　আসিয়াত জনে জনে
শিরে ঢালি দিল লোনা জল ॥

ভাঁড়ুর গলায় হাড়ের মালা, নাকে কানে লোহার শলা দিয়ে বাজনা বাজিয়ে গঙ্গা পার করে দেওয়া হোল। ছেলেরা গায়ে ধুলো মাখিয়ে দিলে। কিন্তু ভাঁড়ুর চরিত্রের কোন পরিবর্তন হোল না। ভাঁড়ু গঙ্গার ওপারে গিয়ে

ভাল করে মাথা মুড়িয়ে নিয়ে গঙ্গাসাগরে মাথা মুড়িয়েছি বলে ভিক্ষা করে যেতে লাগলো।

লোকের সাক্ষাতে ভাঁড়ু বোলে মিথ্যা কথা।
গঙ্গাসাগরে গিয়া মুড়াইয়াছি মাথা॥
এ বোলিয়া মাগি খায় নগর নগর।

এই চরিত্রটি চিত্রণে দ্বিজ মাধব দক্ষ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। এখানে মাধব মুকুন্দরাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হলেও নিতান্ত ন্যূন নন।

দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামঃ

দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম একই বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। উভয়েই প্রায় সমকালীন। মাধব সম্ভবতঃ কিছু পূর্ববর্তী। দ্বিজ মাধবের কাব্য পূর্ববঙ্গে এবং কবিকঙ্কনের কাব্য পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের আদর্শ স্থাপিত করেছে। একই কাহিনী হলেও দুই ধারায় অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। মঙ্গল-দৈত্য বধের উপাখ্যান দ্বিজ মাধবের কাব্যে আছে, মুকুন্দরামের কাব্যে তা নেই। হর-পার্বতীর পৌরাণিক এবং লৌকিক কাহিনী মুকুন্দরামের কাব্যে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মাধবের কাব্য থেকে সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। মুকুন্দরামের কাব্যে পুরাণ-কথার ছড়াছড়ি—মাধবের কাব্যে পুরাণ-কথা নগণ্য, —তন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। মুকুন্দরামের কাব্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব প্রবল নয়, —দেবদেবীর বন্দনা অংশে মুকুন্দরাম চৈতন্য বন্দনা করেছেন, আদ্যাদেবী বা চণ্ডীর চরিত্রেও বৈষ্ণব প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব প্রবল। ধুয়া ও বিষ্ণুপদগুলি পদাবলীর আদর্শে রচিত। এইগুলি শাক্ত কাব্যে বৈষ্ণবীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে এবং কাব্যটিকে গীতিপ্রবণ করে তুলেছে। মুকুন্দরামের কাব্যে কাহিনী পরিসর অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে কাঁহিনী সংক্ষিপ্ত,—কতকটা ব্রতকথা ধরনের। মাধবের বর্ণনাভঙ্গী সরল এবং কাহিনী গতিহীন নয়। মুকুন্দরামের কাব্য উচ্চতর

প্রতিভার সচেতন শিল্প সৃষ্টি—বিদগ্ধ মনের অভিপ্রকাশ। তাঁর রচনায় আছে বহু বৈচিত্র্য,—কাহিনীতে যেমন বৈচিত্র্য, তেমনি বৈচিত্র্য আছে চরিত্রসৃষ্টিতে। কাব্য কাহিনীতে অজস্র পুরাণ-কথা ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে। মুকুন্দরাম সংস্কৃত কাব্য-পুরাণাদিতে পণ্ডিত। কিন্তু পাণ্ডিত্য তাঁর কাব্যকে গুরুভার করেনি। পুরাণকথা বা তত্ত্বকথা স্থানে স্থানে কাহিনীকে আড়াল করে দাঁড়ালেও কাহিনীর গতি ব্যাহত হয়েছে বলে মনে হয় না। মুকুন্দরাম কুশলী কবি,—ভাষায় এবং ছন্দে পারিপাট্য আছে ; কবির অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্যও প্রশংসনীয়।

দ্বিজ মাধবের কাব্য বাস্তবতা গুণে সমৃদ্ধ। কাহিনীবর্ণনা ও চরিত্রসৃজনে তিনি সঙ্গতি রক্ষা করে চলেছেন। তাঁর কাব্যে কবির সচেতন সহানুভূতির স্পর্শ পাওয়া যায়। কালকেতুর চরিত্রে সর্বত্র বীরত্বব্যঞ্জক ভাবটি রক্ষা করে তিনি সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন, ফুল্লরাকে গড়েছেন অসংযতভাষিণী করে। ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রে তাঁর নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। মাধবের কাব্যে সমাজবোধেরও পরিচয় আছে। কিন্তু কাব্যের মণ্ডনকলায় কবিকঙ্কণের যে আশ্চর্য দক্ষতা,—দ্বিজ মাধবের তা ছিল না। বাস্তবতায় এবং সমাজবোধে মুকুন্দরাম মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। চরিত্রসৃজন দক্ষতায় তিনি তুলনা রহিত। তাঁর কাব্যে কালকেতু ধান্যঘরে আত্মগোপন করায় কালকেতুর মর্যাদা-হানি ঘটেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু এই ঘটনায় সরল ব্যাধ সন্তানের প্রকৃতিটি যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে—তাতে সন্দেহ নেই। মানবমনের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভাববৈচিত্র্য মুকুন্দরামের কাব্যে বিচিত্রভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে যে আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে, তার তুলনা কোথায়? কালকেতু, খুল্লনা, লহনা, ফুল্লরা, দুর্বলা, মুরারী ও তৎপত্নী, ভাঁড়ু দত্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলি বর্ণনা কালে কবি লোকচরিত্র জ্ঞানের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা অভূতপূর্ব এবং একান্ত দুর্লভ। কবির আত্মবিবরণীতে, হরগৌরীর সংসার যাত্রায়, পশুকুলের দুঃখ কাহিনীতে, ফুল্লরার বারমাসীতে, লহনা-খুল্লনার বিবাদে, কালকেতুর নগর পত্তনে মুকুন্দরাম যে সমাজবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা ঐতিহাসিকের

আদরের সামগ্রী। মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব চরিত্র চিত্রণে। প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল এবং জীবনরসে প্রাণোচ্ছল। কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই চরিত্রগুলির প্রতি কবিকে অসীম সহানুভূতিপরায়ণ করে তুলেছে। কবির নিজস্ব জীবন রসধারায় চরিত্রগুলি সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। মাধবের কাব্যে কবির ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়ে চরিত্রগুলিকে জীবনরসে পরিপূর্ণ করে তোলেনি। একমাত্র ভাড়ুদত্ত ছাড়া মাধবের কাব্যের অন্য কোন চরিত্র মুকুন্দরামের কাব্যের অনুরূপ চরিত্রের পাশে দাড়াতেই পারে না। চরিত্রগুলিতে কবিকঙ্কনের যে গভীর সহানুভূতি পড়েছে মাধবের কাব্যে তেমন গভীর সহানুভূতি সর্বত্র ছড়িয়ে নেই। মাধবের খুল্লনা ও লহনা নিষ্প্রভ। দুই কবির কাব্যেই বাস্তবতা গুণ আছে। কিন্তু বাস্তবতাবোধ মুকুন্দরামের কাব্যে যত প্রকট এবং যত ব্যাপক, মাধবের কাব্যে তেমন নয়। মুকুন্দরামের কাব্যে যেমন আছে নাট্যগুণ, তেমনি আছে উপন্যাসের উপযোগী নিখুঁত পর্যবেক্ষণ দক্ষতা এবং চরিত্র বিশ্লেষণ। নাটকীয়তা এবং উপন্যাসের রস মাধবের কাব্যে অনুপস্থিত। একমাত্র ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রে কিছুটা উপন্যাসের গুণ আছে। দ্বিজ মাধবের কাব্যে বস্তুসংগ্রহ 'বাস্তব রসে' পরিণত হয়নি। নিজস্ব বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা বজায় রেখে মুকুন্দরাম বাস্তবকে রূপায়িত করেছেন বলে তাঁকে রোমান্টিক বলা যায়। কিন্তু মাধবকে বাস্তববাদী কবি ছাড়া অন্য আখ্যা দেওয়া যায় না। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজ মাধবের বাস্তবতা সম্পর্কে লিখেছেন, "দ্বিজ মাধবের বাস্তবতার অঙ্কুর আছে, কিন্তু ইহা শাখাপল্লবে ফুলে ফলে ব্যাপ্ত হয় নাই। তিনি যেখানে বাস্তব তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন, সেখানেও স্বচ্ছন্দ গতি ও পরিপূর্ণ প্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই, তাঁহার বাস্তব বর্ণনার মধ্যে খানিকটা আড়ষ্টভাব রহিয়া গিয়াছে। বস্তুবিন্যাসকে চারু শিল্পে পরিণত করিতে হইলে প্রয়োজন ... পরিবেশ ও কবিচিত্তের সহজ উল্লাস। বর্ণনীয় বিষয় যে আত্ম-

প্রসারণের উপযোগী বিস্তার ভূমি পাইয়াছে ও লেখকের বর্ণনাভঙ্গী যে তাঁহার জীবন রসিকতার পরিচয় বহন করিতেছে, এই দুইটি শর্ত পূর্ণ না করিলে বাস্তব রসের কবি হওয়া যায় না। দ্বিজ মাধব তাঁহার পর্যাপ্ত বস্তুসঞ্চয়ের মধ্যে সহজ গতিচ্ছন্দ আনিতে পারেন নাই, বা তাহার বস্তুর প্রাচীর ভেদ করিয়া তাঁহার চিত্তের আনন্দ হিল্লোল আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।"

মাধবের কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিসর কাব্যরসের কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেও কবি বাঙ্গালী জীবনের বাস্তব পটভূমিকায় গার্হস্থ্য চিত্র অংকনে সমর্থ হয়েছেন। মুকুন্দরামের মত ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ নিবিড় সংযোগ না থাকলেও সহজাত সহানুভূতি এবং মানবচরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা মাধবের কাব্যকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "মুকুন্দ স্বভাবের নিজ ঘরের কবি, মাধু তদপেক্ষা অল্প কিন্তু তাঁহারও স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য স্থির।" ডঃ সেন মুকুন্দরাম ও দ্বিজ মাধবের কবিত্ব শক্তির তুলনামূলক আলোচনা করে আরও বলেছেন, "মাধবাচার্য ও মুকুন্দরামের ক্ষমতা এক দরের নহে,—মুকুন্দরামের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর কবির, মাধবাচার্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিগণের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য; কিন্তু উভয় কবির প্রতিভায় একটা এক পরিসরের লক্ষণ দৃষ্ট হয়—যেন প্রকৃতি সুন্দরী একই হস্তে দুইটি ফুল সৃষ্টি করিয়াছেন—দুটিতেই স্বভাবগত অনেক সাদৃশ্য, কিন্তু একটি অন্যটি হইতে অনেক বেশী উজ্জ্বল, সুগন্ধি ও সুন্দর, তাই পথিকের চক্ষু সেইটির প্রতি মুগ্ধ হইয়া অপরটিকে উপেক্ষা করে। কিন্তু যেখানে গোলাপ নাই, সেখানেই পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে মালতী ফুলটির রূপ উপভোগ করা সম্ভবপর।"

দ্বিজ রামদেব ঃ

ডঃ আশুতোষ দাস দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল কাব্যখানি আবিষ্কার করেন ও তাঁরই সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাব্যটি প্রকাশিত হয়।

কবি রামদেব সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক ছিলেন, কারণ তাঁর কাব্যের পুঁথি ত্রিপুরা নোয়াখালি চট্টগ্রাম অঞ্চলেই পাওয়া গেছে এবং তাঁর কাব্যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দ প্রচুর পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি দ্বিজ মাধবের কাব্যের প্রভাবও রামদেবের কাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। রামদেবের কাব্যে আত্মবিবরণী-মূলক অংশটি অনুপস্থিত। এইটুকু মাত্র জানা যায় যে কবির পিতার নাম কবিচন্দ্র। এক স্থলে ভণিতা আছে 'দ্বিজ গোবিন্দ স্থত'। ডঃ স্থকুমার সেন অনুমান করেন যে গোবিন্দ রামদেবের পিতা এবং কবিচন্দ্র তাঁর উপাধি হওয়াও অসম্ভব নয়।

কবি পরিচিতি

পুঁথির শেষে রচনা কাল সম্পর্কে লেখা আছে ঃ

ইন্দু বাণ ঋষি বাণ বেদসনজিত।
রচিলেক রামদেব সারদা চরিত॥

ডঃ আশুতোষ দাসের মতে (১৫৭৫ – ৪ =) ১৫৭১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে কাব্যটি রচিত হয়েছে। ডঃ স্থকুমার সেন 'বেদসনজিত' স্থানে 'বেদ সমজিত' ধরে (১৫৭৫ + ৪ =) ১৫৭৯ শকাব্দ বা ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ পেয়েছেন। তিনিই আবার 'বেদসনজিত' স্থানে 'বেদ সংজ্ঞিত' পাঠ ধরে ১৫৭৫ বা ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দ গ্রহণ করেছেন। মোটকথা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামদেবের কাব্য রচিত হয়েছিল।

রচনা কাল

কাব্য পরিচয় ঃ

দ্বিজ রামদেব তাঁর কাব্যকে 'সারদাচরিত' আখ্যা দিয়েছেন। ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদনাকালে কাব্যটির নাম দিয়েছেন 'অভয়ামঙ্গল'।

দ্বিজ রামদেব দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন এবং মাধব অনুস্থত পথেই পরিক্রমণ করেছেন। স্থতরাং রামদেবের কাহিনীতেও মাধবের অনুস্থতি পরিলক্ষিত হয়। মাধবের মত রামদেবও

মঙ্গলদৈত্য বধের কাহিনী দিয়ে কাব্য আরম্ভ করেছেন। তাঁর কাব্যের তিনটি অংশ। প্রথম অংশে সৃষ্টিপত্তন, মঙ্গলদৈত্যবধ, ইন্দ্রের শাপমোচন ও ইন্দ্র কর্তৃক দেবীকে পঞ্চসখীদান—দেবীর মর্তে পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে কংসনদীতীরে দেউল নির্মাণ, কলিঙ্গরাজ কর্তৃক দেবীপূজা প্রভৃতি কাহিনী মাধবের কাব্যের অনুসরণে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে কালকেতুর পিতা ধর্মকেতুর সিংহের কবলে মৃত্যু এবং মাতা নিদয়ার সহমরণ ও কালকেতু ফুল্লরার-গতানুগতিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অংশে ধনপতির উপাখ্যান। এই অংশটি আকৃতিতে বেশ বড়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের কাহিনীতেও মাধবের রীতিই অনুসৃত হয়েছে।

রামদেবের অভয়ামঙ্গলে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ বিষ্ণুপদ এবং ধুয়াগান প্রচুর পরিমাণে মেলে। এখানে বৈষ্ণব পদাবলীর গভীর প্রভাব লক্ষিত হয়। এখানেও দ্বিজ মাধবের অনুসৃতি। রামদেবের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাবের ক্রমবর্ধমানতা সুস্পষ্ট। এই পদগুলিকে কবি কাব্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করেছেন। দু একটি পদ ব্রজবুলিতে রচিত। এই পদগুলিতে কবির গীতিকবিসুলভ বিশিষ্টতার স্বাক্ষর আছে। এই কাব্যে বহুবিচিত্র রাগরাগিণীর উল্লেখ থাকায় কবি যে সঙ্গীতদক্ষ ছিলেন তা বুঝা যায়। হয়ত বা কবি নিজেই চণ্ডীমঙ্গল গান করতেন।

কাব্য বিচার ঃ

দ্বিজ রামদেব দ্বিজ মাধবের অনুসরণে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করলেও মুকুন্দরামের প্রভাবও তাঁর কাব্যে দুর্লক্ষ্য নয়। ছন্দের বৈচিত্র্য—শব্দ সম্পদ এবং রসসৃষ্টির সার্থকতা তাঁর কাব্যকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। রামদেব পূর্ববঙ্গীয় কাহিনীর ধারা অবলম্বন করে মঙ্গলকাব্যসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হয়েছেন। তিনি মুকুন্দরামের যথার্থ উত্তরসূরী। তাঁর কাব্যে পুরাণ ও তন্ত্র

সমন্বিত হয়েছে। 'অমর সিদ্ধি' লাভের উদ্দেশ্যেই নীলাম্বরের শিব সেবা শুরু হয়েছিল। নীলাম্বরের সিদ্ধিলাভে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। কালকেতু স্বর্গ গমন করলে শিব তাঁকে সিদ্ধি জ্ঞান দান করলেন ঃ

যোগসূত্র কহিলাম শুন নীলাম্বর।
কহিলুম পরতত্ত্ব হইবা অমর॥

এই তন্ত্রসাধনার পটভূমিকাতেও কবি কিছু কিছু পুরাণকথার অবতারণা করেছেন। কবি পুরাণ তন্ত্র ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিলেন। কালিদাসের কাব্য থেকে দু এক ছত্র অনূদিত হয়েও রামদেবের কাব্যে স্থান পেয়েছে।

কবি রামদেবের প্রধান গুণ বাস্তবানুস্মৃতি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতেই ঘটনা ও চরিত্রে বাস্তবতার প্রাধান্য। রামদেবের কাব্যও বাস্তবতা বর্জিত নয়। কবি ধর্মকেতুর মৃত্যু, নিদয়ার সহমরণ, কালকেতুর শোক, ফুল্লরা ও খুল্লনার বারমাস্যা, কালকেতুর হাটে পশুজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় ও ক্রেতার ভিড়, খুল্লনা-লহনার বিবাদ, দাম্পত্যকলহ প্রভৃতি যথেষ্ট বাস্তবতার সঙ্গে বিবৃত করেছেন। তবে কালকেতুর উপাখ্যান বেশ সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত পরিসরে কাহিনী পরিবেষণ করায় কাব্যরস জমাট বাঁধার অসুবিধা হয়েছে। ধনপতির কাহিনীটিকে রামদেব বিস্তৃতি দিয়ে পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছেন। এখানে কবির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। রামদেবের কাব্যের চরিত্রগুলি দ্বিজ মাধবের কাব্যের অনুরূপ। দুঃখ বেদনা বর্ণনায় রামদেব কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ফুল্লরা-খুল্লনার বারমাসী বর্ণনায় কবি স্বকীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রার সময়ে খুল্লনার মনোবেদনা এবং পুত্রের প্রতি উপদেশেও কবি করুণ রস সৃষ্টি করেছেন।

শুন শুন অএ পুত্র আহ্মার যে শ্রীমন্ত
কহম তোরে অভাগী জননী
মাতৃবধ করি হেলা সিংহলেরে করিলা মেলা
তিলেক শুনরে হিতবাণী॥

রামদেব নামধাতুর বহুল প্রয়োগ করে বাঙ্গালা ভাষার শক্তি বৃদ্ধি করেছেন ; আবার মাঝে মাঝে কবি জয়দেবের অনুসরণে কাব্যকে শব্দালংকারে সজ্জিত করে কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে বিষয়বস্তুর ভূমিকা হিসাবে গৌরচন্দ্রিকার মত বিষ্ণুপদগুলির ব্যবহারও কবির কৃতিত্বের পরিচায়ক ; যদিচ বিষ্ণুপদের অত্যধিক ব্যবহার মূল আখ্যানবস্তুর গতি শ্লথ করে তুলেছে। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামদেব সম্পর্কে লিখেছেন, "কবি রামদেব রচনা কৌশল, চরিত্রে নূতন নূতন আলোছায়ার বৈচিত্র্য সৃষ্টি, মনস্তত্ত্ব সাংসারিক অভিজ্ঞতা, পারিবারিক প্রতিবেশ প্রভৃতি ব্যাপারে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মুকুন্দরামের পরই তাঁহার কাব্য গণনার যোগ্য হইয়া পড়ে।"

দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ রামদেব ঃ

দ্বিজ মাধব প্রদর্শিত পথেই রামদেবের কাব্য পরিক্রমা। কাহিনী পালাবিন্যাস চরিত্রাঙ্কণ প্রভৃতিতে তিনি মাধবের পদাংকই অনুসরণ করেছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "দ্বিজ রামদেব অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিজ মাধবের ভাষা পর্যন্ত অনুকরণ করিয়াছেন।······দ্বিজ মাধবের প্রতিষ্ঠা সমাজের মধ্যে স্থাপিত হইবার পর তাঁহারই রচনার ভাব এবং অন্তর্গত আদর্শ অনুসরণ করিয়া দ্বিজ রামদেব তাঁহার কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।" কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামদেবের কাব্যে মৌলিকতা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। কাহিনী এবং চরিত্রে রামদেবের কাব্যে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। ডঃ আশুতোষ দাস লিখেছেন, "তথ্য সংযোজনা, বাস্তবনিপুণতা, লৌকিক বর্ণনা, নাটকীয়ভাব সৃজন প্রসঙ্গতঃ কবিকুশলতায় মাধবাচার্যের কাব্যের সহিত স্বতঃ বিভিন্নতা আসিয়া পড়িয়াছে।" রামদেবের কাব্যে কাহিনীতে কিছু কিছু স্বতন্ত্রতা দেখা যায়। যেমন, জ্যোতিষ গণনা করিয়ে কালকেতুর মৃগয়া যাত্রা,—দেবী কর্তৃক কালকেতুকে পশুবধে নিষেধ,—জীবিকা চিন্তায় কালকেতুর ব্যাকুলতা,—দেবীর দশভুজা মূর্তি

পরিগ্রহ,—কালকেতুকে দেবীর বলয় দান (অঙ্গুরীয়কের পরিবর্তে) প্রভৃতি বহুতর নূতনত্ব রামদেবের কাব্যে লক্ষিত হয়। তবে এই ধরনের কিছু নূতনত্ব সৃজনের দ্বারাই কোন কবির মৌলিকতা প্রকাশ পায় না। কবি বাস্তব চিত্র বর্ণনায়, ভাষা ও অলংকার ব্যবহারে তন্ত্রের পটভূমিকায় পুরাণকথা পরিবেষণে এবং চরিত্র বর্ণনায় কিছু কিছু মৌলিকতা প্রদর্শন করেছেন। দ্বিজ মাধবের কাব্য কতকাংশে ব্রতকথার সমগোত্রীয়। কিন্তু রামদেবের কাব্যে পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পূর্ণাঙ্গ কবিকৃতির পরিচয় পাই। দ্বিজ মাধবের অনুসরণে কবি বিষ্ণুপদ রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বিষ্ণুপদগুলি সংখ্যায় যেমন বিপুল, তেমনি এগুলি গৌরচন্দ্রিকার মত বিষয়গত ভাবটিকে ব্যক্ত করেছে। দ্বিজ মাধবের বিষ্ণুপদগুলি প্রায়ই সংক্ষিপ্ত এবং অসমাপ্ত। কিন্তু রামদেবের বিষ্ণুপদগুলি পূর্ণাঙ্গ এবং কাব্য হিসাবে আরও উৎকৃষ্ট। চরিত্রচিত্রণেও কোন কোন স্থলে রামদেব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। লহনার চরিত্রে সপত্নী বিদ্বেষের সঙ্গে এক অন্তঃশীল মমত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে। ভাজা মাছের মাথা নিয়ে বেড়াল পালাবার চেষ্টা করলে দুর্বলা বেড়ালটিকে প্রহার করায় লহনাও দুর্বলাকে প্রহার করে।

> লহনাএ ফেলাএ ভাজা দুর্বলার তরে।
> থাপে থাকি ভোজা বিড়াল ভাজা চাপি ধরে॥
> ছেই ছেই বলিয়া মারে বিড়ালের মুড়ে।
> তোলা আছাড় খাইআ বিড়াল ঝুরি ঝুরি মরে।
> লহনাএ ধরে দুবা মনে পাইয়া তাপ।
> চুলে ধরি মারে কিল দুবলাএ বোলে বাপ॥

মাছ চোর বিড়ালের জন্য লহনার মমত্ব লহনা চরিত্রকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। আবার, লহনা দেবীর স্বপ্নাদেশ পাওয়ায় পর খুল্লনা বাড়ী ফিরে এলে লহনা বোনের কাছে যে কথাগুলি বলেছে তাতে তার বঞ্চিত জীবনের দৈন্যটুকু প্রকট হয়ে পড়েছে।

লহনাএ বোলে ভাই করম নিবেদন।
না বুঝি অভাগিরে মন্দ বোল অকারণ॥
সুতাসুতহীন হইছম মুই অভাগিনী।
একাকী রহিতে নারি ঘরে আনিছম ভগিনী॥

কবির সহানুভূতির আলোকে লহনা চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কবির বর্ণনা স্থানে স্থানে নাট্যগুণান্বিত হয়েও উঠেছে। স্থানে স্থানে তিনি কৌতুকরসও পরিবেষণ করেছেন। গৌড় প্রত্যাগত ধনপতির খুল্লনাকে পরস্ত্রী ভেবে তিরস্কার এবং পরে লজ্জিত হয়ে পত্নীর পরিতোষ বিধানের চেষ্টায় কৌতুকরস সৃষ্টি হয়েছে। পতিসহ রাত্রিযাপনের পর খুল্লনার নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টাতেও কিঞ্চিৎ কৌতুকরস পরিবেষিত হয়েছে। তবে এ ধবনের কৌতুক সর্বত্র প্রসারী নয়। নানা দিক থেকেই রামদেব দ্বিজ মাধবকে অতিক্রম করে গেছেন। তবে একথাও স্বীকার্য যে দ্বিজ মাধব পথিকৃৎ। রামদেব দ্বিজ মাধবকে সামগ্রিকভাবে অনুসরণ করে নিজস্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "রামদেবের কবিপ্রতিভা দ্বিজ মাধব অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আমাদের মনে হয় দ্বিজ মাধবের শিল্পরসবর্জিত ক্ষুদ্রাকারের মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালীকে কবি রামদেব মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃততর পটভূমিকায় নূতন রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন এবং অনেকটা সার্থক হইয়াছিলেন।" দ্বিজ মাধব সম্পর্কে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় একটু কঠোর মন্তব্য করেছেন। দ্বিজ মাধবের কাব্য সর্বত্রই শিল্পরসবর্জিত নয়। স্থানে স্থানে মুন্সীয়ানা ভালই দেখা যায়। তবে রামদেব যে মাধব অপেক্ষা কৃতিত্বের অধিকারী একথা অবশ্যই স্বীকার্য।

রামদেব ও মুকুন্দরাম ঃ

কাহিনী ও রচনারীতির দিক থেকে মুকুন্দরাম ও দ্বিজ মাধবের কাব্যের পার্থক্য সুস্পষ্ট। দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ রামদেব পূর্ববঙ্গীয় কাব্যরীতির অনুসারী।

মুকুন্দরামের কাব্য রীতি পশ্চিমবঙ্গের কবিগণের অনুসৃত। এই মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও দুই রীতির চণ্ডীমঙ্গলের ধারাতেই কালকেতু ও ধনপতির উপাখ্যান সর্বত্রই বর্ণিত হয়েছে। কাহিনী বর্ণনার দিক থেকে রামদেব ও মুকুন্দরামের কাব্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। দ্বিজ রামদেবের কালকেতুর উপাখ্যান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। চরিত্র সৃষ্টিতে এবং কাহিনী পরিবেষণে রামদেব দ্বিজ মাধবের অনুযারী হওয়ায় মুকুন্দরামের কাব্যে যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও জীবনবোধ প্রকাশ প্রেয়েছে রামদেবের কাব্যে ততটা লক্ষিত হয় না। আখেটিক খণ্ডে ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রটিই উল্লেখযোগ্য। এখানেও কবি মুকুন্দরাম অপেক্ষা মাধবের পথই অনুসরণ করেছেন। ভাঁড়ু পত্নীর কাছে অন্ন প্রার্থনা করলে ভাঁড়ুপত্নী অন্নাভাবের কথা জানায়।

রমণীএ বোলে দত্ত কহো মিথ্যা বাজে।
কি আছে ঘরেতে অন্ন খোজ কোন লাজে॥

অতঃপর ভাঁড়ুর বাজার করার বর্ণনা কবি মাধবের বর্ণনা অনুসারেই করেছেন তথাপি রামদেবের ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র বর্ণনায় দক্ষতার পরিচয় আছে কালকেতুর সভায় সম্মান না পেয়ে ভাঁড়ু তৎক্ষণাৎ সকলের সামনে বলেছে

দত্তবংশে জন্ম যার কে জানে মহিমা তার
আহ্মা হোন্তে কে আছে প্রধান।
পশুবধি নিরন্তর করেতে না হইছে কড়
কোন হেতু হইবা নিপুণ॥
মাংস বেচি খাইছ ভাত ধনমন্ত হইছ তাত
তুহ্মি কি জানিবা গুণাগুণ॥

কালকেতুর নির্দেশে ভাঁড়ুকে কালকেতুর লোকজন প্রহার করে। প্রহারে জর্জরিত ভাঁড়ু প্রাণভয়ে বিবসন হয়েই পলায়ন করে।

প্রাণভয়ে বিবসন উঠি দিল লড॥

বাইরে গিয়েই ভাঁড়ু স্বমূর্তি ধারণ করেছে:

দুই গোঁপ মোচরিয়া ফিরি বান্দে পাগ।
তর্জিয়া গর্জিয়া ভারু করিল গমন।

ভাঁড়ুর দুর্দশা দেখে পথের লোক প্রশ্ন করলে ভাঁড়ু বলে যে কালকেতু পরিহাস করেছে।

ভাঁড়ু বলে গিয়াছিলুম মহাবীরের পাশ।
সম্বন্ধ কারণে মোরে করে পরিহাস।

ঘরে ফিরে ভাঁড়ু পত্নীকে বলে :

ভারু দত্তে বোলে প্রিয়া কি জিজ্ঞাস মোরে।
তিলেক বিচ্ছেদ হৈতে না দেয় বীরবরে॥
তাহান সহিতে করি পুরাণ শ্রবণ।
দরবিল পাষাণ চিত্ত করয়ে ক্রন্দন।
গাইন বর্গে বীরের হরিগুণ গাএ।
ভাবে লোটাইলুম ধুলা লাগিয়াছে গাএ॥

ভাঁড়ুর চতুরতা এবং শঠতা মনোরমভাবেই ফুটে উঠেছে। তবে মানবমনের যে সূক্ষ্ম গতিপ্রকৃতি—ঘাতপ্রতিঘাতের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গী মুকুন্দরামের চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে তা শুধু রামদেবের কাব্যে কেন, মঙ্গল-কাব্যের কোন কবির রচনায় পাওয়া যায় না। এদিক দিয়ে মুকুন্দরাম মধ্যযুগীয় কাব্যের সম্রাট। তবে রামদেব ধনপতির উপাখ্যানে কতকটা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মুকুন্দরামের এই উপাখ্যানে কিছুটা শিথিলতা আছে ; যত্রতত্র পুরাণকথার অনুপ্রবেশে কাহিনীর গতিও ব্যাহত হয়েছে। রামদেবের ধনপতির উপাখ্যানে কাহিনীর গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি,—পুরাণকথার ভিড় কাব্যরসিকের বিরক্তি উৎপাদন করেনি। তবে মুকুন্দরামের পুরাণ কথার স্থান নিয়েছে বিষ্ণুপদ। কবির আন্তরিক বিষ্ণুভক্তিতে কাব্যটি সুখ-পাঠ্য হয়েছে। যে সুগভীর সহানুভূতিতে মুকুন্দরামের কাব্য ভাস্বর, রামদেবের কাব্যে সেরূপ আশা করা যায় না। মুকুন্দরামের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাই

কাব্যটিকে প্রাণোচ্ছল করে তুলেছে। রামদেব মাধবের মতই বস্তুগত দিকটাই প্রধান করে তুলেছেন। তবে কবির বৈষ্ণবভাবুকতা কাব্যটিতে একটি নূতনতর আস্বাদ এনে দিয়েছে। বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তি ও স্নিগ্ধমধুর ধ্বনিঝংকারে রামদেবের কাব্যটিতে শাক্ত ও বৈষ্ণবীয় ধারার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। রামদেবের কাব্যে করুণরস স্থানে স্থানে ভালই ফুটেছে। কিন্তু মুকুন্দরাম যে কারুণ্যের অজস্র আয়োজন করেছেন, মানুষের দুঃখবেদনার চিত্র এঁকেছেন যত্রতত্র, তেমনটি আর কোথাও পাই না। মুকুন্দরামের কাব্যে যে স্নিগ্ধ পরিহাস-রসিকতা দুঃখবেদনার মধ্যে যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়ে হাসি ও অশ্রুতে একাকার হয়ে গেছে, তা রামদেব কেন মধ্যযুগের কোন কবির কাব্যেই পাই না। ডঃ আশুতোষ দাস লিখেছেন, "রামদেব জীবন-রস-রসিক এবং শক্তিধর মঙ্গল কবি। তিনি মুকুন্দরামের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। তাঁহার কবি প্রতিভা বর্ণনার নিপুণতায়, অভিনব সরসত্বে এবং বাস্তব বনর্ণায় স্থানে স্থানে মুকুন্দরামের প্রতিভাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।" রামদেবকে দ্বিজ মাধবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যায়। মুকুন্দরামের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলাও চলে, কিন্তু মুকুন্দরামের অপেক্ষা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। মুকুন্দরামের মত বাস্তবরস তথা জীবন-রস রামদেবের কাব্যে সর্বময় হয়ে ওঠেনি। অবশ্য কাহিনী বর্ণনায়—বিশেষতঃ ধনপতির কাহিনীতে—কতকাংশে রামদেবের কৃতিত্বের পরিচয় আছে। মুকুন্দরামের কাব্যে ধনপতি চণ্ডীবিদ্বেষী বলেই সিংহলযাত্রার প্রাক্কালে চণ্ডীর ঘটে লাথি মেরেছে। রামদেবের কাব্যে খুল্লনাকে সম্মুখে দেখতে না পাওয়ার ক্ষোভে ধনপতি ঘটে লাথি মেরেছে। এখানে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু চরিত্র-গৌরব বর্ধিত হয়নি। খুল্লনার বারমাসী বর্ণনায় রামদেব করুণ রস সৃষ্টি করেছেন। এই বর্ণনাটি মুকুন্দরামের বর্ণনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তথাপি সামগ্রিক বিচারে রামদেবকে কোনক্রমেই মুকুন্দরামের সমকক্ষ বলা যায় না। কালকেতু কর্তৃক পশুজাত দ্রব্য বিক্রয়কালে হাট-বাজারের যে বিবরণ রামদেব দিয়েছেন,

ডঃ দাসের মতে তা মুকুন্দরামের থেকেও nearer to life. কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে মধ্যযুগীয় বাঙ্গালাদেশের সমাজ ও জীবনের প্রত্যক্ষলব্ধ চিত্র যত্রতত্র ছড়ানো আছে, শুধু তাই নয় বাঙ্গালার সমাজজীবনের যে পরিপূর্ণ চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে তা দক্ষ ঐতিহাসিকের পক্ষেও নির্মাণ করা সহজ নয়। বরঞ্চ মুকুন্দরামের আদর্শ সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও রামদেবের কাব্যে ব্রতকথার আদর্শ একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। রামদেবের সম্পর্কে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি সমর্থনযোগ্য: "বাস্তবতার সঙ্গে যে কল্পনার সুসামঞ্জস্য থাকিলে সাধারণ ব্যাপারও বিচিত্র রসে ভরিয়া ওঠে, আমাদের কবির সেই শক্তি ততটা ছিল না। যদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি মুকুন্দরামের গৌরব খর্ব করিতে পারিতেন।"

মুক্তারাম সেন:

চণ্ডীমঙ্গলের আর এক কবি মুক্তারাম সেন। কাব্যের নাম সারদামঙ্গল বা অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঞ্চালিকা। কবি গ্রন্থ মধ্যে যে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় যে কবি চট্টগ্রামের আনোয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির প্রপিতামহ যাদব রায় ও তাঁর ভ্রাতা মাধব রায় যশোহরের কালিয়াগ্রাম থেকে এসে চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ১৪৩০ শকাব্দে বা ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে যাদব রায় যশোহর থেকে চট্টগ্রামে এসেছিলেন। কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে কবি লিখেছেন:

কবি পরিচয়

গ্রহ ঋতু কালে শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী॥

১৩৬৯ শকাব্দ বা ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে কবি কাব্যটি রচনা করেছিলেন। কবি বংশানুক্রমে তান্ত্রিক ছিলেন এবং নিজে সাধক ছিলেন। তিনি তীর্থ পর্যটন করে বেড়াতেন। মুক্তারামের কালজ্ঞাপক পয়ারটিতে কেউ কেউ 'কাল' শব্দ স্থানে 'কায়' ধরে 'ছয়' অর্থ করে ১৬৬৯ বা ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ কাব্যরচনার কাল বলে গণ্য করেন।

মুক্তারামের সারদামঙ্গল দুই খণ্ডে বিভক্ত হলেও ব্রতকথার মত সংক্ষিপ্ত —কতকটা পাঁচালী ধরনের। দ্বিজ মাধবের মত মঙ্গলদৈত্য বধের কাহিনী মুক্তারাম সন্নিবেশিত করেছেন। 'মঙ্গলদৈত্য বধ' উপাখ্যানের পর গতানুগতিক কালকেতু ও ধনপতির উপাখ্যান। কাহিনীগুলি সংক্ষিপ্ত। কাব্যকলায় মুকুন্দরাম বা দ্বিজ মাধবের প্রভাব লক্ষিত হয় না। তবে মাধবের কাব্যাদর্শই তিনি গ্রহণ করেছেন। দ্বিজ মাধব বা রামদেবের মত কিছু কিছু বিষ্ণুপদ মুক্তারাম রচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর ভাবের অনুযায়ী বিষ্ণুপদগুলি রচিত হয়েছে। কবির উচ্চতর প্রতিভার তেমন কোন পরিচয় কাব্যে নেই।

কাব্য বিচার

অন্যান্য কবি ঃ

হরিরাম, দ্বিজ মুকুন্দ, রসিক মিশ্র, জনার্দন সেন, অকিঞ্চন চক্রবর্তী কবিগণ মুকুন্দরামের আদর্শে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এঁদের কাব্যে লক্ষিত হয় না।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ঃ

ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। বর্ধমান জেলার ভূরশুট বা ভূরিশ্রেষ্ঠ পরগণার ব্রাহ্মণ রাজবংশের যে শাখা পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গড়ের অধিকারী ছিলেন এবং পেঁড়ো গ্রামে বাস করিতেন, সেই শাখাতেই কবিবর ভাবতচন্দ্রের জন্ম। ভূরশুট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণ রায়ের পুত্র মহেন্দ্র রায়ের বংশধর সদাশিব রায়ের পৌত্র ও নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ভারতচন্দ্র রায়। কবির মাতার নাম ভবানী। কবি ঈশ্বর গুপ্তের মতে ভারতচন্দ্রের জন্ম ১৬৩৪ শকে বা ১৭১২ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৬৮২ বা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে। ভারতচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার যে কাল বা বয়স উল্লেখ করেছেন সেই হিসাবে কবির জন্ম সম্পর্কিত হিসাবে কিছু ভুল আছে মনে হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে কবির জন্মকাল ১৭০৫ থেকে ১৭১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

কবি পরিচিতি

কবির চোদ্দ পনের বৎসর বয়সকালে আনুমানিক ১৭২০ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান-রাজ কীর্তিচন্দ্র ভূরশুট রাজ্য আক্রমণ করেন। ফলে পেঁড়ো গ্রামও কীর্তিচন্দ্রের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাল্যকাল থেকেই কবিকে বহুতর দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে কাল কাটাতে হয়। তিনি মাতুলালয়ে মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন নওয়াপাড়া গ্রামে বাস করতে থাকেন। এই সময়ে নিকটবর্তী তাজপুর গ্রামে চতুষ্পাঠীতে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান অধ্যয়ন করেন। এই সময়েই অল্প বয়সে তিনি নিজেই সারদা গ্রামে বিবাহ করেন। অতঃপর সংস্কৃত শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে কবি বাড়ী ফিরলেন। সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপারে এবং স্বেচ্ছাকৃত বিবাহের জন্য কবির পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন অসন্তুষ্ট হন। কবি তখন হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সীর বাড়ীতে থেকে ফার্সী পড়তে শুরু করেন। এখানে অবস্থানকালে কবি সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা করেন। ফার্সী ভাষা শিক্ষা শেষ করে ভারতচন্দ্র বাড়ী ফিরে এলে অগ্রজগণ তাঁকে বিষয় সম্পত্তি তদারকির জন্য পাঠালেন বর্ধমান রাজবাড়ীতে। কবির পিতা খাজনা দিতে অসমর্থ হওয়ায় কবি বর্ধমানে কারারুদ্ধ হন। অবশেষে কারারক্ষীর কৃপায় গোপনে মুক্তিলাভ করে কবি উড়িষ্যায় কটকে উপস্থিত হন। এখান থেকে এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সন্ন্যাসী বেশে বৃন্দাবন যাবার পথে হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হলে কবির শ্যালিকাপতি তাঁকে চিনতে পেরে তাঁর সন্ন্যাসীবেশ মোচন করিয়ে আবার গার্হস্থ্য ধর্মপালনে প্ররোচিত করেন। পত্নীসহ কিছুকাল বসবাস করার পর জীবিকার জন্য কবি তদানীন্তন ফরাসী সরকারের দেওয়ান ফরাসডাঙ্গার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর শরণাপন্ন হন। ইন্দ্রনারায়ণ ভারতচন্দ্রের গুণে মুগ্ধ হয়ে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করেন কবির জীবিকার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিতে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সভাকবি নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে তিনি অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন এবং 'রায়গুণাকর' উপাধি পান। মহারাজ

কবিকে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন এবং কবির বসতবাটী নির্মাণের জন্ত একশত টাকা দান করেন। পরে এই গ্রামের ষোল বিঘা জমি ও নিকটবর্তী গুপ্তে গ্রামের একশত পাঁচ বিঘা জমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্র দান করেন। মূলাজোড গ্রাম বর্ধমানের মহারাণী তিলকচন্দ্রের জননী পত্তনি নিয়ে রামদেব নাগকে পত্তনিদার নিযুক্ত করেন। পত্তনিদারের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে ভারতচন্দ্র নাগাষ্টক সংস্কৃত কবিতা লিখে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠান। অবশ্য গ্রামবাসীদের অনুরোধে কবি শেষ পর্যন্ত মূলাজোড়েই বসবাস করেন। ভারতচন্দ্রেব অন্যান্য রচনা অসম্পূর্ণ চণ্ডী নাটক এবং মৈথিল কবি ভানু দত্তের রসমঞ্জরীর আদর্শে রচিত বাঙ্গালা রসমঞ্জরী। ঈশ্বর গুপ্তের মতে ৪০ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে কবি পরলোক গমন করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষ্যে অন্নদা-মঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল। নবাব আলিবর্দী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বার লক্ষ টাকা নজরানা দাবী করেছিলেন। মহারাজ ঐ টাকা দিতে অসমর্থ হওয়ার মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কারাগারে দেবী অন্নপূর্ণার কাছ থেকে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন দেবীর পূজা করতে এবং ভারত-চন্দ্রকে দিয়ে অন্নদামঙ্গল রচনা করাতে। দেবী ভারতচন্দ্রকেও স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন। অন্নদামঙ্গল রচিত হয়েছিল কবির পরিণত বয়সে ১৩৭৪ শকাব্দ অথবা ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে। কবি লিখেছেন:

অন্নদামঙ্গল রচনা

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।

রচনার পর কাব্যটি কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গীত হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গলের অনুসরণে রচিত। এই অংশেরই নাম অন্নদামঙ্গল। এই অংশে শিব—সতী—পার্বতীর পৌরাণিক কাহিনী, হরগৌরীর গৃহস্থালী ও কোন্দল—শিবের ভিক্ষায় গমন—অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য—কাশী প্রতিষ্ঠা—ব্যাসের

অন্নদামঙ্গল পরিচিতি

দ্বিতীয় কাশী নির্মাণের ব্যর্থ চেষ্টা—দরিদ্র হরিহোড়ের প্রতি দেবীর কৃপা—কুবেরের অন্যতম পুত্র নলকুবেরের প্রতি দেবীর অভিশাপ—নলকুবেরের ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্ম—হরিহোড়কে ত্যাগ করে অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা ও ভবানন্দের প্রতি কৃপা প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের এই অংশগুলি পুরাণের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। কেবল হরিহোড়ের বৃত্তান্ত ও ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী পুরাণ বহির্ভূত ও কল্পিত।

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর কাব্য বা কালিকামঙ্গল কাব্য। কাব্যটি রচিত হয়েছে ইতিহাসের পটভূমিকায়। যশোরের রাজা-প্রতাপাদিত্যকে দমন করার উদ্দেশ্যে মানসিংহ বর্ধমানে এলে মানসিংহের কানুনগো ভবানন্দ মজুমদার রসদ যোগানের উদ্দেশ্যে বর্ধমানে উপস্থিত হলেন। এই সময়ে সুন্দরের কাটা সুরঙ্গ দেখে মানসিংহ বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান শুনতে চাইলে ভবানন্দের মুখ দিয়ে কবি এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

এই কাব্যের তৃতীয় খণ্ড মানসিংহ কাব্য। ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তায় মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্য পরাজয়,—মানসিংহের পরামর্শে ভবানন্দের দিল্লী গমন,—দিল্লীশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক ভবানন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ,—দেবীর কৃপায় ভবানন্দের মুক্তি,—জায়গীর ও রাজা উপাধি লাভ—বাদশা কর্তৃক অন্নপূর্ণা পূজা—ভবানন্দের স্বরাজ্যে অন্নপূর্ণা পূজা—নলকুবেরের শাপমোচন ও স্বর্গগমন,—এই অংশে বর্ণিত হয়েছে।

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ডে কবি ইতিহাস, কাব্য ও রূপকথার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ফলে ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই অংশটুকু কবির মৌলিক সৃষ্টি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে খুশী করতে কবি কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের গৌরবগাথা বর্ণনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ইতিহাসের জোড়াতালি তিনি ভবানন্দের তীর্থদর্শন প্রসংগে তীর্থ বর্ণনার দ্বারা পূর্ণ করেছেন। ইতিহাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিকৃত হয়েছে। কবির বর্ণনায় পাওয়া যায় যে মানসিংহ যশোরেশ্বর

কবির ইতিহাস চেতনা

প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে গিয়ে খাদ্যাভাবে বিপদাপন্ন হয়ে পড়লে ভবানন্দ দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় মানসিংহের সৈন্যদের রসদ যুগিয়ে সৈন্যদের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যকে জয় করে খাঁচায় বন্দী অবস্থায় দিল্লী নিয়ে যাবার কালে পথিমধ্যে অনাহারে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়। দিল্লীতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে মানসিংহ অন্নপূর্ণাভক্ত ভবানন্দের সহায়তার কাহিনী বিবৃত করে ভবানন্দের জন্য দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহ স্বরূপ জায়গীর এবং রাজা উপাধি প্রার্থনা করলেন। হিন্দুদ্বেষী মুঘল সম্রাট অন্নপূর্ণার মহিমাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ভবানন্দকে কারারুদ্ধ করলেন। ভবানন্দ কারাগারে দেবীর স্তব করলেন। দেবী তাঁকে অভয় দিয়ে বিধর্মী অত্যাচারী সম্রাটকে ভয় দেখাতে দিল্লীতে ভূত প্রেতের উপদ্রব সৃষ্টি করলেন। ভূতের উপদ্রবে দিল্লাবাসীরা সন্ত্রস্ত হলে সম্রাটের চৈতন্য হোল। দেবী সম্রাটকে আকাশে অনেক ভেল্কি দেখালেন,—মুঘল দরবারের অনুরূপ এক দরবার দেখালেন,—সেখানে দেবগণ উজির নাজির ইত্যাদি আর দেবী স্বয়ং সম্রাজ্ঞী। জাহাঙ্গীরের চৈতন্যোদয় হোল। তিনি বুঝলেন যে হিন্দুর দেবতা 'সাঁচা'। তিনি স্বয়ং আমীর-ওমরাহ সহ অন্নপূর্ণার পূজায় মেতে উঠলেন।

এই কাহিনীতে যে ইতিহাস নামেমাত্র, রূপকথার কাহিনীই মুখ্য সে বিষয়ে কেউই দ্বিমত হবেন না। এই হাস্যকর কাহিনী রচনায় কবি সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেছেন। অপরপক্ষে প্রতাপাদিত্য সম্পর্কিত কাহিনীতেও ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ঘটেছে। প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটেছিল মানসিংহের হাতে নয়,—মানসিংহের সুবেদারীর কালেও নয়। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ যখন সুবেদার ছিলেন, সেই সময়ে মুঘল সেনাপতি মির্জানাথনের চেষ্টায় প্রতাপাদিত্য পরাজিত ও বন্দী হন। প্রতাপাদিত্যের পরিণতির কাহিনী জনশ্রুতিমূলক। মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্য বিজয় কাহিনী ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে আছে। ভারতচন্দ্র ক্ষিতীশ বংশাবলী

চরিত থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছেন। অবশ্য এ জন্য কবিকে দোষ দেওয়া বৃথা। সেকালে ইতিহাসের গবেষণার দ্বারা প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভব ছিল না। কবি ইতিহাসের স্বল্পালোকিত ঘটনার সঙ্গে অবাধ কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। জাহাঙ্গীরের হিন্দু-দ্রোহিতার বর্ণনাটি স্বাভাবিক হয়েছে।

কিন্তু ইতিহাস চেতনা কবির যে ছিল না তা নয়। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি সে যুগের ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। মোঘল শাসনের অবসান—নবাবের অত্যাচার—বর্গীর হাঙ্গামা—রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা প্রভৃতির ছাপ কিছু কিছু পড়েছে। কিন্তু সেই পলাশীর যুদ্ধের যুগের সামাজিক এবং রাজনৈতিক দুর্যোগেব তেমন কোন সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাই না। অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ দিতে গিয়ে নবাব আলিবর্দির সিংহাসনলাভ, আলিবর্দি কর্তৃক কৃষ্ণচন্দ্রকে কারাগারে নিক্ষেপ—বর্গীর হাঙ্গামা—আলিবর্দি কর্তৃক উড়িষ্যা ধ্বংস প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ কবি দিয়েছেন।

সুজা খাঁ নবাব সুত সরেফরাজ খাঁ।
দেওয়ান আলমচন্দ্র রায় রায় বাঁয়া॥
আছিল আলিবর্দী খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিল যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দী হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিলা বাদশা খেতাব॥
কটকে মুরশীদকুলী খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দী খেদাইয়া দিল॥

*　　*　　*

ভাইপো সেইকতজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া পুড়িয়া॥

বর্গীর হাঙ্গামার বর্ণনা :

আছয়ে বর্গীর রাজা গড় সেভারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনের করিবে দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিল স্বপন॥
স্বপ্ন দেখি বর্গীরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইয়া রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃত আকৃতি॥
লুটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম জুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥

ভারতচন্দ্রের মতে যবনের অত্যাচার দমনের উদ্দেশ্যেই বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়েছিল।

কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্দশা:

নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্ত মতি॥

* * *

মহাবদজঙ্গ তারে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা ব'লে বার লক্ষ টাকা চায়॥

* * *

বদ্ধ করি রাখিলেন মুরশিদাবাদে।
কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে॥

গ্রন্থ সূচনায় কবি যে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, তাতে তাঁর ইতিহাস চেতনার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা বর্ণনাটিও

ইতিহাসের দিক থেকে মহামূল্যবান। যুগ পরিবর্তনের সামগ্রিক পরিচয় যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায় না তার কারণ কবি মঙ্গলকাব্যের আদর্শে কাব্য রচনায় হাত দিয়েছেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পরিতুষ্টি বিধান তাঁকে করতে হয়েছে।

অন্নদামঙ্গল ও মঙ্গলকাব্য ঃ

অন্নদামঙ্গল কাব্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেরই পরিণতি—বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্য সংসারের শেষ উজ্জ্বল দীপ। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে যে মঙ্গলকাব্যের ধারা বিচিত্র খাতে বহু কবির প্রতিভার নির্ঝরিণী পুষ্ট হয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল, তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্ষীণস্রোতা হয়ে পড়েছিল। বিচিত্র-খাতগুলি অক্ষম কবিদের নিষ্প্রাণ গতানুগতিক রচনার ক্ষীণতর প্রয়াসে শুষ্কপ্রায় হয়ে আসছিল। সেই সময়ে ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের স্রোতোধারায় শেষবারের মত প্রবল সঞ্জীবনী বেগ সঞ্চার করলেন। নিভে যাবার পূর্বে মঙ্গলকাব্যের দীপশিখাটি শেষবারের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন শাখাগুলি আলোচনা করলে কাব্যের কাঠামোতে মোটামুটি একটা সাদৃশ্য চোখে পড়বে। সেই কাব্যরচনার জন্য দেবতার স্বপ্নাদেশ,—দেব বন্দনা,—দেবতার মহিমাকীর্তন—দেবীপূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে শাপভ্রষ্ট দেব-দেবীর মর্ত্যাবতরণ,—কাব্যের নায়ক শাপভ্রষ্ট দেবতার পূজা প্রচারের অনুকূলতা অথবা প্রতিকূলতা— নানা বাধাবিঘ্নের পর দেবতার পূজা প্রচার,—সেই বারমাসী বর্ণনা,—চৌতিশ স্তব,—সেই শিবঠাকুরের পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে লৌকিক উপাখ্যানের সংমিশ্রণ,—মোটামুটি একই ছাঁচ—একই গতানুগতিক রীতি! তার উপরে এক একটি শাখায় একই ধরনের কাহিনী পরিবেষণ! কোন কোন প্রতিভাধর কবি ছাড়া আরও অসংখ্য কবি ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন গতানুগতিক রীতি ও কাহিনী অবলম্বন করে স্বকীয়

বিশিষ্টতাকে পরিস্ফুট করে তুলতে। অক্ষম কবিযশঃ প্রার্থীর দল বাঁধাধরা পথে আবর্তন করে রসের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে না পারায় মঙ্গলকাব্যগুলি ক্রমশঃ একঘেয়ে কাহিনী বর্ণনায় পরিণত হয়েছিল। সেই একঘেয়েমি থেকে মঙ্গলকাব্যকে মুক্তি দিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 'নূতন মঙ্গল' রচনা করে। ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন, ঋণ গ্রহণ করেছেন মনসামঙ্গল, শিবায়ন ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গল থেকে। তথাপি তিনি গতানুগতিকতা সর্বতোভাবে পরিহার করেছিলেন। কাহিনী, রচনাশৈলী ও ভাষা প্রয়োগে ভারতচন্দ্রের কাব্য এক নূতন পথ সৃষ্টি করে নিয়েছে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল মঙ্গলকাব্য ধারার অনুসৃতি হলেও মঙ্গলকাব্য বিশেষতঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে এর প্রভূত পার্থক্যও বিদ্যমান। চণ্ডী, কালিকা, অন্নদা প্রভৃতি দেবতাগণ মূলতঃ এক হলেও মঙ্গলকাব্যে এঁদের রূপ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের চরিত্রে যে হিংস্রতা ও হীনতার পরিচয় পাওয়া গেছে অন্নদামঙ্গলে অন্নদা চরিত্রে তার লেশমাত্র নেই। অন্নদা—অন্নপূর্ণা—বরাভয়-দাত্রী। নিজের পূজা প্রচারের জন্য তিনি কোন দেবকুমারকে অভিশপ্ত করে মর্তে পাঠাননি,—কোন প্রকার ভীতি প্রদর্শন করে পূজা আদায়ের চেষ্টাও করেন নি—কোন প্রকার হীনতাকে আশ্রয় করেননি। তাঁর কৃপায় ঘুঁটে কুড়োনীর বেটা হরিহোড় ধন-সম্পদ লাভ করে—ঈশ্বরী পাটনীর দারিদ্র্য ঘোচে—ভবানন্দ মজুমদার রাজা হন। অবশ্য দেবী কোথাও কোথাও ঈষৎ ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। ছলনার আশ্রয় নিয়ে হরিহোড়কে ত্যাগ করেছেন,—ব্যাসের কাশীনির্মাণ প্রয়াস ব্যর্থ করেছেন। এই ছলনার মধ্যে নিজের পূজা প্রচারের উৎকট আগ্রহ প্রকাশ পায়নি। ভক্ত ভবানন্দকে করুণা করা এবং অন্নদার স্বামী শিবের নির্মিত শিবকাশীর মহিমা রক্ষার্থেই তিনি এই ছলনাটুকুর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর সমস্ত উগ্রতাটুকু পরিহার করে দেবী এখানে প্রকৃতই অন্নদা—অভয়া।

অন্নপূর্ণা দেবী

মঙ্গলকাব্যগুলি দেবতার মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। এগুলি সাধারণতঃ পালাক্রমে আট বা বার দিন ধরে গীত হ'তো—অন্তিমপূর্ব দিনে রাত্রি জাগরণ করে পালা শোনার রীতিও ছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য মঙ্গলবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত গান করার রীতি। এইগুলি পাঁচালী কাব্য নামে পরিচিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল অন্নদার মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও কবির মুখ্য উদ্দেশ্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ বা অনুরোধ। সুতরাং দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন কবির প্রধান লক্ষ্য ছিল না। অন্নদামঙ্গল পাঁচালীরূপে গীত হওয়ার উদ্দেশ্যেও রচিত হয়নি,—রাজসভায় পাঠের উদ্দেশ্যেই রচিত। আটটি পালায় অন্নদা-মঙ্গল রচিত হলেও এই পালা বিভাগ বিষয়বস্তু অনুসারে হয়নি। দেবীর আনুকূল্য লাভ,—অভক্ত বা অবিশ্বাসীর মনকে দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা,—ভীতি-প্রদর্শন অথবা অমঙ্গলনাশের প্রলোভনের দ্বারা মানবের মনে ভয়মিশ্রিত ভক্তি সঞ্চার করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা হলেও—কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রেরণা নয়। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন অপেক্ষা কাব্যরস সৃষ্টিই কবির কাছে অধিকতর আকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে। দেবদেবী বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড বর্ণনা করে মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক গঠনরীতি ভারতচন্দ্র স্বীকার করে নিয়েও গতানুগতিকতাকে পরিহার করেছেন। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক দুর্যোগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বন্দীদশায় ধার্মিক ভক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের বিপদে করুণাময়ী অন্নদার করুণা বর্ষণ এবং সভাকবিকে দিয়ে কাব্য রচনায় অন্নদার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

কাব্য রচনার উদ্দেশ্য

সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি মোরে রায়গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও

দেবখণ্ড বর্ণনায় কবি গতানুগতিক রীতি অনুসরণ করলেও হরগৌরীর পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে হরিহোড এবং ভবানন্দের লৌকিক কাহিনী অনুপ্রবিষ্ট করেছেন। কবির বর্ণনায় স্বর্গের দেবতা মর্তের ধূলামাটির মানুষে পরিণত হয়েছেন। যে ভক্তিভাব মঙ্গলকাব্যের প্রাণস্বরূপ,—ভারতচন্দ্রের কাব্যে তা প্রায় অদৃশ্য হয়েছে। কবি দেবদেবীদের নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গে মেতে উঠেছেন। মঙ্গলকাব্যের বহিরঙ্গ গঠনপ্রকৃতিকে স্বীকার করে কবি স্বাধীনভাবে বিচরণ করেছেন। অন্নদামঙ্গলে দেবখণ্ডই প্রধান। নরখণ্ড দেবখণ্ড অপেক্ষা নিষ্প্রভ। এই অংশে মঙ্গলকাব্যোচিত দেবী মহিমা নির্দেশক গতানুগতিক কাহিনী বর্ণিত হয়নি। এই অংশে বর্ণিত হয়েছে দেবীভক্ত ভবানন্দের দেবীর কৃপায় জায়গীর ও রাজা খেতাব লাভ। একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ইতিহাস ও কল্পনার অবাধ লীলাবিলাসের সংমিশ্রণে কবি তৈরী করেছেন এই কাহিনীটি। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে একটি আদিরসাত্মক প্রণয়মূলক রোমান্টিক উপাখ্যান 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য'। বিদ্যাসুন্দর কাব্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক সুপ্রচলিত লৌকিক কাহিনী—দেবী কালিকার মহিমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই তিনটি কাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ—তিনটি পৃথক কাব্য কাহিনী একটি সংকলনে ধৃত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দুটি স্বতন্ত্র কাহিনী সন্নিবিষ্ট থাকলেও দেবী মহিমা প্রচারের দিক থেকে দুটি কাহিনীর স্বাজাত্য আছে। অন্নদামঙ্গলে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর সঙ্গে দৈব কাহিনী অথবা ভবানন্দের উপাখ্যান বা মানসিংহ কাব্যের সংযোগ নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। অপর দুটি অংশ পরস্পর বিশ্লিষ্ট। মঙ্গলকাব্যের নায়ক দেবদেবীর পূজা প্রচারের প্রধান ভূমিকা নিয়ে দেবতার পূজা প্রবর্তনে সহায়তা করে থাকেন। কিন্তু অন্নদামঙ্গলে এমন কোন চরিত্রই নেই যে দেবীপূজা প্রবর্তনে সহায়তা করতে অগ্রণী হতে পারে। এখানে দেবীপূজা প্রচারের জন্য কোন আয়োজনই নেই। অন্নদামঙ্গল কাব্যে কোন নায়কই নেই। তিনটি বিচ্ছিন্ন অংশে এক-নায়কত্বের প্রশ্নই ওঠে না। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতিটি মাত্র

গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কাব্যের কাহিনীতে অথবা রচনাশৈলীতে কবি মঙ্গলকাব্যের রীতিকে মেনে চলেন নি। যুগরুচি ও যুগধর্ম অনুসারে রাজসভার কবি স্বকীয় বৈদগ্ধ্য অনুসারে গতানুগতিক কাহিনী বর্ণনা অপেক্ষা কাব্য-কলাকেই অধিকতর মর্যাদা দিয়েছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "একই চণ্ডীমলঙ্গল ধারার পরিণতি হইলেও অন্নদামঙ্গলের সহিত চণ্ডীমঙ্গলের পার্থক্য উৎসমুখ হইতে উৎসারিতা তীব্রস্রোতা ক্ষীণকায়া উপল প্রতিহতা নির্ঝরিণীর সহিত সমতলে প্রবহমানা বিপুলকায়া শ্লথস্রোতা সমুদ্র-সন্নিহিতা স্রোতস্বিনীর স্বাতন্ত্র্যের মত গভীর ও ব্যাপক। দেবী কল্পনায়, কাহিনী সংগঠনে, কাব্যের মেজাজে ও উদ্দেশ্যে সব দিক দিয়াই চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদা-মঙ্গলের মধ্যে এই পার্থক্য বিদ্যমান।"

অন্নদামঙ্গল কাব্য ও মহাকাব্য

অন্নদামঙ্গলে মঙ্গলকাব্যের বহিরঙ্গ রূপটি মাত্র স্বীকৃত হলেও মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে অন্নদামঙ্গলের পার্থক্য প্রচুর। অন্নদামঙ্গল প্রকৃত মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। গতানুগতিক রীতি পরিত্যাগ করে কবি যুগধর্ম, যুগরুচি ও তজ্জাত নিজস্ব পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে কাব্য রচনা করেছিলেন। তাতে সমকালীন সমাজ ও যুগমানসই প্রতিফলিত হয়েছে। দেবচরিত্র বর্ণনা করতে কবি দেশের পরিচিত মানুষের চরিত্রই এঁকেছেন। বাঙ্গালা দেশের সাধাবণ মানুষই দেবচরিত্রের বেনামীতে আত্মপ্রকাশ করেছে। শিব, অন্নপূর্ণা, নারদ, মেনকা প্রভৃতি দেবদেবী চরিত্রগুলিতে বাঙ্গালা দেশের সমাজের মানুষই ভাষারূপ পেয়েছে। সে যুগের নৈতিক অধঃপতন, বিলাসিতা, ঐহিকতা প্রভৃতি দেবচরিত্রে ছাপ ফেলেছে। হরিহোড় ও ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালার সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষই স্বীকৃতি পেয়েছে। ঈশ্বরী পাটনীর মুখ দিয়ে বাঙ্গালীর চিরন্তন কামনাটিই ব্যক্ত হয়েছে। সদ্বংশসম্ভূত কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পূর্বপুরুষ ভবানন্দের গৌরব কীর্তন প্রসঙ্গে কবি ঐতিহাসিক ঘটনা ও সমকালীন জীবনের

মিশ্রণে এক বিস্তৃত পটভূমি নির্মাণ করেছেন। যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণনা—তীর্থ বর্ণনা—বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনী বর্ণনা—কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা বর্ণনা—হর-গৌরীর সংসারযাত্রা বর্ণনা প্রভৃতির দ্বারা কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বিস্তৃতি সৃজিত হয়েছে। সমকালীন নাগরিক সভ্যতাই এই কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছে। তাই অন্নদামঙ্গল মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা জাতীয় মহাকাব্যের সমধর্মী। অবশ্য মহাকাব্যের বহিরঙ্গ রূপটি অন্নদামঙ্গলে নেই। অন্নদামঙ্গলকে কোন প্রকারেই মহাকাব্য বলা চলে না। অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত মহাকাব্যের লক্ষণ অনুসন্ধান করলে অন্নদামঙ্গলে অধিকাংশ লক্ষণই পাওয়া যাবে না। বিশেষতঃ তিনটি কাহিনীতে সংযোগের অভাব—মঙ্গলকাব্যের কাঠামো এবং মহাকাব্যোচিত নায়কের অভাব অন্নদামঙ্গলকে মহাকাব্য করে তোলেনি। অন্নদামঙ্গল মহাকাব্য বা মঙ্গলকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত হলেও এই দুটি কাব্যশাখার কোনটির মধ্যেই যথাযথ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কেউ কেউ কাব্যটিকে মঙ্গলজাতীয় মহাকাব্য বলে থাকেন।

ভারতচন্দ্রের শিল্পনৈপুণ্য

ভারতচন্দ্রের সুগভীর পাণ্ডিত্য ছিল সংস্কৃত, ফার্সী, হিন্দুস্থানী এবং বাঙ্গালা ভাষায়। কবি নিজেই লিখেছেন:

> ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক
> অলংকার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক
> পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী॥

কবির পুরাণশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের পরিচয় এই কাব্যের প্রথম অংশে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কবি একান্ন পীঠ বর্ণনায় চূড়ামণি তন্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন। কাশী প্রতিষ্ঠা ও ব্যাসকাশী নির্মাণের ব্যর্থীকরণের কাহিনী তিনি স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ড থেকে গ্রহণ করেছেন। বিদ্যা ও সুন্দরের তর্কে কবি দর্শন শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এই বিরাট পাণ্ডিত্য ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্য

রচনায় নিয়োজিত করেছেন। তিনি চার রকমের ভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে কাব্যকে সাজিয়েছেন। কবি বলেছেন :

মানসিংহের পাতশায় হইল সে বাণী
উচিত সে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী।
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥

এই বহু ভাষাবিদ্ শব্দকুশলী কবি শব্দ প্রয়োগে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। গভীর পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি বাঙ্গালা ভাষার গ্রাম্য সহজ শব্দগুলিও পরিত্যাগ না করে এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যে কবির বক্তব্য অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন প্রচুর। সংস্কৃত রীতিতে শব্দ ও অর্থালংকারও তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। বিশেষতঃ অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ অলংকার ব্যবহারে তাঁর অপূর্ব দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। উপমা, রূপক, ব্যাজস্তুতি, বিশেষোক্তি, সমাসোক্তি, তুল্যযোগিতা, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি বহুবিধ অলংকার তিনি দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। অনুপ্রাস-যমকে গ্রথিত পঙ্‌ক্তিগুলি শব্দ প্রয়োগের গুণে এমনই এক ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করে যে সেই ধ্বনির যাদুতে পাঠকের মন মুগ্ধ না হয়ে পারে না। অলংকারবহুল এবং সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষা কবির প্রয়োগ দক্ষতায় কাব্যরসের বাধা বা কাব্যের গতির ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। এই শব্দ প্রয়োগের কুশলতাই ভারতচন্দ্রের গতানুগতিক কাহিনীধারায় প্রাণসঞ্চার করেছে। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে ভারতচন্দ্রের কাব্যে শব্দের যাদুই মনকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু ভাব গভীরতা অন্তরকে স্পর্শ করে না। রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের ভাষায় রাজসভার সমারোহ—রাজকীয় আড়ম্বর। কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করলেই কবির শব্দ প্রয়োগ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। ভারতচন্দ্র বর্ণিত রতিবিলাপ :

শিব শিব শিব নাম, সবে বলে শিবধাম
বামদেব আমার কপালে।
যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে তার দৃষ্টে প্রভু মরে
এমন না দেখি কোন কালে ॥
শিবের কপালে রয়ে প্রভুর আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে অন্যের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন ॥

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রার বর্ণনা ঃ

মহারুদ্ররূপে বামদেব সাজে
ভবম্ভম্ ভবম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা ॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে দীননাথ সাজে।
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে ॥

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে ছলচ্ছল, টলট্টল ও কলক্কল শব্দ তিনটি পৃথক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে—ছলচ্ছল জলের প্রবাহ-ব্যঞ্জক, টলট্টল জলের নির্মলতা ব্যঞ্জক এবং কলক্কল জলের নিক্কণ ব্যঞ্জক।

শিবের ভোজনের বর্ণনা ঃ

পায়স পয়োধি সপ্ সপিয়া
পিষ্টক পর্বত কচমচিয়া
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া
কচর মচর ভক্ষ্য চিবিয়া

লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া

চুমুকে চক চক পেয় লিয়া ।।

বসন্ত বর্ণনা ঃ

কলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে ।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে ।
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে ।।

ভারতচন্দ্রের হাতে শব্দগ্রন্থন মন্ত্রের মত বিশেষ অর্থদ্যোতক হয়ে কাব্যে অনুরণিত হতে থাকে। জাহাঙ্গীর-মানসিংহ সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা কালে কবি প্রচুর যাবনিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দ ঝংকার সৃষ্টি করে কবি অনেক সময় কৌতুক রসও পরিবেষণ করেছেন। এমনি রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক কবির সকল রচনাতেই সর্বত্র ছড়ানো। চণ্ডী নাটকে মর্তবাসীদের প্রতি মহিষাসুরের আদেশটি উদ্ধারযোগ্য।

শোন্ রে গৌয়ার লোগ, ছেড়ে দে উপোস রোগ
মানহুঁ আনন্দ ভোগ ভৈবরাজ যোগ মে
আগমে লাগাও ঘীউ কাহেকো জ্বাল ও জীউ
এক রোজ প্যার পিউ ভোগ এহি লোগ মে ॥

হীরা মালিনীর বর্ণনাটি লক্ষ্য করার মত ঃ

কথার হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজাদোলা হাস্য অবিরাম ॥
গালভরা গুয়াপান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি ক'রে রাঁড়ী কথা কয় ছলে ॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র-মন্ত্র আসে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে যায় কত জানে ঠুলি॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কোন্দলের দায়॥

নারদের বর্ণনা—হরগৌরীর বিবাহ—হরগৌরীর কোন্দল—শিবের রূপ—নারীগণের পতিনিন্দা ইত্যাদি বর্ণনাকালে কবি প্রচুর কৌতুক রসের যোগান দিয়েছেন। এই কৌতুক রসই সমস্ত কাব্যখানিতে এক বিশেষ উজ্জ্বলতা দান করেছে। শিবের রূপ বর্ণনা কালে গৌরী বলেছেন :

গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু॥

এই বর্ণনায় ব্যাজস্তুতি থাকলেও বর্ণনাটি কৌতুককর। মহামুনি ব্যাসদেবকে নিয়েও কবি রঙ্গরস করেছেন।

দাঁড়াইলে জটাভার, চরণে লুটায় তাঁর
কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু,
পাকা গোঁপ পাকাদাড়ি, পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
চল—নে কতেক আঁটুবাটু॥

কৌতুক রস সঞ্চারের ফলেই অনেক স্থলে চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ভবানন্দের সৈন্যদলে ঝড়বৃষ্টিতে যে দুর্গতি হয়েছিল সেই দুর্গতিতে এক ঘেসেরাণী তার দ্বাদশ নম্বরের স্বামীকে হারিয়ে বিলাপ করতে করতে করুণ

রসের পরিবর্তে কৌতুক রসের বন্যা বইয়ে দিয়েছে,—নিজেকেও সে পাঠকের সামনে প্রত্যক্ষগোচর করে তুলেছে।

কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোঁসাই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই।
বৎসর পনের ষোল বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার॥
হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া।
অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া॥

ভারতচন্দ্রের বাগ্‌ভঙ্গী এমনই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে তাঁর কাব্যের বহু ছত্র প্রবাদ বাক্য হয়ে আজ ও বাঙ্গালীর মুখে মুখে ফিরছে। যেমন,—

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?
হাবাতে যগুপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।
খুলিলে মনের দ্বার না লাগে কবাট। প্রভৃতি প্রবাদগুলি ভারতচন্দ্রের কাব্যেই স্থান লাভ করেছে।

ভারতচন্দ্রের অন্যতর কীর্তি ছন্দোবৈচিত্র্য সম্পাদনে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙ্গালা কাব্যে তিনি ছন্দের যাদুকর। তিনি বহুতর সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার করে বাঙ্গালা ছন্দের সৌষ্ঠব বর্ধিত করেছেন। তিনি তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, শিখরিনী, তূণক প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে প্রচলিত বাঙ্গালা ছন্দের ব্যবহারের অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ভারতচন্দ্রের ছন্দ ব্যবহার সম্পর্কে লিখেছেন, "ভারতচন্দ্র যে সমস্ত সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় আনিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাষায় ভ্রম শূন্যভাবে গৃহীত হইয়াছে দেখিতে পাই—শব্দের মাধুর্যে তাহা অতুলনীয়, হিন্দীর ধ্বন্যাত্মক কবিতার ভঙ্গী সেগুলিতে পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুসৃত, সংস্কৃত ব্যাকরণের

নিয়ম তাহারা অণুমাত্রও লঙ্ঘন করে নাই।... ভারতচন্দ্র শুধু সংস্কৃত ছন্দগুলি নির্দোষ ভাবে বাঙ্গালায় আমদানী করেন নাই, সংস্কৃতে যাহা নাই বাঙ্গালাতে ছত্রে ছত্রে মিল দেওয়ায় নূতন গৌরব তিনি তাঁহার ভুজঙ্গপ্রয়াত ও তোটকাদি ছন্দে দিয়াছেন।" ভারতচন্দ্র পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি বাঙ্গালা ছন্দে পর্বে পর্বে মিল আছে। সংস্কৃত তূণক ছন্দেও পর্বে পর্বে মিল আছে। ছন্দের মিলে কবির বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় মেলে।

কবিমনের প্রকাশভঙ্গীর যে বিভিন্ন পথ—শব্দ, ভাব ও চিত্র,—এই তিন বিষয়েই ভারতচন্দ্রের সিদ্ধি। সর্বাপেক্ষা দক্ষতা তাঁর শব্দ প্রয়োগে ও চিত্র নির্মাণে। সুললিত এবং সুনির্বাচিত শব্দ প্রয়োগে কবি সুন্দর সুন্দর চিত্র নির্মাণ করেছেন। শব্দপ্রয়োগ-নৈপুণ্য হেতু চিত্রগুলি জীবন্ত বোধ হয়। হীরা ও ব্যাসের বর্ণনাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। ভারতচন্দ্রের বাগ্‌রীতি পরবর্তী বাঙ্গালা কাব্যে গৃহীত হয়েছে। "রীতিরাত্মা কাব্যস্য"—রীতি বা style-ই যে কাব্যের প্রাণ ভারতচন্দ্র তা কাব্যরচনায় স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর মতে, ভারতচন্দ্রের রচনাশৈলী ফরাসী মেজাজের অনুরূপ। রায়গুণাকরের শব্দ ব্যবহারের দক্ষতার দিকে লক্ষ্য রেখেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "রাজসভার কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলগান রাজকণ্ঠে মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।" বাস্তবিকই ভাষার কারুকার্যে ভারতচন্দ্র মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা কাব্যে দ্বিতীয় রহিত। শব্দ, চিত্র, ছন্দ ও প্রয়োগকুশলতার সমন্বয়ে ভারতচন্দ্র কাব্যের একটি অখণ্ড বাণী মূর্তি নির্মাণে সমর্থ হয়েছেন।

রসের ক্ষেত্রে আদিরসের বর্ণনাতেই কবি সিদ্ধহস্ত। কৌতুকরসের বর্ণনাতেও তিনি নিপুণ। করুণ বীর প্রভৃতি রস তেমন পরিস্ফুট হয়নি। চরিত্র-চিত্রণেও ভারতচন্দ্রের দক্ষতা প্রকাশ পায় নি, মানুষগুলি যেন নিষ্প্রাণ। বাগাড়ম্বরের আড়ালে মানুষগুলির প্রাণসত্তা চাপা পড়ে গেছে। তবু হীরামালিনী, ঈশ্বরী পাটনী, মেনকা প্রভৃতি কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র

জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরী পাটনীই একমাত্র মানুষ যা বাঙ্গালা দেশের সমাজে প্রত্যক্ষগম্য বাস্তব চরিত্র। জীবনের গভীরতম তলদেশের বিচিত্র ভাবরাশির চিত্রণ অপেক্ষা লঘুচপল দিকটির প্রতিই কবি অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন। কোন উচ্চতর আদর্শ,—কোন মহৎ চরিত্র, দেবতার কোন উচ্চতর মহিমা ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায় না। কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন, "ভারতচন্দ্র গভীর ভাবের বা নিবিড় রসের কবি নহেন। ইঁহার কাব্যে আবেগের আতিশয্য নাই, বরং দীনতাই আছে। ইনি প্রধানতঃ রতিরস ও রঙ্গরসের কবি। চারিপাশের রসিক লোকদের মনোরঞ্জন ছাড়া ইঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মুখ চাহিয়া তিনি লেখেন নাই।" এতৎ সত্ত্বেও কবি ভারতচন্দ্রের ছন্দ, অলংকার, মিশ্রিত ভাষার যথোপযুক্ত প্রয়োগ ও কৌতুকোজ্জ্বল চিত্র অংকন-নৈপুণ্য সম্বন্বিত বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গী উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে এবং বাঙ্গালা ভাষাকে এক বিশেষ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতচন্দ্রের বাগ্‌ভঙ্গীর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত :

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামর ছটা তামার শলা বুড়ার জটা।
তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী দেখে আসে জর লো॥

ভাষার এই আশ্চর্য কারুকার্যের জন্যই ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের চরিত্র ঃ

মঙ্গলকাব্যগুলি দেবমহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হওয়ায় দেবতার লীলাবিলাসই এখানে প্রাধান্য লাভ করে। লৌকিক কাহিনীতে মানব চরিত্র প্রাধান্য পেলেও দেবখণ্ড ও নরখণ্ডে দেবচরিত্রও উপেক্ষিত হয় নি। তবে মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে দেবচরিত্রের মহিমা খর্বীকৃত হয়ে মানবীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লাভ

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

করে। কিন্তু যে ভয়মিশ্রিত ভক্তি মঙ্গলকাব্যগুলির প্রেরণাস্বরূপ হয়ে থাকে ভারতচন্দ্রের কাব্যে তা প্রায় অনুপস্থিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে অন্নদার মহিমাকীর্তন করা হয়েছে প্রধানতঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে। দেবমহিমা কীর্তন অপেক্ষা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশগৌরব কীর্তনই কবির অধিকতর মনোযোগের বিষয় হয়েছিল। যুগধর্মের প্রভাবে চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে ভারতচন্দ্রের কাব্যে সন্তানবৎসলা জননীতে পরিণত হয়েছে। অসাধারণ শব্দশিল্পী কৌতুকপ্রিয় কবি তাঁর শিল্পচাতুর্যের সঙ্গে কৌতুকপ্রিয়তা মিশ্রিত করে দেবচরিত্র বর্ণনা করায় দেবচরিত্রগুলি কেবলমাত্র যে মর্তের ধূলামাটীর মানব চরিত্রে পরিণত হয়েছেন তা নয়, তাঁরা অনেক সময় রঙ্গব্যঙ্গেরও পাত্র হয়েছেন। দেবমহিমা সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হয়েছে; তৎস্থলে নির্মিত হয়েছে বাঙ্গালা দেশের সমাজের প্রত্যক্ষদৃষ্ট মানব-চরিত্র। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "মুকুন্দরাম দেবতাকে মানুষ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র দেবতাকে নট নাচাইয়াছেন।" ভারতচন্দ্রের কাছে রচনাশৈলী (style) কাব্যের আত্মারূপে গৃহীত হওয়ায় কবি চরিত্রসৃষ্টির দিকে মনোযোগ দিতে পারেন নি। তাঁর কাব্যে দেব বা মানব চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে নি। অধিকাংশই ছাঁচে ঢালা নিষ্প্রাণ type চরিত্রে পরিণত হয়েছে। তথাপি কবি যে স্থানে স্থানে জীবনরস সঞ্চার করেছেন,—একথাও অস্বীকার করার নয়। শিব, মেনকা, নারদ, ব্যাসদেব, উমা প্রভৃতি দেবদেবী চরিত্রগুলি বাঙ্গালী সমাজে অপরিচিত নয়। তবে কবি দেবতাদের নিয়ে যে রঙ্গরস জুড়েছেন তাতেও সন্দেহ নেই। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "রাজসভার বিদগ্ধ কবি দেবতাদের সঙ্গে রঙ্গকৌতুক জুড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণনগরের রাজপথে বাহির করিয়াছেন—তাঁহারা অনেকটা ঘরের মানুষ হইয়া পড়িয়াছেন।"

ভারতচন্দ্রের কাব্যে শিব বৃদ্ধ—তাঁর মাথায় জটা। সর্বাঙ্গে সাপ, পরিধানে বাঘছাল, গায়ে ছাইমাখা। তিনি সতীর দক্ষালয় গমনকালে 'মহাভয়ে কম্পমান হন'—সতী দক্ষালয়ে

শিব

প্রাণত্যাগ করলে রুদ্ররূপ ধারণ করেন—তাঁরই ক্রোধে মদনদেব ভস্মীভূত হন,—আবার তিনিই কামবাণে চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে
বিকল হইয়া নারী তলাসিয়া
ফিরে সকল স্থানে।
কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্‌সর
কিন্নরী দেবী সকল
যায় পলাইয়া পশ্চাতে তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল॥

তিনিই আবার কুচনীর বাড়ী গমন করেন। বুড়ো ষাঁড়ের পিঠে চেপে শিব চললেন বিবাহে। স্ত্রী-আচার কালে গরুড়ের উপস্থিতিতে সর্পকুল পালিয়ে গেলে নির্বিকার শিব দিগম্বর হয়েই সকলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। ভারতচন্দ্র স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রিয়তার সঙ্গে এই দৃশ্য বর্ণনা করেছেন।

গরুড় হুঙ্কার দিয়া উত্তরিলা গিয়া
মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া।
বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হইল হর
এয়োগণ বলে ও মা এ কেমন বর॥
মেনকা দেখিয়া চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা॥
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই॥
দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়।
শিব ভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়॥

এই শিব আবার সিদ্ধি খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকেন।

মহাদেব আঁখি ঢুল ঢুল
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি হৈল স্থূল ॥
নয়নে ধরিলে রঙ্গ অলসে অবশ অঙ্গ
লটপট জটাজুট গঙ্গা হুলুথুল ॥
খসিল বাঘের ছাল আলুথালু হাড়মাল
ভুলিল ডমরু শিঙ্গা পিণাক ত্রিশূল ॥

গৌরীর সঙ্গে কোন্দলেও তিনি পিছপা হন না ভিক্ষায় বেরিয়ে তিনি ঘরে ঘরে চেতনা বিতরণ করেন ঃ

চেতরে চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ।
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচিত্তচিত্ত সেই সদা দুখী ॥

কিন্তু ভিখারী শিবকে দেখে ছেলেরা গায়ে ধূলাবালি নিক্ষেপ করে—নানাভাবে রঙ্গকৌতুক করে।

দূর হইতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা ॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥
কেহ বলে জটা হইতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল ॥
কেহ বলে ভাল করে শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও ॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া ॥

কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুলফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥

শিবের এই যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন, তাতে কোথাও দেবত্ব প্রকাশিত হয়নি। এই চরিত্রটির সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের সাপুড়ে বেদে চরিত্রের মিল সুস্পষ্ট। কবি পৌরাণিক দেবতার মহিমা কীর্তন না ক'রে তাঁর চারিদিকে যেসব মানুষ দেখেছেন তাদের চরিত্রই এঁকেছেন দেবচরিত্রের বেনামীতে।

উমা

ভারতচন্দ্রের উমা—অন্নদা—অন্নপূর্ণা—ভক্তবৎসলা দেবী। কিন্তু শিবকে নিয়ে 'নরলীলায়' তাঁর বাস্তব মানবী মূর্তিই জীবন্ত হয়ে ওঠে। শিবের স্বরূপ তিনি জানেন। তাই দিগম্বর বৃদ্ধ শিবকে জামাতারূপে দেখে যখন মা মেনকা নারদের সঙ্গে কোন্দল জুড়ে দেন তখন "হেঁট মুখে মৃদুমন্দ হাসেন পার্বতী"। গৌরী-পরিণয়ের পরে শিব যখন গৌরীকে পুনরায় হারাবার আশংকায় 'এক তনু' হয়ে থাকবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন, তখন গৌরী বিনা সংকোচে স্বামীর চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করেন:

নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনী বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥

শিবের সঙ্গে কোন্দলেও তিনি পিছপা হন না। ঘরে দারিদ্র্য—স্বামী ভিখারী বৃদ্ধ—পুত্র দুটি কুরূপ এবং অকর্মা। তাই উমার সংসারে শান্তি নেই—ক্ষোভের অন্ত নেই। যে বুড়া স্বামী নিয়ে তাঁর ঘরসংসার, তাঁর সম্বল যা তা হাসির উদ্রেক করে। পার্বতী শিবকে বলছেন:

গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
দিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধ লাড়ু॥

দরিদ্রের সংসারে পুত্র দুটিও তাঁর সুখের কারণ নয়। বড় ছেলে গজানন বাপের মতই গুণবান—উপরন্তু তাঁর বাহন ইঁদুরে দারিদ্র্য বাড়ায়।

বড় পুত্র গজ মুখে চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ভিক্ষা মাগি খুদ কণা যা পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর॥

আর ছোট ছেলেটি? সে বড়রও বাড়া।

ছোট পুত্র কার্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূর লড়ায়॥

সুতরাং পার্বতীর দুঃখের আর অন্ত নেই। তাঁর মাথায় তেল সিন্দুর জোটে না—হতে শাঁখা থাকে না।

করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেঁটে বেঁটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবলা আচাভূয়া॥

হর গৌরীর এই বর্ণনায় বাঙ্গালী সমাজের চিরন্তন গার্হস্থ্য চিত্রটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। দরিদ্রের সংসারে বৃদ্ধ পতির দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যায় দাম্পত্য জীবনচিত্র নিখুঁতভাবে অংকিত হয়েছে। অন্নপূর্ণারূপে তিনি জননী স্বরূপিনী। তবে ব্যাস ছলনাকালে তাঁর রূপবর্ণনাটি কৌতুকের উদ্রেক করে। এখানে তিনি গলিত চর্ম অতি বৃদ্ধা এক দুঃস্থা নারীতে পরিণত হয়েছেন।

ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নিকি করে ইলিবিলি।
কোটি কোটি কানকোটারী করে কিলি কিলি।

কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে ॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে ॥
বাতে বাঁকা সর্ব-অঙ্গ পিঠে কুঁজ ভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি-চর্ম সার ॥

পার্বতী জননী মা মেনকা বাঙ্গালা দেশের গ্রামের মেয়ের মা। সুন্দরী মেয়ের বুড়ো বর দেখে মেয়েব মায়ের যে অবস্থা হয়, তাই সুন্দর রূপে বর্ণিত হয়েছে মেনকার চরিত্রে। জামাই বরণ কবতে গিয়ে বুড়ো জামাইকে উলঙ্গ দেখে শাশুড়ীর লজ্জার সীমা নেই।

মেনকা

মেনকা দেখিয়া চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা ॥

তারপর মেনকা ঘরে গিয়ে বিবাহের ঘটক নারদ মুনিকে হাত নেড়ে যা বলেছেন তা একমাত্র বাঙ্গালী শাশুড়ীর পক্ষেই সম্ভব।

ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়।
হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয় ॥
ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলে চক্ষু খেয়ে ॥

তারপরে গিরিরাণী চোখের জলে ভেসেছেন, মেয়ের সঙ্গে জামাইএর তুলনা করে করুণ বিলাপ করেছেন।

"কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।"

আবার,

ফুকারিয়া ফুকারিয়া মেনকা কহিছে।
আহা মরি ও মা উমা সোনার পুতুল ॥'
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল।

পায়ে পড়ে আমার উমার কেশ পাশ।
বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ ॥

তারপরে শিব যখন মোহন বেশ ধরলেন, তখন

"মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই।"

মেনকা চরিত্রটিকে কবি নিতান্তই type চরিত্র না করে জীবনরসে পূর্ণ মানবী রূপেই চিত্রিত করেছেন।

নারদ চরিত্র পুরাণেও কলহপরায়ণ। অন্নদামঙ্গলে নারদ শুধু কুঁদুলে নয়—

নারদ

নারদ যেন একটা ভাঁড়। বুড়ো বর দেখে যখন মেনকা ব্যাকুল হয়ে আক্ষেপ করছেন এবং নারদকে তিরস্কার করছেন তখন "নখে নখে বাজায়ে নারদ মুনি হাসে।" নারদ সম্পর্কে কবি বলছেন,

কোন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকি।
আঁকশলী পোয়া সোনা গলে মেকামেকি ॥
পাখা নাই তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায়।
কোণের বহুড়ী লয়ে কোন্দলে জড়ায় ॥

বিবাহসভায় বহু স্ত্রীলোক একত্র হয়েছে দেখে নারদ কলহ বাধাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যেভাবে মন্ত্র পড়ে নারদ কোন্দলকে আহ্বান করেছেন তা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

সেই ঢেঁকি চড়ে মুনি কান্ধে বীণাযন্ত্র ;
দাড়ি লড়ে ঘন পড়ে কোন্দলের মন্ত্র ॥
আয় রে কোন্দল তোকে ডাকে সদাশিব।
মেয়েগুলা মাথা কোঁড়ে তোরে রক্ত দিব ॥
বেনাঝোড়ে ঝুঁটি বান্ধি কি কর বসিয়া।
এয়ো স্থয়ো এক ঠাঁই দেখ রে আসিয়া ॥

ঘুরুলে বাতাস ল'য়ে জলের ঘুরুলে।
সেহাকুল কাঁটা হতে ঝাঁট এসো চলে ॥
এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়।
দোহাই চণ্ডীর তোরা আয় আয় আয় ॥

ভারতচন্দ্রের এই ভাঁড়রূপী নারদ কতকটা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নারদের সমতুল্য।

কবি ব্যাসদেবকেও বৈষ্ণব ভাঁড়রূপে চিত্রিত করেছেন। যদিও তিনি ব্যাসকে বলেছেন "নারায়ণ অংশ ঋষিগণ অবতংশ", তথাপি ব্যাসদেবের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তাতে বেদব্যাসের মহিমা খর্বীকৃত হয়েছে।

ব্যাসদেব

দাঁড়াইলে জটাভার চরণে লুটায় তাঁর
কক্ষ লোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকা গোঁফ পাকা দাড়ি পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
চলনে কতেক আঁটু বাঁটু ॥
কপালে চড়ক ফোঁটা গলে উপবীত গোটা
বাহু মূলে শঙ্খচক্র রেখা।
সর্বাঙ্গে শোভিত ছাবা কলি মৃগ বাঘ পাবা
সারি সারি হরিনাম লেখা।

ব্যাসদেব হরিভক্ত,—দেবী অন্নপূর্ণারও ভক্ত; কিন্তু শিব-দ্বেষী। কাশীতে ভিক্ষা না পেয়ে তিনি অভিশাপ দিলেন:

কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ।

অবশেষে ব্যাসদেব পৃথক কাশী নির্মাণের সিদ্ধান্ত করলেন এবং অন্নপূর্ণার ছলনায় তা বিনষ্ট হয়ে গেল। অন্নপূর্ণার কৌশলে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে ব্যাস বললেন, "গর্দভ হইবে বুড়ি এখানে যে মরে।" ব্যাসদেবের এই অধীরতা তাঁকে অতি সাধারণ মানবের পর্যায়ে টেনে এনেছে। চরিত্রগুলির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার না হলেও এবং চরিত্রগুলিতে পৌরাণিক মহিমা ক্ষুণ্ণ হলেও

কবি নির্লিপ্তভাবে অল্প কথায় চরিত্রগুলিকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে পেরেছেন। এইখানেই ভারতচন্দ্রের মৌলিকতা ফুটে উঠেছে।

মানসিংহ কাব্যে ভবানন্দের চরিত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা লক্ষিত হয় না। ভবানন্দ দেবীর আশ্রিত এবং কৃপাপুষ্ট। তিনি মানসিংহকে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সহায়তা করেছেন। এই হিসাবে তাঁকে দেশদ্রোহী বলা বলে। কিন্তু ভারতচন্দ্র ভবানন্দের গৌরব কীর্তন করেছেন। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে দেশপ্রেম এ দেশে দানা বেঁধে ওঠে নি। তাই কবিকে দোষ দেওয়া যায় না। ভবানন্দের বীরত্বের পরিচয় ও কাব্যে নেই। তবে ভবানন্দ বাকৃপটু এবং স্পষ্টবক্তা। জাহাঙ্গীরের সামনে স্পষ্ট ভাষণ তাঁর চরিত্রকে কতকটা উজ্জ্বল করেছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ যখন হিন্দুধর্মের নিন্দা করলেন তখন ভবানন্দ সহ্য করতে না পেরে সম্রাটের মুখের উপর বললেন :

ভবানন্দ

দেব-দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়।
স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায়॥
উত্তম হিন্দুর তাহে বুঝে ফের।
হায় হায় যবনের কি হবে আখের॥

অপর দুটি চরিত্র হরিহোড় এবং ঈশ্বরী পাটনী। দুজনেই দেবীর কৃপা পেয়েছে। হরিহোড়ের ঘুঁটে সোনার ঘুঁটে হয়েছে—আর পাটনীর সেঁউতি সোনার হয়েছে। তবে হরিহোড়ের চরিত্রের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি। কিন্তু ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্র জীবন্ত। যদিও ঈশ্বরী পাটনীর পূর্ণাঙ্গ চরিত্র চিত্রণের সুযোগ এই কাব্যে ছিল না তথাপি ঈশ্বরীর মাত্র দু'চারটি কথাতেই একটি বাস্তব জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বরী সুন্দরী নারী দেখে অন্নদাকে নদী পার করতে চায় নি। দেবীর দ্ব্যর্থক ভাষায় পরিচয় পেয়ে সে বুঝেছে : "যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।" আবার অন্নদার প্রকৃত

হরিহোড়

ঈশ্বরী পাটনী

পরিচয় পাওয়ার পর সে বর চেয়েছেঃ "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অন্তরস্থ কামনাই এই কথায় ব্যক্ত হয়েছে। এই চরিত্রটিতে কবির জীবনরসিকতার পরিচয় পাই।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্র গতানুগতিক ও কৃত্রিম। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন, "সুন্দরকে কবি বিদ্যা ও সৌন্দর্য দিয়া গড়িয়াছেন,—রক্তমাংসের দেহ সে পায় নাই।" কিন্তু অপ্রধান চরিত্রগুলিতে কবি কিছু কিছু বিশিষ্টতা আরোপ করেছেন। হীরা মালিনী, ধূমকেতু কোটাল ও বিদ্যার মাতার চরিত্র কতকটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। নাগর নাগরীদের হাবভাব, রাজপুরুষ, কোটাল ও তার লোকজন কতকটা জীবন্ত। জীবন সম্পর্কে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই অপ্রধান চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে।

বিদ্যা ও সুন্দর

অপ্রধান চরিত্র

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অশ্লীলতা ঃ

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে দেহভোগের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তাই অনেকে ভারতচন্দ্রের কাব্যকে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলে নিন্দা করে থাকেন। মধ্যযুগের বাঙ্গালা কাব্যে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে সমস্ত মঙ্গলকাব্যে দেহসম্ভোগের বর্ণনা নূতন নয়—আদিরসের বাড়াবাড়িও অভিনব কিছু নয়। বিদ্যাসুন্দর কাব্যকাহিনীর স্রষ্টা ভারতচন্দ্র নন, আবার অনেক কবিই বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেছেন। বিদ্যাসুন্দরের সম্ভোগ বর্ণনা সকল কবিই করেছেন। ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে তিনি ছন্দে, অলংকারে, বর্ণনাচাতুর্যে অশ্লীল বর্ণনাকে শিল্পসম্মত করে তুলেছেন। তাই কুৎসিত আদিরসাত্মক বর্ণনাও প্রতিভাবান কবির হাতে শিল্পশ্রী লাভ করেছে। প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা সম্পর্কে লিখেছেন, "ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতরে art আছে, অপরের শুধু nature." বাস্তবিকই বিদ্যাসুন্দরের অন্যান্য কবিরা

অশ্লীলতাকে art এ পরিণত করতে পারেন নি। ভারতচন্দ্রের হাতে দেহভোগ বর্ণনা আদিরসে পরিণত হয়েছে, গ্রাম্যতা' দোষে পরিণত হয় নি। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "বিদ্যাসুন্দরের রুচিঘটিত প্রশ্ন মুলতুবি রাখিয়া একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে রায়গুণাকরের হাতে পড়িয়া মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা ভাষায় যৌবনের রূপ রঙ ও রস অপূর্ব দীপ্তি ধারণ করিয়াছে।" আরও লক্ষণীয় এই যে, বিদ্যাসুন্দর ভিন্ন অন্যত্র অর্থাৎ অন্নদামঙ্গলে এবং মানসিংহ কাব্যে দেহঘটিত ব্যাপার কেন, আদিরসের বর্ণনাই ভারতচন্দ্র দেন নি এমনকি হর-পার্বতীর লৌকিক কাহিনীতে শিবের কুচনী সম্পর্কে ইঙ্গিতে মাত্র ব্যক্ত করেছেন। কবির সংযম এবং সংকোচ এ ক্ষেত্রে উপলব্ধি করা যায়। তাই ভারতচন্দ্রের কাব্যে অশ্লীলতা সম্পর্কে মন্তব্য করার পূর্বে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন।

ভারতচন্দ্রের গীতিকাব্য ঃ

ভারতচন্দ্র বর্ষা, বসন্ত, হাওয়া, বাসনা, ধেরে ও ভেড়ে রাধাকৃষ্ণের উক্তি, বলিরাজার উপাখ্যান প্রভৃতি কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা লিখেছেন। এগুলিকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর গীতিকবিতা বলা চলে না। তথাপি বাঙ্গালা গীতিকবিতার বীজ এখানেই বপন করা হয়েছে। হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় এগুলির প্রভাব আছে। বাঙ্গালা কাব্যে হাওয়া বদলের ইঙ্গিত এই কবিতাগুলির মধ্যে আছে, কবিতাগুলি মণ্ডনকলায় সমৃদ্ধ। বাক্-চাতুর্য ও মণ্ডনকলা পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে যতটা সজাগ করে, হৃদয়ে ততটা আবেদন সৃষ্টি করে না। এই কবিতাগুলি ছাড়াও অন্নদামঙ্গলে—বিশেষতঃ অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ছোট ছোট গান সংযুক্ত হয়েছে। বিদ্যাসুন্দরের গীতিময়তা সুস্পষ্ট। গতানুগতিক আখ্যায়িকার মধ্যে গীতি-সুর কাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে এবং কাব্যটিকে চিত্তহারী করে তুলেছে।

ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম

ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম মঙ্গলকাব্যের দুই শক্তিধর কবি। মুকুন্দরাম

ভারতচন্দ্র অপেক্ষা দুই শত বৎসরের পূর্ববর্তী। পশ্চিম বঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-ধারায় মুকুন্দরামকে আদি কবি বলা যায়। ভারতচন্দ্রকে মঙ্গলকাব্যের ধারার শেষ কবি বলা চলে। মঙ্গলকাব্য রচনায় যে দীপ্তালোক মুকুন্দরাম বিকীর্ণ করেছিলেন,—তা পৌনঃপুনিক ব্যবহারের ফলে গতানুগতিকতায় স্তিমিত প্রায় হয়ে এসেছিল,—মহাশক্তিধর কবি ভারতচন্দ্র শেষবারের মতন নির্বাণোন্মুখ আলোকবর্তিকাকে উজ্জলতম করে তুলেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতারা কেউই মুকুন্দরামের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেন নি। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতচন্দ্রের উপর মুকুন্দরামের প্রভাব পড়েছে। প্রতিভাবান কবি ভারতচন্দ্র শুধু মুকুন্দামের চণ্ডীমঙ্গল কেন, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, রামেশ্বরের শিবায়ন, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল প্রভৃতি থেকেও ঋণ গ্রহণ করে স্বীয় প্রতিভাব গুণে স্বীকরণ করে নিয়েছেন। ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের কাছেই সর্বাপেক্ষা ঋণী। ভারতচন্দ্রের কাব্যের 'অন্নদামঙ্গল' অংশের কাহিনী মুকুন্দরামের দেবখণ্ডের অনুস্মৃতি। শুধু কাহিনী নয়—স্থানে স্থানে ভাষা ব্যবহারেও ভারতচন্দ্রের কাব্যে চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু সাদৃশ্য অপেক্ষা দুইটি কাব্যে বৈসাদৃশ্যই বেশী। দুই কবির দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক পার্থক্য। মুকুন্দরামের কাব্যে দেবতার প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং ভীতিমিশ্রিত ভক্তি স্থায়ী প্রেরণার কাজ করেছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেবতায় বিশ্বাস বা ভক্তি তেমন পরিস্ফুট নয়। কবি দেবতাদের নিয়ে যেন রঙ্গরস করেছেন। বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্যই এই যে দেবতাকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে এনে মাটির মানুষের ধর্ম আরোপ করা হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেবচরিত্রে শুধু মানবত্ব আরোপিত হয়েছে তাই নয়, আমাদের চতুর্দিকের পরিচিত মানুষগুলিই যেন দেবভাব ছদ্মবেশে আবির্ভূত হয়েছে। যুগধর্মের প্রভাবেই দেবচরিত্রের এই পরিণতি ঘটেছে। মুকুন্দরামের আমলে পাঠানশাসনের অবসান ও মোঘলশাসন প্রতিষ্ঠার সূচনাকালে বাঙ্গালা দেশের সমাজ জীবনের বিপর্যয় এবং স্থানীয় শাসকবর্গের অত্যাচারে প্রজা-

পুঞ্জের দুর্গতির সময়ে দেবতার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা স্বাভাবিক ছিল। ভারতচন্দ্রের সময়ে মোঘলশাসনের বিলোপ—নবাবীশাসন—বর্গীর হাঙ্গামা ও ইংরাজ শাসনের জন্মলগ্নে ও দেশে বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাবের সময়ে নবাবী স্বৈরাচার ও মুর্শিদাবাদের দরবারী জাঁকজমক ও বিলাসিতা—জমিদারদের বিলাসব্যসন ও আড়ম্বর দেবতার সম্পর্কে মানুষকে নিস্পৃহ অথবা সংশয়াপন্ন করে তুলেছে। দেবতা তাই বঙ্গব্যঙ্গের পাত্র হয়েছেন। যুগধর্মের প্রভাব উভয় কাব্যেই প্রতিফলিত।

রাজনৈতিক কারণে দুই কবিই প্রচুর দুঃখকষ্ট পেয়েছিলেন। দুজনেই জমিদারের আশ্রয়লাভে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। বাঁকুড়া রায়ের এবং রঘুনাথ রায়ের রাজসভা ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায়—যুগগত রুচি এবং আদর্শের যে পার্থক্য ছিল—তাই দুই যুগের দুটি কাব্য প্রতিফলিত হয়েছে। মুকুন্দরাম স্বীয় জীবনে যে দুঃখকষ্ট পেয়েছিলেন তা তাঁর কাব্যে বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা কবিকে নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকায় স্থাপন করে কৌতুকপ্রবণ করে তুলেছে। কবি যাবতীয় ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনায় গভীর সহানুভূতি-জাত কৌতুক মিশ্রিত করে কাব্যকে কৌতুক-রসোজ্জ্বল করে তুলেছেন। গভীর সহানুভূতি ও স্নিগ্ধ কৌতুকের সঙ্গে সমাজ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করা এবং চিত্রিত করাতেই মুকুন্দরামের বিশিষ্টতা। এইরূপ কৌতুকের সংমিশ্রণে তৎকালীন সমাজজীবনকে মুকুন্দরাম পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করেছেন ঐতিহাসিকের নিষ্ঠায়। সমকালীন দেশকালের বর্ণনা ভারতচন্দ্রও দিয়েছেন। আলিবর্দির শাসনকালে মহবতজঙ্গের অন্যায় দাবীতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বন্দীত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র তাঁর সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। হরগৌরীর বিবাহ ও সংসারযাত্রা—ঈশ্বরী পাটনী ও অন্নদার কথোপকথন—কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা প্রভৃতি বর্ণনা কালে ভারতচন্দ্র তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের পরিচয় দিয়েছেন। তবে মুকুন্দরামের কাব্যে যেমন বাঙ্গালী সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাই—ভারতচন্দ্রের কাব্যে

তেমন পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাই না। সহানুভূতিপূর্ণ সরস humour এর পরিবর্তে ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনাভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। অবশ্য কৌতুকরসের অভাব নেই ভারতচন্দ্রের কাব্যে। কবির জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ অপ্রধান ছোট ছোট চরিত্রে কিছু কিছু থাকলেও সামগ্রিকভাবে সমস্ত কাব্যটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেনি। ভারতচন্দ্রের কাব্যে নাগরিক সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রকে প্রকৃতই রাজসভার কবি বলা যায়। চরিত্র-চিত্রণে মুকুন্দরামের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। মুকুন্দরামের বর্ণিত অধিকাংশ চরিত্রই জীবন্ত—জীবনরসে ঝলমল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে চরিত্রগুলি অধিকাংশই প্রাণহীন type চরিত্র। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের কাঠামোটি মাত্র গ্রহণ করে নিজের শিক্ষাদীক্ষা এবং যুগরুচি অনুসারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর রাজসভার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে লিখেছেন 'নতুন মঙ্গল'। দেবমাহাত্ম্য কীর্তন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না—ছকে বাঁধা কাহিনী ও তাই তিনি গ্রহণ করেন নি। পলাশীর যুদ্ধের সমকালীন কবি হয়েও তাই তাঁর কাব্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক সংকটের সম্যক ছাপ পড়েনি—রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনাও কবি বিস্তৃত ভাবে দেন নি। কবির নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাও তাই কাব্য মধ্যে অভিব্যক্তি পায় নি।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র উভয়েই ছিলেন পণ্ডিত। মুকুন্দরাম ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাই তাঁর কাব্যে পৌরাণিক কাহিনী ও পৌরাণিক আবহাওয়া একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। ভারতচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃত হিন্দী ফার্সী ও বাঙ্গালায় সুপণ্ডিত। এই বহুভাষাবিদ কবি বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে কাব্যসরস্বতীকে মনের মতন করে সাজিয়েছেন। মুকুন্দরাম আন্তরিকতা সহকারে কাব্যসরস্বতীর প্রাণ সঞ্চার করেছেন আর ভারতচন্দ্র মনের সাধ মিটিয়ে দেবীকে বহু মূল্য অলংকার ও পোষাকে সজ্জিত করেছেন। শব্দ অলংকার ও ছন্দ বিন্যাসের সুকৌশলে গঠিত বিশেষ বাগ ভঙ্গী ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রাণ। যে

জীবন রস ও বাস্তব রস মুকুন্দরামের কাব্যকে অসামান্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার ছিটে ফোঁটা থাকলেও ব্যাপকতা নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের গঠনকৌশল বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ করে—মনকে সচকিত করে তোলে। আর মুকুন্দরামের কাব্যের আন্তরিকতা সকৌতুক জীবনরসোচ্ছলতা পাঠকের অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করে। একজন রূপে চোখ ধাঁধান—আর একজন গুণে মন ভোলান। মুকুন্দরামের বর্ণনা সহজ ও সরল—ভাষায় আলংকারিকতা থাকলেও তা উৎকট রূপে কোথাও আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে নি। দেহসম্ভোগের বিবরণ মুকুন্দরামের কাব্যেও কিছু পরিমাণে আছে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে আছে বিস্তৃত ভাবে; কিন্তু ভারতচন্দ্র তাঁর রচনা-গুণে সম্ভোগ বর্ণনাকে উচ্চ শিল্পের পর্যায়ভুক্ত করতে পেরেছেন। বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ শব্দশিল্পী ভারতচন্দ্র। স্বর্গীয় মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম সম্পর্কে, "গুণাকর পত্রে পত্রে কবিকঙ্কনের নিকট ঋণী। কবিকঙ্কনের কবিত্ব পত্রে পত্রে নকল করিয়াছেন, কবিকঙ্কনের স্বাভাবিক সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। কবিকঙ্কনের কাব্য সরল, স্বাভাবিক ও সুখপাঠ্য; গুণাকরের কাব্য অধিকতর সুললিত, কিন্তু অস্বাভাবিক এবং স্থানে স্থানে অপাঠ্য।" রমেশচন্দ্র ভারতচন্দ্রের উপর কিঞ্চিৎ অবিচার করেছেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের দেবখণ্ড থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্য মুকুন্দরামের কাব্যের পত্রে পত্রে অনুকরণ—একথা বলা যায় না। আদিরসের বর্ণনা ভারতচন্দ্র একটু বিস্তৃত ভাবে করেছেন বটে, তবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে সর্বত্রই আদিরসের বাহুল্য আছে; বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ত আছেই। তদুপরি ভারতচন্দ্রের যুগের রুচিও এজন্য দায়ী। কিন্তু 'অন্নদামঙ্গল' অংশে অশ্লীলতার কোন গন্ধও পাওয়া যায় না।

মঙ্গলকাব্যগুলি যখন প্রাণহীন প্রথানুবর্তিতায় মাত্র পর্যবসিত হয়েছিল

তখন অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ভারতচন্দ্র বুঝেছিলেন যে ছন্দানুবর্তিতার মধ্যে বাঙ্গালা কাব্যের মুক্তি নেই। গতানুগতিকতার পুনরাবৃত্তিতে আর যাই হোক প্রতিভার বিকাশ সম্ভব নয়। তাই তিনি মুকুন্দরামের অনুকারী হয়েও আপনার স্বতন্ত্র বিশিষ্টতায় আজও বিশেষ স্থানের অধিকারী। মঙ্গলকাব্যের যে যুগের সূচনা হয়েছিল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ষোড়শ শতক থেকে, তারই একটি শিল্পসম্মত পরিণত রূপ পাওয়া গেল ভারতচন্দ্রের হাতে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তিটি এই প্রসংগে স্মরণীয়ঃ "ভারতচন্দ্রের মধ্যে একটি যুগ আসিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার কাব্যসৃষ্টির উপকরণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে তাহাদের মধ্যে সুদীর্ঘ একটি যুগের সাহিত্য সাধনার বহু উপাদানের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করা যাইবে। ভারতচন্দ্র যুগস্রষ্টা নহেন, বরং যুগেরই সৃষ্টি। তাঁহাকে লইয়া একটি যুগ আরম্ভ হয় নাই, বরং তাঁহার মধ্যে একটি যুগ পরিণতি লাভ করিয়াছে।"

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ প্রায় সমকালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—তাঁরা নিকটবর্তী অঞ্চলেই বসবাস করতেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। দুই প্রতিভাবান কবিই বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। সমকালে এবং সমযুগে এবং সমান পরিবেশে বর্তমান থাকলেও দুই কবির মানসভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। রামপ্রসাদ ছিলেন কালীসাধক এবং ভক্ত। সাধকের দৃষ্টি তাঁর কালিকামঙ্গলেও প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু রাজসভার বিদগ্ধ কবি ভারতচন্দ্র ভক্ত ছিলেন না। ভক্তের দৃষ্টিও তাঁর ছিল না; অন্ততপক্ষে তাঁর কাব্যে ভক্তিভাবের পরিচয় নেই। ভারতচন্দ্র প্রকৃত শিল্পীর মত নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিচিত্র আভরণে বঙ্গসরস্বতীকে সাজিয়েছেন। রামপ্রসাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করলেও রাজসভা অলংকৃত করেন নি। ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজসভার অলংকার। রাজসভার জৌলুষ তাঁর রচনায় সর্বত্র।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নাম কবিরঞ্জন। কবির শ্যামাভক্তি কাব্য মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। ভণিতাতেও কবি ইষ্টদেবতার উল্লেখ করেছেন। রামপ্রসাদের বিদ্যা ও সুন্দর শাপভ্রষ্ট দেবদেবী,—কালিকার পূজা প্রচারের জন্যই তাঁদের মর্তলোকে আবির্ভাব। সুতরাং বিদ্যা ও সুন্দর গোড়া থেকেই কালিকার সেবিকা ও সেবক। বিদ্যা সুন্দরকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য কালিকার স্তব করেছে। সুন্দর বর্ধমান যাত্রার পূর্বে যেমন দেবীকে স্মরণ করেছে, বিদ্যার কক্ষে প্রবেশের পূর্বেও তেমনি দেবী বন্দনা করেছে। কাব্যের শেষে তন্ত্রসাধক কবি সুন্দর কর্তৃক তন্ত্রাচারে শবসাধনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। সুন্দরের শবসাধনার বিবরণ কাব্যের দিক থেকে নিষ্প্রয়োজন হলেও সাধক কবির কাছে তা প্রত্যাশিত। শাক্ত রামপ্রসাদ বৈষ্ণবদের প্রতি উদার মনোভাব প্রদর্শন করতে পারেন নি। ধর্ম সম্বন্ধে যে উদারতার পরিচয় পাই ভারত-চন্দ্রের কাব্যে, রামপ্রসাদের কাব্যে তা পাই না। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা সুন্দর বিচ্ছিন্ন কাব্য নয়,—অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্ভুক্ত। দেবী কালিকা অপেক্ষা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর সভাসদবর্গের তুষ্টিবিধানই কবির লক্ষ্য। রামপ্রসাদের কাব্যকেই কালিকামঙ্গল বলা চলে।

বিদ্যাসুন্দর

ভারতচন্দ্র অথবা রামপ্রসাদ—কে পূর্বে বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন বলা কঠিন। অনেকে মনে করেন, ভারতচন্দ্রের পরে রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের পরিতুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে। রামপ্রসাদের কাব্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব পড়ে নি। সপ্তদশ শতাব্দীর কালিকামঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম দাসের প্রভাবই রামপ্রসাদের কাব্যে স্পষ্টতঃ দেখা যায়। কাহিনী এবং চরিত্র চিত্রণে রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের কাব্যকেই অনুসরণ করেছেন। কাহিনীগ্রন্থনে রামপ্রসাদের মৌলিকতা কিছু নেই। চোর ধরার জন্য বিদ্যার গৃহ সিন্দুর লিপ্ত করে রজকের কাছে সিন্দুরাঙ্কিত বস্ত্র অনুসন্ধান করে গোয়েন্দাগিরির দ্বারা সুন্দরকে ধরার কাহিনী রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের কাব্য

থেকেই গ্রহণ করেছেন। ভারতের কাব্যে চোর ধরার জন্য বিদ্যার প্রকোষ্ঠে নারীবেশে কোটাল ও তার ভ্রাতৃবৃন্দ ফাঁদ পেতেছে এবং বিদ্যার ছদ্মবেশধারী চন্দ্রকেতু কামমোহিত সুন্দরকে অনায়াসে বন্দী করেছে। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা আদিরসাত্মক হলেও অধিকতর নাট্যগুণান্বিত।

কাহিনী গতানুগতিক হলেও রামপ্রসাদ চরিত্রসৃষ্টিতে কিছু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রামপ্রসাদের কাব্যে চরিত্রগুলি স্বাভাবিক,—বিদ্যাসুন্দরের চরিত্রের পরিণতি আছে। ভারতচন্দ্র চরিত্রসৃষ্টির দিকে তেমন নজর দেন নি। তাঁর চরিত্রগুলি ছাঁচে ঢালা,—রংক্তমাংসের মানুষের সন্ধান সেগুলিতে পাওয়া যায় না। তথাপি হীরামালিনী ও বিদ্যার মাতা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

ভারতচন্দ্র অসাধারণ শব্দকুশলী কবি—তাঁর ভাষা ক্ষুরধার—ঝকঝকে—ব্যঙ্গপ্রবণ। বাক্‌সিদ্ধ কবি চরিত্রগুলির অসঙ্গতি প্রকট করে নিজস্ব ভঙ্গীতে ব্যঙ্গকৌতুক করেছেন। ভাষার ঔজ্জ্বল্যে ছন্দের ঝংকারে চিত্ররীতিতে এবং কৌতুকের উচ্ছলতায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সকল বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই কাব্যের প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "রামপ্রসাদের কাব্যের একটি বড গুণ আছে, যাহা ভারতচন্দ্রে নাই—ঘরোয়া ভাবের প্রকাশ।" ডঃ সেন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের সমাদর না হওয়ার কারণ প্রসংগে বলেছেন, "এই কাব্যটি যে জনসাধারণের সমাদর লাভ করিতে পারে নাই, মনে হয় তাহার দুইটি কারণ। প্রথমতঃ ভারতচন্দ্রের অলংকার ঝলমল দ্যুতি, দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণচন্দ্রের মত ক্ষমতাবান পোষ্টার অভাব।" প্রথম কারণটি সঙ্গত। ক্ষমতাবান পোষ্টার অভাব রামপ্রসাদের ছিল না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই ত ছিলেন। আসলে ভারতচন্দ্রের প্রতিভা রামপ্রসাদের ছিল না। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের কাব্য পাশাপাশি পড়লে রামপ্রসাদের কাব্য বহুলাংশে নিষ্প্রভ মনে হবে।

আদিরসের বর্ণনায় ভারতচন্দ্র যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে সম্ভোগ উৎকৃষ্ট রসে পরিণত হয়েছে—অশ্লীল যৌন বর্ণনামাত্রে পর্যবসিত হয় নি। কিন্তু এই শিল্পকুশলতা রামপ্রসাদের কাব্যে নেই। তাই তাঁর কাব্যে দেহবিলাস নিতান্ত জৈবপ্রবৃত্তির বর্ণনায় পরিণত হয়েছে,—উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে দৈহিকতা ঢাকা পড়ে নি। রামপ্রসাদের কাব্যে দু এক স্থলে বর্ণনা কুশলতা বা ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টির পরিচয় পেলেও সমগ্র কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে উল্লেখযোগ্য বলা চলে না,—তাতে কাব্যের উৎকর্ষতা বর্ধিত হয়েছে, এমনও বলা চলে না।

বহু ভাষাবিদ্ কবি ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্য তাঁর কাব্যকে অনন্যসাধারণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে। আর সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রাদিতে রামপ্রসাদের পাণ্ডিত্য অনেক স্থলেই কাব্যের দুর্বহ বোঝাস্বরূপ হয়ে গতিরুদ্ধ করেছে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, " 'কবিরঞ্জনে' রামপ্রসাদের সংস্কৃত বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার উত্তম পরিপাক হয় নাই; বাঙ্গালা পদগুলির মধ্যে সংস্কৃত কথাগুলির উত্তম সমন্বয় হয় নাই।" ডঃ সেনের মন্তব্য যে কতটা সমর্থন যোগ্য তা নীচের কয়েকটি উদাহরণ থেকেই বুঝা যাবে ঃ

পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর।
ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্ধনে।
সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য সম নহে।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে।

এই ছত্রগুলিতে সংস্কৃত শব্দ কাব্যসৌন্দর্য বর্ধিত না করে কাব্যকে শ্রুতিকটু করে তুলেছে। তবে কোথাও কোথাও অনুপ্রাস যে সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয় নি তা নয়,—তৎসত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের কাব্যসৌষ্ঠবের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

প্রকৃতপক্ষে রামপ্রসাদের প্রতিভা গীতিকবির প্রতিভা। কালীকীর্তনে সহজ ভাষায় প্রাণমাতানো সুরে তিনি যেভাবে বাঙ্গালীর চিত্ত জয় করেছেন, বিদ্যাসুন্দরের কবি হিসাবে তার একটি ভগ্নাংশও সম্ভব হয় নি।

রামপ্রসাদের কালীসংকীর্তন বা শাক্তপদাবলী চণ্ডীমঙ্গলেরই পরিণত রূপ। চণ্ডীমঙ্গলের গতানুগতিকতা পরিহার করে ভারতচন্দ্র রচনা করলেন অন্নদামঙ্গল আর রামপ্রসাদ রচনা করলেন শ্যামাসঙ্গীত ও উমা সঙ্গীত। শ্যামাসঙ্গীত দেবী চণ্ডীকারই মহিমা প্রচারক কাহিনীর রূপান্তর। অন্নদামঙ্গলের বরাভয়দায়িনী জননী অন্নদাই শ্যামাসঙ্গীতের শ্যামা। শ্যামাসঙ্গীতের দেবী শ্যামা ভক্ত কবির জননী—তাঁর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা মান-অভিমানের আশ্রয়স্থল।

অন্নদামঙ্গল ও কালীকীর্তন

চণ্ডীমঙ্গল এবং অন্নদামঙ্গলের 'শিবায়ন' অংশই উমাসঙ্গীতে রূপ নিয়েছে। দরিদ্র বুড়ো বরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে মা মেনকার সুগভীর উদ্বেগ—ঘটকের প্রতি ভর্ৎসনা—মেয়ের জন্ম কাতরতাই নবরূপ পেয়েছে আগমনী ও বিজয়ার গানে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেই শিবায়ন কাব্যের পরিণতি। আর এই অন্নদামঙ্গলেরই পরিণতি উমাসঙ্গীত এবং শ্যামাসঙ্গীত। অন্নদামঙ্গলের কল্যাণদাত্রী দেবী অন্নদার সঙ্গে শ্যামার আর 'শিবায়ন' অংশের সঙ্গে উমাসঙ্গীতের সাদৃশ্য সহজলক্ষ্য। অবশ্য উমাসঙ্গীতে তৎকালীন সমাজে বাল্য বিবাহ ও কন্যার পিতামাতার বালিকা কন্যার বিরহজনিত দুঃখও মিশ্রিত হয়েছে—আর শ্যামাসঙ্গীতে পড়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এবং বিদ্যাসুন্দরে গীতিময়তা সহজেই চোখে পড়ে। কাহিনীর সঙ্গে কিছু কিছু গানও সংশ্লিষ্ট হয়েছে। শাক্তকাব্যে এই যে গীতিময়তার শুভ সূচনা দেখা গেল,—তাই কালী কীর্তনে স্বতন্ত্রধারায় গীতিকবিতায় পরিণত হোল।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি বাস্তবতার আধার। মুকুন্দরামের কাব্যে বাস্তব সমাজ বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। সেকালের রাজনৈতিক বিপর্যয় এবং সামাজিক সংকটের চিত্র মুকুন্দরামের কাব্যে প্রায়ই সর্বত্রই বর্তমান। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও সেই যুগসংকট। মোঘলশাসনের বজ্রমুষ্টির শিথিলতা, নবাবী স্বৈরাচার, বর্গীর উপদ্রব এবং ইংরাজ বণিকের পদসঞ্চার তৎকালীন

বাঙ্গালার সমাজজীবনকে যে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল,—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তার সামগ্রিক না হলেও আংশিক বিবরণ আছে; আর রামপ্রসাদের শাক্তসঙ্গীতেও যুগ ও সমাজের একটা চিত্র ফুটে উঠেছে। গানের উপমায়, রূপকে এবং রূপকল্পে রামপ্রসাদ সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকগুলির ইঙ্গিত দিয়েছেন। যে দৈব-নির্ভরতা যুগসংকটে মঙ্গলকাব্য রচনার প্রেরণা দিয়েছিল,—সেই যুগসংকটজাত দৈব-নির্ভরতাই শাক্ত পদাবলীর প্রেরণা। অন্নদামঙ্গলে হরিহোড় ও ভবানন্দের দেবীর কৃপা ও তজ্জনিত সমৃদ্ধির বর্ণনায় দৈব-নির্ভরতার ইঙ্গিত থাকলেও শাক্তপদাবলীর পূর্বে রচিত এই কাব্যটিতে রাজদরবারের পরিবেশ প্রভাবে যুগযন্ত্রণার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি এবং তারই সুস্পষ্ট পরিণাম হিসাবে দেবতার অবিচলিত বিশ্বাস এবং নির্ভরতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে শব্দকুশলতা কাব্যের প্রধান ঐশ্বর্যরূপে গণ্য হয়েছে,—রামপ্রসাদের কালীসংকীর্তনে ঠিক তার বিপরীত ভাবই কাব্যরসাস্বাদনের পক্ষে উপযোগী হয়ে উঠেছে এবং সঙ্গীতগুলি আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। অন্নদামঙ্গল কাব্যের যুগোপযোগী রূপান্তরই রামপ্রসাদের কালীসংকীর্তন।

যুগন্ধর কবি ভারতচন্দ্র :

মঙ্গলকাব্যের গৌরবময় যুগের অন্তিম পর্বে ভারতচন্দ্রের শুভ আবির্ভাব। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক কাহিনীর আবর্তনে বাঙ্গালা কাব্য স্রোত যখন স্তিমিতপ্রায় সেই সময়েই ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করেছিলেন। পুরাতন যুগের কাব্য থেকে তিনি ঋণ গ্রহণ করে তাকে নূতন সৌষ্ঠব দান করলেন। একটা যুগ এসে পূর্ণতালাভ করেছে ভারতচন্দ্রে। নানা ভাষায় পণ্ডিত এবং অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রায়গুণাকর উপলব্ধি করেছিলেন যে গতানুগতিকতার পুনরাবৃত্তির দ্বারা কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব নয়। তাই পুরাতন ধারাকে স্বীকার করে নিয়েও তিনি স্বাধীনভাবে কাব্যে

আনলেন নূতনত্ব। শুধু কাব্যের বহিরঙ্গ গঠনেই অভিনবত্ব নয়—কাব্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও তিনি অভিনবত্ব নিয়ে এলেন। নানা ভাষায় পারদর্শিতা হেতু বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে তিনি বাঙ্গালা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুললেন। ভারতচন্দ্রের কাব্য সংগ্রহশালামাত্রে পর্যবসিত হল না। অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর কবি বিভিন্ন ভাষার শব্দগুলিকে এমন আশ্চর্য কৌশলে গ্রথিত করলেন, সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ছন্দে পর্বান্তিক এবং চরণান্তিক মিল দিয়ে শব্দ ও অলংকারে এমনভাবে ভাষাকে সজ্জিত করলেন,—অনায়াস দক্ষতায় এমন আশ্চর্য ভাষা চিত্র রচনা করলেন যে তাঁর বাগ্‌ভঙ্গী এবং প্রকাশ নৈপুন্য একটি অভূতপূর্ব বিস্ময়কর শিল্পরীতির নিদর্শন বলে গণ্য হল। ভারতচন্দ্রের এই বাগ্‌রীতি উনিশ শতকের শেষ ভাগের সাহিত্যরথীরাও গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হননি। এমনকি যুগন্ধর কবি মধুসূদনও ভারতচন্দ্রের শৈলীর প্রভাব অতিক্রম করতে-পারেন নি।

ভারতচন্দ্র তাঁর পূর্বসূরী মুকুন্দরাম, ঘনরাম, রামেশ্বর প্রভৃতির কাছ থেকে ঋণগ্রহণ করেছেন বটে, মঙ্গলকাব্যের বিচিত্র স্রোতোধারা তাঁর অন্নদামঙ্গলে এসে পূর্ণতা পেয়েছে বটে—তথাপি তিনি তাঁর যুগকে অস্বীকার করেন নি। নাগরিক সভ্যতার ক্রমবর্ধমান প্রভাব তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। যুগধর্ম ও যুগরুচি অনুযায়ী তিনি কাব্যকলাকে নবরূপ দান করেছেন। নাগরিক জীবনের আড়ম্বর এবং চাকচিক্য—দেবতার প্রতি অবিশ্বাস, রাজনৈতিক দুর্যোগ প্রভৃতি তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। কবির ইতিহাস চেতনা কাব্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বাঙ্গালা দেশে তিনিই প্রথম কবি যিনি ইতিহাসকে কাব্যের পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছেন,—পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক কাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তাঁর কাব্যেই দেবতা শুধু মর্তে মানুষের আকৃতি গ্রহণ করেন নি,—মানুষের রঙ্গ-ব্যঙ্গেরও বিষয়ীভূত হয়েছেন। দেবতার মঙ্গলগীত রচনা অপেক্ষা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশগত গৌরবগাথাই ভারতচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষিত হয়েছে। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের

অশ্লীলতাকে ভারতচন্দ্রই শিল্পসম্মত আদিরসে উত্তরিত করেছেন। ভারত-চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য পরবর্তী বাঙ্গালা দেশের নাগরিক রুচিকে পরিতৃপ্ত করেছে। শতাব্দীর অধিককাল ব্যাপী বাঙ্গালা নাটকে, কাব্যে, যাত্রায়, কবিগানে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যে কৈকেয়ীর খেদোক্তিতে ভারতচন্দ্রের হীরামালিনীর খেদোক্তির প্রভাব পড়েছে। মধুসূদনের অন্নপূর্ণার ঝাঁপি সনেটটি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল অবলম্বনে রচিত।

ভারতচন্দ্রের রঙ্গব্যঙ্গাত্মক কবিতা যে কৃষ্ণনগরের কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে প্রভাব সঞ্চার করেছে তাতে সন্দেহ নেই। ভারতচন্দ্রের খণ্ড কবিতাগুচ্ছ দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের পূর্বাভাস। ভারতচন্দ্রের 'রাধাকৃষ্ণের উক্তি' কবিতাটিরই পরিণত রূপ আছে হাসির গানের একটি কবিতায়। যদি-ও ভারতচন্দ্রের খণ্ড কবিতাগুচ্ছে মণ্ডনকলার দিকেই মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, তথাপি এইগুলিই হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের খণ্ড কবিতার সূচনা জ্ঞাপন করেছে এবং আধুনিক বাঙ্গালা গীতিকবিতার শুভ আবির্ভাব বিজ্ঞাপিত করেছে। হেমচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের রঙ্গব্যঙ্গমূলক কবিতার সূচনাও এখান থেকে। অন্নদামঙ্গল কাব্যে বিশেষতঃ বিদ্যাসুন্দরে গীত সংযোজনের ফলে যে গীতিময়তা সৃষ্টি হয়েছে তাও আধুনিক যুগের কথাই মনে পড়ায়। মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যেও গীতিময়তা লক্ষিত হয়।

চরিত্র সৃষ্টির প্রতি ভারতচন্দ্র গভীর মনোযোগ না দিলেও ঈশ্বরী পাটনী, মেনকা, রাজপুরুষ কোটাল প্রভৃতি ছোট ছোট অপ্রধান চরিত্রগুলি অনেকাংশে জীবন্ত। হরগৌরীর সংসারযাত্রা দুঃখ দারিদ্র্য কলহ ইত্যাদিতে বাঙ্গালী ঘরের গার্হস্থ্য চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনায় বাঙ্গালীর চিরকালের কামনাটি ধ্বনিত হয়েছে। অবশ্য বাস্তবানুগত চরিত্র ও ঘটনা মধ্যযুগের বাঙ্গালা কাব্যে নূতন নয়। বরঞ্চ এ বিষয়ে মুকুন্দরামের দক্ষতা অপেক্ষাকৃত অধিক। দেবচরিত্রে মানবত্ব আরোপও মঙ্গলকাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য

ভারতচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর কাব্যে দেবতায় মানবীয় গুণের আরোপ ত ঘটেছেই—দেবচরিত্রের দেবত্বেরও সম্পূর্ণ হানি ঘটেছে—দেবচরিত্রের বেনামীতে তিনি বাঙ্গালার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকেই এঁকেছেন। শিব-উমা-নারদ-ব্যাসদেব-মেনকা প্রভৃতি চরিত্রগুলি বাঙ্গালা দেশেরই মানুষ। শিবকে আমরা দেখি একটি সাপুড়ে বেদে রূপে—উমাকে পেয়েছি দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের সাধারণ বধূরূপে—নারদ একটি ভাঁড—কোন্দলপরায়ণ ঘটক—ব্যাসদেব বৈষ্ণববেশী ভাঁড়—মেনকা বাঙ্গালী মেয়ের ক্ষুব্ধা মা।

সব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, মঙ্গলকাব্যের বিচিত্র ধারাগুলি পূর্ণতালাভ করেছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে। পূর্ণতার পরেই নতুন গতিপথের সন্ধান প্রয়োজন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে সেই নব যুগের আভাস আছে। অধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে যে দৈব নিরপেক্ষ মানবতার জয়গান—তার সূচনা ভারতচন্দ্র থেকেই। ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত লিখেছেন, "তিনি যুগসন্ধির কবি, দেবতার মহিমা তাঁহাকে খুব মুগ্ধ করিতে পারে না—তাঁহার দৃষ্টি নামিয়া আসিয়াছিল মাটির পৃথিবীতে—চাহিয়া দেখিয়াছেন তিনি তাঁহার চারিদিকে মানুষ—তাহার নানাবিধ সমাজ চিত্র; শিবও তাই মানুষ হইয়া গিয়াছেন। মাথায় জটা ও ফণী, গলায় মালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, গায়ে মাখা ছাই—এমন একটি ভিখারীর রূপ দেখিয়াছি আমরা আমাদের সমাজে কোথায়? একটি বেদিয়ার ভিতরে। এ হেন বেদিয়া বুড়া স্বামীর সহিত নবযৌবনা উমার বিবাহ ঘটাইয়াছেন যেই ঘটকচূড়ামণি নারদ, তাহাকে যদি কন্যার মাতা মেনকা 'ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়। হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাকছাড়ি কয়। ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে। হেন বর কেমনে আনিলে চক্ষু খেয়ে!' তখন দেবচরিত্রের অসম্মান দেখিয়া জিব কাটিলে চলিবে না; নূতন যুগকেও স্বাগত জানাইতে হইবে।.........শিবকে ঘিরিয়া বালকদলের মধ্যে যখন 'ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া' তখন ইহাকে অকবির ক্ষমতা জনিত দেবচরিত্রের অসার্থক বর্ণনা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না—মানুষ

এই যে দেবতার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল এইখানেই আমাদের জাতীয় জীবনে এবং জাতীয় সাহিত্যে দেখিতে পাই একটি নব-যুগের সূচনা।" (বাঙ্গালা সাহিত্যে নব যুগ)। নবযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু বৈচিত্র্যের আভাস ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায়। তাই তিনি যুগন্ধর কবি। তবে প্রকৃত নব যুগের আবির্ভাব হয়েছে প্রায় শতবর্ষ পরে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত রচনা :

ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত রচনাগুলি তিনভাগে ভাগ করা যায় : সংজাত পদ্ধতি বা ধর্মঠাকুরের পূজানুষ্ঠান পদ্ধতি, ধর্মপুরাণ বা ধর্মপূজার ইতিহাস এবং ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক ধর্মমঙ্গলকাব্য। এগুলির মধ্যে ধর্মমঙ্গল কাব্যই সাহিত্য হিসাবে মূল্যবান। অংশত সংস্কৃতে এবং অংশত বাঙ্গালা ছড়ায় রচিত ধর্মপূজার নিয়মকানুন ও মন্ত্রাদির বিবরণ সংজাত পদ্ধতি বা ধর্মপূজাবিধান নামে পরিচিত। ধর্মপূজার আদি প্রবর্তক রামাই পণ্ডিতের নামেই ধর্মপূজাবিধানের পুঁথিগুলি প্রচলিত। ধর্মপূজাবিধানের 'কালিমা জালাল' অংশে মুসলমান সমাজের উপরে ও ধর্মোপাসনার প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিষয়টি শূন্যপুরাণে নিরঞ্জনের রুষ্মা (উষ্মা) নামে পরিচিত। ধর্মপূজাবিধানে শিব ঠাকুরের কৃষিকার্যের বিবরণটিও কৌতূহলোদ্দীপক।

ধর্মঠাকুরের পুরাণও রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত। বিভিন্ন পুঁথিতে ধর্মঠাকুরের সৃষ্টিপত্তন কাহিনী শূন্যশাস্ত্র, শূন্যপুরাণ, অনিলপুরাণ, স্থাপনা পালা, অনাদ্যের পুঁথি প্রভৃতি নামে পরিচিত। পঞ্চান্নটি উপচ্ছেদে বিভক্ত শূন্যপুরাণ সংস্কৃত পুরাণের অনুসরণে রচিত। প্রথমাংশেই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টিকাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

শূন্য পুরাণ

নিরঞ্জনের রুষ্মা নামক অংশটিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপরে ধর্মঠাকুরের প্রভাবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। শূন্যপুরাণে শিবের কৃষিকর্মের বিবরণ আছে, ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের আভাষও আছে।

শূন্য পুরাণের লেখক রামাই পণ্ডিতকে অনেকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে গ্রহণ করেছেন, অনেকে আবার রামাই পণ্ডিতের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। শূন্য পুরাণে কিছু কিছু প্রাচীন শব্দ থাকলেও ভাষা নিতান্তই আধুনিক কালের। রচনাটি ছড়ার আকারের কিছু গদ্যের ধরনের উক্তি প্রত্যুক্তি আছে। ডঃ শহীদুল্লা শূন্য পুরাণকে ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই শূন্য পুরাণের প্রাচীনত্বে সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। পুঁথিটি অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলে অনেকের বিশ্বাস। মাঝে মাঝে রামাই পণ্ডিতের ভণিতা থাকলেও গ্রন্থটির রচনাকার রামাই পণ্ডিত কিনা এ বিষয়েও সংশয়ের অবসান হয় নি। তবে ধর্মমঙ্গলকাব্যে ও ধর্মপূজার শাস্ত্রে যে ভাবে রামাই পণ্ডিতের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে বারংবার, তাতে রামাই পণ্ডিত নামে ধর্মপূজার আদি পুরোহিত কেউ ছিলেন বলেই মনে হয়। কাব্য হিসাবে শূন্য পুরাণের কোন মূল্য নেই।

ধর্মমঙ্গল কাব্য ঃ

ধর্মমঙ্গল কাব্যটিই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্য গুণান্বিত। খৃষ্টীয় ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই কাব্যের ধারা অব্যাহত ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্য চব্বিশ পালায় বিভক্ত। স্থাপনা পালায় সৃষ্টিপ্রকরণ বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য লাউসেনের কাহিনী।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ঃ

গৌড়েশ্বর ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রের রাজত্বকালে রাজার শ্যালক মহামদ পাত্র ছিল প্রধান মন্ত্রী। রাজ্যব্যাপী অজন্মায় গৌড়রাজ দুর্গত প্রজাপুঞ্জের খাজনা মকুব করেছেন। কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির মহামদ প্রজাদের

উপরে অন্যায় অত্যাচার করে খাজনা আদায় করতে শুরু করে। এক সম্ভ্রান্ত অনুগত প্রজা সোমঘোষ রাজকর দিতে অস্বীকার করায় বন্দী হয়। গৌড়রাজ শিকারে গিয়ে কারাগারে বন্দী সোমঘোষকে দেখে তার বন্দীত্বের কারণ জেনে মহামদকে তিরস্কার করে সোমঘোষকে মুক্ত করে দিলেন এবং অজয় তীরবর্তী ত্রিষষ্ঠীর গড়ের সামন্ত রাজা কর্ণসেনের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন। সোমঘোষ সপরিবারে ত্রিষষ্ঠীগড়ে বাস করতে থাকে। সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ অত্যন্ত দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। ইছাই ভবানীভক্ত। ভবানীর কাছ থেকে ইছাই ঘোষ বর আদায় করে যে দেবী ত্রিষষ্ঠীর গড়ে অধিষ্ঠিতা থাকবেন এবং দেবীর হাতের অসি ছাড়া অন্য অস্ত্রে তার মৃত্যু হবে না। ইছাই যৌবনে উপনীত হয়ে দেবীর কৃপায় নূতন নগর নির্মাণ করে—প্রজা বসিয়ে ঢেকুর গড় নামে এক দুর্ভেদ্য নগর নির্মাণ করায়। ইছাই ঘোষ কর্ণসেনকে বিতাড়িত করে ত্রিষষ্ঠীর গড় অধিকার করলে গৌড়েশ্বরের রাজস্ব বন্ধ করলে। গৌড়রাজ কর্ণসেনের অধিনায়কতায় এক বিশাল সৈন্যদল প্রেরণ করলেন ইছাই ঘোষকে দমন করতে। ভবানীর কৃপায় ইছাই ঘোষ জয়ী হয়—কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হয়। কর্ণসেনের ছয় পুত্রবধূ স্বামীর সহমৃতা হয় এবং কর্ণসেণের পত্নী শোকে আত্মহত্যা করে। কর্ণসেনের ভাগ্যবিপর্যয়ে ব্যথিত হয়ে গৌড়েশ্বর তাঁর শ্যালিকা সুন্দরী রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিয়ে দিলেন। রঞ্জাবতী মহামদের প্রিয় ভগিনী। বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে ভগ্নীর বিয়েতে মহামদের প্রবল আপত্তির কথা চিন্তা করে রাজা রানীর সঙ্গে পরামর্শ করে মহামদকে কাজের অজুহাতে দূর দেশে সরিয়ে দিয়ে শুভকর্ম সেরে ফেললেন। অতঃপর তিনি কর্ণসেনকে ময়নাগড়ের সামন্তরাজ নিযুক্ত করলেন। কর্ণসেন সস্ত্রীক ময়নাগড়ে যাত্রা করলেন। এই সংবাদে গৌড় প্রত্যাগত মহামদ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়। গৌড়েশ্বরের অনিষ্ট করতে না পেরে মহামদের ক্রোধ পড়লো ভগিনী রঞ্জাবতী ও ভগ্নীপতি বৃদ্ধ কর্ণসেনের উপরে। সে ভগ্নী ও ভগ্নীপতির সঙ্গে শত্রুতা করার সংকল্প গ্রহণ করে। মহামদের ভয়ে

পিতামাতাও রঞ্জাবতীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে। বহুদিন সংবাদ না পেয়ে রঞ্জাবতী বৃদ্ধ স্বামীকে পাঠায় গৌড়ে পিতামাতা ও ভ্রাতার সংবাদ আনতে। গৌড় রাজসভায় প্রকাশ্যে মহামদ কর্ণসেনকে 'আটকুড়া' এবং রঞ্জাবতীকে 'বন্ধ্যা' বলে গালাগালি দিয়ে কর্ণসেনকে অপমানিত করে। রঞ্জাবতী এই কথা শুনে ব্যথিত হয়ে পুত্রলাভের জন্য নানাপ্রকার ঔষধপত্র ব্যবহার করে ব্যর্থ হয়ে ধর্মঠাকুরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাতেও ফললাভ না হওয়ায় রামাই পণ্ডিতের উপদেশমত কঠোর তপশ্চর্যায় নিযুক্ত হয়। এই সময়ে তপশ্চর্যায় কর্ণসেনের অনুমতি আদায়ের জন্য রঞ্জাবতী হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র বলিদান ও মৃত পুত্রের পুনর্জীবন লাভের কাহিনী বিবৃত করে। কোন প্রকারেই ধর্মঠাকুরেব প্রসন্নতা লাভ না হওয়ায় রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়ে দেহত্যাগ করে। এবার ধর্মরাজ প্রসন্ন হয়ে রঞ্জাবতীর জীবন দান করলেন এবং পুত্রবর দিলেন। রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেনের জন্ম হোল। এবার মহামদ কংসরাজার ভূমিকা গ্রহণ করলে। তারই প্ররোচনায় ইন্দামেটে নামক এক চোর লাউসেনকে চুরি করে নিয়ে গেল। ধর্মঠাকুরের আদেশে হনুমান লাউসেনকে উদ্ধার কবে রঞ্জাবতীর কাছে পৌঁছে দেয়। ধর্মঠাকুর লাউসেনের খেলার সাথী রূপে কর্পূর সেন বা কর্পূর ধবলকে দান করলেন। ধর্মের আদেশে হনুমান স্বয়ং লাউসেন ও কর্পূব সেনকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা দেয় এবং দুই ভাই মল্লবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলো। ভগবতী দুর্গা লাউসেনের অটুট চরিত্রবল পরীক্ষা করে প্রীত হয়ে তাঁর নিজের হাতের অসি দান করলেন। বিশ্বকর্মা দেবীদত্ত অসির ফলা (খাপ) নির্মাণ করলেন। ফলা-সহ অসি নিয়ে লাউসেন কর্পূর সেনকে সঙ্গে করে গৌড় যাত্রা করলো। হনুমান দিলে অজেয় বর। পথে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে লাউসেনকে। মহামদ প্রেরিত আটজন মল্লকে পরাজিত করে কামদল বাঘ ও এক ভীষণ কুমীর বধ করে জামতিতে ভ্রষ্টচরিত্রা নারীগণের প্রলোভন এবং গোলহাটে রাণী সুরিক্ষার আকর্ষণ জয় করে তারা গৌড়ে পৌঁছাল। দুই

ভাই আশ্রয় পেল লাউদত্ত কর্মকারের বাড়ী। কিন্তু কোন বিদেশীকে আশ্রয় দিলে শাস্তি পেতে হবে— মহামদের এই ঘোষণা শুনে লাউসেন আশ্রয় ত্যাগ করে বৃক্ষতল আশ্রয় করে এবং মহামদের কারসাজিতে রাজার হাতী চুরির দায়ে বন্দী হয়। ধর্মরাজের কৃপায় স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজা দুই ভাইকে রাজসভায় আনতে আদেশ দিলেন। রাজসভায় লাউসেন ও কর্পূর সেনের সঙ্গে রাজার পরিচয় হোল। মহামদের ইচ্ছানুসারে একটি মত্ত হাতী বধ করে এবং মত্ত অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবিত হয়ে লাউসেন স্বীয় শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়। অন্তঃপুরে রাণী ভানুমতীর সমাদরে আপ্যায়িত হয়ে লাউসেন ও কর্পূর সেন পিতামাতার কাছে ফিরে গেল। পথে ডোমপল্লীতে কালুডোম ও তার অনুচর বর্গের সঙ্গে লাউসেনের বন্ধুত্ব হোল এবং এই ডোমবীরদের সঙ্গে নিয়ে লাউসেন পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হোল। কর্ণসেন বীর পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করলেন। মহামদের চক্রান্তে লাউসেনকে যেতে হোল কামরূপ রাজকে দমন করতে। কামরূপ রাজ পরাজিত হয়ে সন্ধি করলেন এবং রাজকন্যা কলিঙ্গার সঙ্গে লাউসেনের বিয়ে দিলেন।

সিমুলার রাজা হরিপালের সুন্দরী কন্যা কানাড়াকে বিয়ে করতে বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর আগ্রহী। তেজস্বিনী কানাড়া বীর লাউসেনকে পতিরূপে কামনা করে। সে গৌড়েশ্বরের দূতকে অপমানিত করে বিতাড়িত করে। গৌড়েশ্বর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সামন্তরাজ হরিপালের রাজ্য আক্রমণ করলেন। কানাড়া একটি লোহার গণ্ডার পাঠিয়ে গৌড়েশ্বরকে জানায় যে, যে এই গণ্ডার এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে, কানাড়া তাকেই বিয়ে করবে। বৃদ্ধ গৌড়রাজ এবং মহামদ পরাভূত হয়। এখানেও লাউসেনের ডাক পড়ে। লাউসেন লোহার গণ্ডারকে এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে কানাড়ার পাণিগ্রহণ করলো।

মহামদের পরামর্শে গৌড়রাজ লাউসেনকে পাঠালেন ইছাই ঘোষকে দমন করতে। ইছাই ঘোষের সেনাপতি লোহাটা বজ্জর যুদ্ধে কালু ডোমের হাতে

প্রাণ দেয়। লাউসেন লোহাটার ছিন্নমুণ্ড গৌড়েশ্বরের কাছে প্রেরণ করে। মহামদ এই মুণ্ড দ্বারা লাউসেনের মায়ামুণ্ড তৈরী করে ময়নাগড়ে প্রেরণ করে। শোকার্ত পিতামাতা ও বধূগণ প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হলে ধর্মরাজ প্রকৃত তথ্য বিবৃত করে তাদের নিবৃত্ত করলেন। অবশেষে পার্বতীর আশ্রিত ইছাই ঘোষ লাউসেনের দ্বারা নিহত হোল।

মহামদ কোন প্রকারে লাউসেনকে ধ্বংস করতে না পেরে গৌড়রাজ সহ ধর্মপূজায় মনোনিবেশ করে। কিন্তু ধর্মঠাকুর রুষ্ট হয়ে ঝড় বৃষ্টিতে গৌড় রাজ্য বিপর্যস্ত করে তুললেন। পূজায় ত্রুটী হয়েছে ভেবে মহামদের পরামর্শে গৌড়রাজ লাউসেনকে ডেকে পাপ দূর করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাবার নির্দেশ দিলেন। লাউসেন অস্বীকার করায় মহামদ লাউসেনের পিতামাতাকে বন্দী করে। পিতামাতার মুক্তির জন্য লাউসেন হাকন্দ নামক স্থানে ধর্মের তপস্যায় রত হয়। এই সুযোগে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করলো। কালুডোম যুদ্ধে না যাওয়ায় তার পত্নী লখাই একাই মহামদের সৈন্যদলকে ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু কালুর পুত্র সাকা যুদ্ধে প্রাণ দেয়। কালু সত্যরক্ষা করতে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকের হাতে প্রাণ দেয়; কলিঙ্গা অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করে। দেবী পার্বতীর কৃপায় কানাড়া মহামদকে পরাজিত করে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে।

এদিকে লাউসেন হাকন্দে কঠোর তপস্যার পর নিজ দেহের মাংস আহুতি দিয়েও ধর্মরাজের কৃপা না পেয়ে স্বীয় মুণ্ড ছিন্ন করে দেবতাকে উৎসর্গ করে। ধর্মরাজ তুষ্ট হয়ে তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন এবং অমাবস্যার রাত্রে তাঁরই আদেশে সূর্যদেব পশ্চিমে উদিত হলেন। যদিও পশ্চিমে সূর্যোদয় সকলেই দেখলো—তথাপি হাকন্দে এই ঘটনার একমাত্র সাক্ষী ছিল হরিহর বাইতি। মহামদের উৎকোচের প্রলোভন ও ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও হরিহর মিথ্যা বলতে পারলো না। মহামদ মিথ্যা চুরির অপরাধে হরিহরকে শূলে প্রাণদণ্ড দেয়। হরিহর ধর্মরাজের কৃপায় স্বশরীরে স্বর্গে গেল। লাউসেন পিতামাতার

সঙ্গে ময়নাগড়ে প্রত্যাবর্তনের পর মৃত ব্যক্তিরা ধর্মরাজের অনুগ্রহে প্রাণ ফিরে পেল।

মহামদের এই সকল অন্যায় কার্যের জন্য ধর্মরাজ রুষ্ট হয়ে তাকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত করলেন। মহামদ লাউসেনের শরণাপন্ন হলে লাউসেনের অনুরোধে ধর্মরাজ তাকে রোগমুক্ত করলেন। কিন্তু তার অন্যায় কার্যের শাস্তি হিসাবে তার মুখে একটি শ্বেত কুষ্ঠের দাগ রইলো। ধর্মরাজের পূজা প্রচার করে পুত্র চিত্রসেনকে রাজ্যভার দিয়ে লাউসেন স্বর্গ গমন করে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। নায়ক লাউসেনের বীরত্ব বর্ণনাই এই কাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বীরত্বে পরিপূর্ণ এই কাব্যটি। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকৃত বীররসাত্মক কাব্য বোধহয় ধর্মমঙ্গল কাব্যই। শুধু লাউসেন নয়—কালুডোম—সাকা ডোম—লখাই ডোম—কলিঙ্গা কানাড়া প্রভৃতি অনেকেই বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের মত বাস্তব রস এখানে উপেক্ষিত হয়েছে। অবশ্য বাস্তবসম্মত বর্ণনা যে একেবারেই নেই তা নয়। চণ্ডীমঙ্গলের মত জীবন্ত নরনারী চরিত্রও এখানে কম। চরিত্রগুলিকে নিষ্প্রাণ আইডিয়া বলে বোধ হয়। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী বহু অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ, কতকটা রূপকথার মত—এর রস রোমান্স প্রধান। কাহিনীভাগ ঘনসন্নিবদ্ধ নয়। চরিত্রগুলির বীরত্ব মহত্ত্ব আত্মত্যাগ প্রভৃতি উচ্চতর কাব্যকলার বিষয়ীভূত হলেও কবিগণ চরিত্রগুলিকে রক্তমাংসের মানুষ গড়ে তুলতে যেমন পারেননি, তেমনি গতানুগতিক কাহিনীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যও তেমন প্রয়াসী হন নি। তবে মূল কাহিনীতেই ঘটনা, চরিত্র, দৃশ্য এবং চিত্রের প্রচুর বৈচিত্র্য আছে। মুকুন্দরামের মত মহৎ প্রতিভার হাতে পড়লে যে ধর্মমঙ্গল কাব্য আরও চিত্তাকর্ষক হোত এবং মহৎ কাব্যে পরিণত হতে পারতো তাতে সন্দেহ

নেই। এই কাব্যে রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি পুরাণের প্রভাব গভীর। ডঃ সুকুমার সেন ধর্মমঙ্গল কাব্য সম্পর্কে লিখেছেন "এড্ভেঞ্চার বা কেরামতি কাহিনী বলিয়া ধর্মমঙ্গল কাব্য মনসামঙ্গল কাব্যের অপেক্ষা সুখপাঠ্য, কিন্তু শিল্পগুণে তা নিকৃষ্ট। অপ্রধান ভূমিকাগুলি অনেকটা মানবোচিত। কাহিনীতে বীররস থাকিলেও যুদ্ধের ঘনঘটা বর্ণনায় সুপরিকল্পিত সংহতি নাই। মঙ্গল-কাব্যের প্রধান সম্পদ তাহার মানবিক আবেদন, এই কাব্যে তারও নিতান্ত অভাব। তবে কাব্যবস্তুর বিশালতা ও বৈচিত্র্য এবং ভূমিকার বহুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করিলে ধর্মমঙ্গল কাব্য মধ্য বাংলা সাহিত্যের যেন এপিক্ কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।"

তবে একথাও ঠিক যে কাহিনীতে অজস্র বৈচিত্র্য থাকার জন্য চরিত্রগুলির সূক্ষ্ম মনোভাব বিকাশের দিকে কবিগণ নজর দিতে পারেন নি।

ধর্মমঙ্গল কাব্য ধর্মঠাকুরের গাজনে বার দিন ধরে গান করা হোত। ধর্মমঙ্গল কাব্য অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় অর্বাচীন হলেও এতে প্রাচীনত্বের ছাপ আছে অনেক। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সর্বশেষে দেখা দিলেও গঠনে এবং বস্তুতে ধর্মমঙ্গল কাব্য পুরানো বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন। অপভ্রংশ রীতির কাব্যছন্দের চিহ্নাবশেষ ধর্মমঙ্গলে যে রকম ও যতটা আছে, এমন মনসমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলে নাই। গোলাহাট পালায় বৃদ্ধ বেশ্যার চিত্র পুরাতন কাব্যবস্তু বলিয়া অন্য কোন প্রাদেশিক পুরানো সাহিত্যেও প্রতিফলিত দেখা যায়। অপভ্রংশ সাহিত্যে পরিচিত পূর্বাগত প্রহেলিকা কবিতার ব্যবহারও এই পালার বিশেষ বস্তু।" ধর্মমঙ্গল কাব্যে মানুষের মহিমা অত্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে। বীরত্বে ও মহত্ত্বে মানুষ দেবতাকে অতিক্রম করেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্রঃ

ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র লাউসেন। লাউসেন কাব্যের নায়ক।

সংস্কৃত মহাকাব্যের মহাকাব্যোচিত গুণ লাউসেন চরিত্রে আছে। লাউসেন বীর সাহসী বিচক্ষণ কর্তব্যপরায়ণ ক্ষমতাশীল পিতৃমাতৃ বৎসল এবং শ্রেষ্ঠ তপস্বী। মহামানবোচিত সদ্‌গুণের অভাব নেই তার চরিত্রে। লাউসেন বহু বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। কামরূপরাজ দমন, —ইছাই ঘোষ বধ—লোহার গণ্ডার দ্বিখণ্ডীকরণ প্রভৃতি কার্যগুলি তার বীরত্বের পরিচায়ক। হাকন্দে লাউসেন যেভাবে তপস্যা করেছে—নিজের দেহ থেকে মাংসখণ্ড কেটে কেটে অগ্নিতে আহুতি দিয়েছে,—অবশেষে নিজের মুণ্ড ছিন্ন করে দেবতাকে উৎসর্গ করেছে, তাতে লাউসেনকে সাধকোত্তম বলতে দ্বিধা নেই। পিতামাতার অনুমতি না নিয়ে লাউসেন কোন দুঃসাহসিক অভিযানে যাত্রা করে না। পিতামাতার বন্দীত্ব মোচনের জন্যই সে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাতে দুশ্চর তপস্যায় রত হয়েছে। কালু ডোমের প্রতি তার ব্যবহার তার বন্ধুবৎসলতার পরিচয় বহন করছে। কর্পূর সেনের প্রতি লাউসেনের স্নেহেরও অন্ত নেই। বিচক্ষণতাও লাউসেনের চরিত্রকে মহত্বে ভূষিত করেছে। মহামদ বিদেশীকে আশ্রয় দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা মাত্রই লাউসেন লাউদত্ত কর্মকারের আশ্রয় ত্যাগ করে বৃক্ষতল আশ্রয় করেছে। আবার একাধিক ক্ষেত্রে গণিকার রূপযৌবনের প্রলোভন উপেক্ষা করে সে সংযমের পরিচয় দিয়েছে, বীরত্বে এবং মহত্বে লাউসেন কাব্যের প্রকৃত নায়কের মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু চরিত্রটি দৈবানুগৃহীত হওয়ায় তার মহত্ত্ব সম্যক্ বিকাশ লাভ করতে পারে নি। যে কোন বিপদেআপদে ধর্মঠাকুর সকল সময় তার সহায়তা করেছেন এবং দেবতার কৃপায় যে কোন পরীক্ষায় লাউসেন উত্তীর্ণ হয়েছে। দেবতার সর্বাত্মক ছায়া থেকে লাউসেনকে কতকটা দূরে রাখলে লাউসেনের চরিত্র উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতো।

লাউসেন

শুধু লাউসেন নয়, কালুডোম ও লখা ডোমের চরিত্রও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দুটি চরিত্রই বীরত্বে সমুজ্জ্বল। কালু ডোম লাউসেনের বিশ্বস্ত অনুচর। সকল

বিপদে কালু সপরিবারে লাউসেনের সহায়তা করেছে। দেবীর মায়ায় সে একবার যুদ্ধ থেকে বিরত থেকেছে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কাম্বা ডোমের কাছে সত্য রক্ষার জন্য সে অবহেলাভরে আত্মদান করেছে। লাউসেনের মঙ্গলকামনাতেই সে বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেও প্রতিজ্ঞা রক্ষায় কুণ্ঠিত হয় নি।

কালু ডোম

লখাই ডোম কালু ডোমের পত্নী। তার চরিত্রটিতে অদ্ভুত বীরত্ব এবং সংযম দেখা যায়। কালুডোম পার্বতী পূজায় ও মদ্যপানে নিরত হলে লখাই একাই ময়না রক্ষার ভার নিয়েছে, পুত্রগণকে প্ররোচিত করেছে যুদ্ধে। পুত্র যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করলে লখাই বলেছে :

লখাই ডোম

মোর দুধ খেয়ে বেটা রণভীত হলি।
তু বেটা তখনি কেন হয়ে না মরিলি॥

পুত্র যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। শোকে লখাই চোখের জলে কাপড় ভিজিয়েছে কিন্তু আত্মবিস্মৃত হয় নি স্বামীহন্তা বিশ্বাসঘাতককেও লখাই হত্যা করেছে। এই চরিত্রটিতে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আছে মনে হলেও এরূপ চরিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ।

স্বল্প পরিসরে সাকার পত্নী ময়ুরার চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সাকা যুদ্ধে যেতে অস্বীকৃত হলে ময়ুরা তাকে ভর্ৎসনা করেছে—যুদ্ধে উৎসাহিত করেছে। ময়ুরা স্বামীকে বলেছে :

ময়ুরা

মহাগুরু বচন রাজার লুণ খেলে।
পাতক সঞ্চয় কেন কর বুক হেলে॥

এই উক্তিতেই ময়ুরার তেজস্বিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং কৃতজ্ঞতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে নারীচরিত্রগুলি অধিকতর উজ্জ্বল। লাউসেনের পত্নী কলিঙ্গা এবং কানাড়া উভয়েই বীরাঙ্গনা। ডোমসৈন্য পরাভূত হওয়ার পর নগর রক্ষার জন্য কলিঙ্গাও যুদ্ধে গেছে।

কালিঙ্গ

যুদ্ধে পরাভূত হয়ে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করে সে প্রকৃত বীরনারীর পরিচয় দিয়েছে।

বীরাঙ্গনা কানাড়ার চরিত্রটিও সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বীরাঙ্গনা কানাড়া গৌড়েশ্বরের সৈন্যদলের সম্মুখীন হতে বিন্দুমাত্র ভীত হয় নি। পিতা সপরিবারে পলায়িত। কিন্তু এই নির্ভিকা বালিকা যোদ্ধার বেশে অশ্বারোহণে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হয়েছে লাউসেন তার আকাঙ্ক্ষিত পতি। সেই লাউসেন যখন প্রতিজ্ঞা করেছে যে কানাড়ার হাতে পরাজিত হলে তবে সে কানাড়াকে বিয়ে করবে, তখন কানাড়া বল্‌ছে :

কানাড়া

মরি যে তোমার হাতে মোক্ষ ফল পাব।
হানি যে তোমার শির সহমৃতা হব॥

প্রেম এবং বীরত্বের সমন্বয়ে চরিত্রটি এখানে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লাউসেনের অনুপস্থিতিতে মহামদ সসৈন্যে ময়না নগর আক্রমণ করলে ডোম সৈন্য পর্যুদস্ত হোল—কালুডোম সপরিবারে প্রাণ দিল—কিন্তু কানাড়া অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে মহামদের সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন করেছে। অবশেষে সে মহামদকে তার কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তিও দিয়েছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র রঞ্জাবতী। সুন্দরী তরুণী রঞ্জাবতীর সঙ্গে বৃদ্ধ কর্ণসেনের বিয়ে হয়েছে। বৃদ্ধ কর্ণসেনকে রঞ্জাবতী প্রকৃত হিন্দু রমণীর মতই স্বীকার করে নিয়েছে। অনুযোগ কখনও করে নি। বরঞ্চ মহামদ কর্ণসেনকে আটকুড়া বলে অপমান করলো এবং রঞ্জাবতীকে বন্ধ্যা বলে গালাগালি দিল, তখন রঞ্জাবতী ক্ষুব্ধ হয়ে স্বামীর অপমানকে নিজের অপমান বলে গণ্য করেছে এবং পিতামাতা ভ্রাতার সঙ্গে সকল সম্পর্কে চুকিয়ে দিয়েছে।

রঞ্জাবতী

আজ হতে ও পথে আপনি দিনু কাঁটা।
সোদর বচন বুকে বাজে যেন ঝাঁঠা॥

ভ্রাতৃকৃত অসম্মান দূর করার জন্য রঞ্জাবতী বন্ধ্যাত্ব মোচনের উদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে—কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে এবং পরিশেষে ধর্মের শালে ভর দিয়ে দেহত্যাগ করেছে। এই তপস্বিনী এবং তেজস্বিনী রমণী প্রকৃতই বীরাঙ্গনার মর্যাদা লাভের যোগ্যা। এমন জননী বলেই লাউসেনের মত পুত্র লাভ হয়েছে। কিন্তু রঞ্জাবতীর চরিত্রে শেষ পর্যন্ত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। পুত্রের জননী হওয়ার পর রঞ্জাবতীর এই তেজস্বিতা এবং দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায় না। সে মনকা-মেনকা-যশোদার সমতুল্যা গতানুগতিক স্নেহময়ী জননীতে পরিণত হয়েছে। এর ফলে বাস্তবতা রক্ষা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রঞ্জাবতী চরিত্রের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পুত্র লাউসেনকে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে বিদায় দিতে গিয়ে যখন রঞ্জাবতী বলে :

বরঞ্চ এমন কেহ মহামল্ল থাকে।
বিক্রমে বাছারে মোর খোঁড়া করি রাখে।
চরণ ভাঙিলে ঘুচে গমনের আশ।
ঘরে বসে চাঁদ মুখ দেখি বার মাস॥—

তখন পার্বতী উমার মত তপস্বিনী এবং তেজস্বিনী রঞ্জাবতীকে আর খুঁজে পাইনা।

কর্পূর সেন

ছোটখাট পুরুষ চরিত্রগুলি তেমন উজ্জ্বল হয়ে না উঠলেও বাস্তবানুগ হয়েছে। কর্পূরসেন লাউসেনের ভাই হলেও এবং একত্রে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করলেও সে ভীরু—কাপুরুষ। বিপদের সময় লাউসেনকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করতে সে ইতস্ততঃ করে না। কোন দৈব প্রভাব কর্পূরের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে নি। কর্পূর চরিত্রটি জীবন্ত ও বাস্তব। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন কর্পূর সেন সম্পর্কে লিখেছেন, "একমাত্র কর্পূর চরিত্র বাঙ্গালীর খাঁটি নকসা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কর্পূর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লাউসেনকে খুব ভালবাসে। কিন্তু সে দাদাকে যত ভালবাসে নিজেকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভালবাসে।"

বৃদ্ধ রাজা গৌড়েশ্বরের চরিত্রটিও বাস্তবানুগত এবং পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ। বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর অকর্মণ্য, মেরুদণ্ডহীন—শ্যালক মহামদের হাতের পুতুল মাত্র। তাঁর চরিত্রে কোন ব্যক্তিত্বই নেই—নেই কোন প্রকার দৃঢ়তা। গৌড়রাজ স্ত্রৈণ। পত্নীর ভ্রাতা মহামদের চরিত্র জানা সত্ত্বেও তিনি কিছু করতে অক্ষম। তিনি বলছেন,

অল্পাদি পাত্র হত পেত বড় দাব।
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব॥

তৎসত্ত্বেও সোমঘোষকে মহামদের চক্রান্ত থেকে মুক্ত করে তিনি স্বাধীন সত্তার পরিচয় দিয়েছেন। গৌড়রাজ অনুগত প্রজার প্রতি সহানুভূতিশীল। বৃদ্ধ কর্ণসেনের দুর্ভাগ্যে তিনি সমবেদনাপরায়ণ। তিনি সুন্দরী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁকে পত্নীর পরামর্শের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। মহামদকে তিনি ভয় করেন। তাই মহামদকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে তবে রঞ্জাবতীর বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তাঁরই সভায় তাঁরই সাক্ষাতে তাঁরই অনুগত কর্ণ সেনকে যখন মহামদ অপমানিত করলো তখন যেভাবে গৌড়রাজ সেই অপমানকে নত মস্তকে মেনে নিলেন এবং সভা ত্যাগ করলেন, তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বহীনতা এবং অকর্মণ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন সৃষ্টি হয়েছে। মহামদের সকল অন্যায় কর্মকেই তিনি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে গৌড়রাজের সুন্দরী তরুণী কানাড়াকে বিয়ে করার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা এই রূপমুগ্ধ অকর্মণ্য বৃদ্ধের চরিত্রটিকে হাস্যকর করে তুলেছে। গৌড়ারাজের চরিত্রে কোন প্রকার মহত্ত্ব আরোপিত না হওয়ার ফলে চরিত্রটি স্বভাবসঙ্গত এবং সুসমঞ্জস হয়েছে।

কর্ণসেন

কর্ণসেনের চরিত্রটিতেও বিশিষ্টতা নেই—কিন্তু স্বাভাবিকতা আছে। কর্ণসেন যুদ্ধে ছয় পুত্র হারিয়েছে। তার পুত্রবধূগণ সহমৃতা হয়েছে পত্নী শোকে প্রাণত্যাগ করেছে। তথাপি বৃদ্ধ বয়সে সর্বস্ব হারিয়েও তার সংসার বাসনা হ্রাস পায় নি। পুত্রবধূ এবং পত্নীর

মৃত্যুশোক সত্ত্বেও সুন্দরী রঞ্জাবতী লাভের প্রলোভন দমন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। এতে চরিত্রটির মহিমা খর্ব হয়েছে। তরুণী ভার্যার মনোরঞ্জনের জন্য কর্ণ সেনকে রাজদরবারে শ্বশুর শ্যালক প্রভৃতির সংবাদ নিতে আসতে হয়েছে। মহামদ কর্তৃক অপমানিত হয়ে বৃদ্ধ কর্ণ সেন নীরবে ঘরে ফিরে এসেছে এবং পত্নীর কাছে নিজের ও পত্নীর অপমানের কথা ব্যক্ত করেছে। কর্ণসেনের চরিত্রে কোন ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় নি।

অপর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হরিহর বাইতি। লাউসেন হাকন্দে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখানোর কালে একমাত্র সাক্ষী ছিল হরিহর বাইতি। সে যাতে গৌড়েশ্বরের কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, এজন্য মহামদ প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে হরিহরের কাছে গেল। মহামদর ডাকাডাকিতে হরিহর ঘরে আত্মগোপন করে।

হরিহর বাইতি

হরিহর বলি পাত্র ঘন ঘন ডাকে।
তরাসে বাইতি কোণে গুত করে ঢাকে ॥

হরিহর ধর্ম চিন্তা করলেও শেষ পর্যন্ত ধনের লোভ সামলাতে পারে না। "ধন দেখে ধৈরজ ধরিতে নারে মন।" তাই সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার অঙ্গীকার করে।

ধর্ম ছাড়ি বাইতি করিল অঙ্গীকার।
মিথ্যা সাক্ষী মহাপাত্রে দিব দশবার ॥

হরিহর পত্নীর কাছে অধর্মের পক্ষে অনেক সাফাই গাইল। কিন্তু সাক্ষ্য দেবার সময়ে সে সত্য কথাই প্রকাশ করে ফেললো। অবশ্য কোন কোন কবি হরিহরের জিহ্বায় সরস্বতীকে অধিষ্ঠিত করিয়েছেন। হরিহরের মত সরল প্রকৃতির নিম্নশ্রেণীর লোকের পক্ষে ধনের লোভ এবং অধর্ম আশ্রয়ের জন্য বিবেকের দংশন এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মপথে সাক্ষ্যদান অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছে। চোর অপবাদ দিয়ে হরিহরকে যখন শূলে স্থাপন করা হোল, তখনও ধর্মের জন্য হরিহরের করুণ ক্রন্দন তার চরিত্রকে মহিমোজ্জ্বল করে তুলেছে। মৃত্যুর

জন্য হরিহরের ক্ষোভ নেই—কিন্তু ধর্মপথ নিন্দিত হবে এটাই তার বেদনার একমাত্র বেদনার কারণ।

শূলিতে পরাণ যায় আমি নাহি কান্দি তায়
কান্দিয়া কাতর এই শোকে।
তোমার দাসের দাস মিথ্যাবাদে হয় নাশ
ধর্ম মিথ্যা পাছে বলে লোকে॥

মহামদ

ধর্মমঙ্গল কাব্যের মহামদ পাত্র—গৌড়রাজ শ্যালক ভিলেন চরিত্র। মহামদ নিষ্ঠুর হীনচেতা—চক্রান্তকারী উদ্ধত ও প্রজাপীড়ক। ন্যায়-অন্যায় বোধ তার নেই। লাউসেনকে বিপন্ন করার সর্বপ্রকার চেষ্টাই সে করেছে। মিথ্যার আশ্রয়—উৎকোচ প্রদান—শিশুহত্যার চেষ্টা—মানীর সম্মানহানি—অকারণে নিরীহ প্রজাপীড়ন—কোনটিতেই তার বাধে না। তার বিবেকবুদ্ধি কিছুই নেই। ছলে বলে কৌশলে কার্যসিদ্ধি করাই তার অভিপ্রায়। অথচ লাউসেনের সঙ্গে বিরোধের কোন সঙ্গত কারণ তার নেই। তার ক্রোধের কারণ হতে পারতো গৌড়েশ্বর। কিন্তু বিনা দোষে ভগ্নী, ভগ্নীপতি ও ভাগিনেয়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে শত্রুতা করার কোন হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। সে নিজেই কংসের ভূমিকা গ্রহণের সংকল্প করেছে বটে, কিন্তু কংসের কৃষ্ণবিরোধিতার হেতুস্বরূপ কৃষ্ণ কর্তৃক হৃতরাজ্য হওয়ার যে ভয় ছিল—মহামদের পক্ষে সে ভয় ছিল না। শত্রুতা করার জন্যই মহামদের শত্রুতা। লাউসেনকে বড় করে দেখাবার উদ্দেশ্যেই এই চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছে। চরিত্রটির পূর্বাপর সঙ্গতিও আছে। সে যেমন খল, তেমনি ভীরুও। লাউসেনের অনুপস্থিতিতে ময়না নগর আক্রমণকালে কানাড়ার হাতে পরাজিত হয়ে সে দ্রুত পলায়নের চেষ্টা করেছে।

প্রাণভয়ে পাপমতি পলায় কাতর।
ধাওয়া ধাই ধুমসী বলিছে ধর ধর॥

তরাসে তরলতর ফাঁফর হইয়ে।
আখবাড়ী গুড়ি গুড়ি লুকাইল ধেয়ে॥

দোর্দণ্ড প্রতাপ গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র মহামদের আখবাড়ীতে আত্মগোপনে তার চরিত্রটি কৌতুককর হয়ে উঠেছে। কানাড়ার লোকজনের হাতে নাকাল হয়ে মহামদ পালিয়ে আত্মগোপন করতে গিয়ে গৃহস্থ বাড়াতে তস্কর রূপে ধৃত হয়ে প্রহৃত হবার কালেও তার নির্লজ্জ উক্তিটি উপভোগ্য :

আমি মহামদ পাত্র না মার না মার।
দারুণ দৈবের দোষে এ দশা আমার॥

মহামদ শুধু নিষ্ঠুর নয়—নির্বোধও। হরিহর বাইতিকে শূলে চাপাতে গিয়ে সে দেখেছে যে হরিহর স্বশরীরে বিমানে চেপে স্বর্গে গেছে। মহামদও তার পুত্রদের স্বশরীরে স্বর্গে পাঠাতে একে একে শূলে চাপিয়েছে। তার দারুণ জেদ এক্ষেত্রেও কার্যকরী হয়েছে। পুত্রকে সে স্বশরীরে স্বর্গে যেতে দেখবেই। তাই ষষ্ঠ পুত্র ছয় মাসের শিশুটিকেও সে শূলে চাপিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছে। মহামদ চরিত্রটি পূর্বাপর সুসঙ্গত। একটা অহেতুক অন্যায় জেদের বশে সে যেমন ভগ্নী, ভগ্নীপতি ও ভাগিনেয়ের সর্বনাশ সাধনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, তেমনি জেদের বশেই সে নিজের ছয় পুত্রকে বিনাশ করেছে।

যদিও চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ুদত্ত চরিত্রের শঠতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে মহামদের তুলনা হয় না, তথাপি মহামদের চরিত্রটি একটি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ হিসাবে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকতা :

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "ধর্মমঙ্গল কাব্যের কোন পাত্রই ঐতিহাসিক নয়, কাহিনী ত ঐতিহাসিক নয়ই। তবে গৌড় দরবারের বর্ণনায় যেটুকু বাস্তব রঙ দেখা যায়, তাহা সেকালের রাজদরবারের বিলীয়মান স্মৃতিরই অনুসারী।" তথাপি ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে পণ্ডিতদের

গবেষণার অন্ত নেই। লাউসেনের কাহিনীর মধ্যে কোন সত্যঘটনার ছায়া আছে বলে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন। তিনি লিখেছেন, "লাউসেনের কাহিনীর পশ্চাতে কোন স্থানীয় ঘটনার কিঞ্চিৎ ছায়াপাত হইতে পারে। কারণ সমস্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের কাহিনীর ছাঁদটি প্রায় একই প্রকার। স্থানীয় সুপরিচিত ঘটনা যখন সাহিত্যে স্থান পায়, তখন তাহাতে কিছু সত্য থাকিয়া যায়। লাউসেনের বীরত্বব্যঞ্জক গল্প কাহিনীটি সেই দিক দিয়া স্থানীয় সত্য ঘটনার উপর বোধহয় যৎকিঞ্চিৎ নির্ভর করিয়াছিল।"

লাউসেনের উপাখ্যানে পাওয়া যায় যে সেই সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে ছিলেন ধর্মপালের পুত্র। ইছাই ঘোষ সেই সময়ে বিদ্রোহ করে। ধর্মপালের এই পুত্রটির নাম কোন কবিই উল্লেখ করেন নি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, এই গৌড়েশ্বর ধর্মপালের পুত্র দেবপাল এবং লাউসেন ও ইছাই ঘোষ দেবপালের দুই সামন্তরাজা। ঢেক্করীগড়ের অধীশ্বর মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরী ঘোষের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। ঢেক্করী গড়ের অধিপতি ঈশ্বরী ঘোষ ও ঢেকুর গড়ের অধীশ্বর ইছাই ঘোষ এক ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব। অজয়নদের তীরে কেন্দুবিল্বের নিকটবর্তী স্থানে ঢেকুর গড় এবং ইছাই ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ভবানীর ভগ্ন মন্দির জনশ্রুতিতে এখনও জীবিত আছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনটি দ্বাদশ শতাব্দীর বলে স্থির করেছেন। কেউ কেউ ঈশ্বরী ঘোষকে লক্ষ্মণ সেনের সামন্ত বলে অনুমান করেন। আবার কারো মতে রামপালের সমসাময়িক ঢেক্করীর রাজা প্রতাপসিংহই ঈশ্বর ঘোষ। মনে হয় ঢেক্করীর ঈশ্বরী ঘোষই ধর্মমঙ্গল কাব্যে ইছাই ঘোষে পরিণত হয়েছেন। ভাগলপুর তাম্রশাসনে পাওয়া যায় যে দেবপালের সেনাপতি জয়পাল উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজাকে পরাজিত করেছেন। লাউসেন কামরূপ জয় করে। এবং কামরূপ রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করে। অনেকে মনে করেন, জয়পালের কামরূপ

ও উৎকল (কলিঙ্গ) বিজয় লাউসেনের কাহিনীতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কলিঙ্গা কলিঙ্গ রাজকন্যা হওয়াই সম্ভব,—তথ্য বিকৃতির ফলে কলিঙ্গা কামরূপ রাজকন্যায় পরিণত হয়েছে। প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধর্মপালের পুত্রকে পালবংশীয় সম্রাট ধর্মপালের পুত্র দ্বিতীয় ধর্মপাল বলে স্থির করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় ধর্মপালের অস্তিত্ব ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় না। নগেন্দ্রনাথ বসু ঢেক্করীগড়কে আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় অবস্থিত বলে গণ্য করে ঈশ্বর ঘোষকে রামপালের সমসাময়িক বলে মনে করেন। ডঃ শহীদুল্লার মতে লাউসেনের প্রকৃত নাম লবসেন। ইনি রামপালের পরে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। বিষ্ণুপুরের ১২।১৩ মাইল দূরে ময়নাপুর গ্রাম আছে, এখানে ধর্মঠাকুরের মন্দিরও আছে। জনশ্রুতিতে জানা যায় যে এখানে লাউসেনের রাজধানী ছিল। বর্ধমান জেলায় বর্ধমানের পূর্বাঞ্চলে বল্লুকানদীতীরে ময়নাগড় গ্রাম আছে। এই অঞ্চলেও ধর্মরাজের পূজা ইত্যাদি হয়ে থাকে। তমলুক অঞ্চলেও ময়নাগড় গ্রাম আছে। সুতরাং মনে হয়, চাঁদ সদাগরের চম্পকনগরের মত পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে ময়নাগড়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। ধর্মমঙ্গল কাহিনীর জনপ্রিয়তার এটাই প্রমাণ। তিব্বতায় ঐতিহাসিক তারানাথ লবসেন নামক একজন গৌড়ের রাজার নাম উল্লেখ করেছেন। তিব্বতীয় কাহিনী অনুসারে লাউসেন পালরাজ দক্ষপালের মন্ত্রী ছিলেন, পরে দক্ষপালকে বিতাড়িত করে নিজেই রাজা হন। বাঙ্গালা পঞ্জিকায় রাজচক্রবর্তীদের মধ্যে লবসেনের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বর্ধমান জেলার পশ্চিম সীমান্তে অজয় নদের তীরে সেনপাহাড়ী পরগণায় বর্তমান গৌরাণ্ডি গ্রামের কাছে কর্ণগড় নামে একটি স্থান আছে। কোন কোন পণ্ডিতের অনুমান, এই কর্ণগড়ই কর্ণসেনের রাজধানী। ইছাই ঘোষ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে কর্ণসেন ময়নাগড়ে বাস করেন এবং তাঁর পুত্র লাউসেন গৌড়রাজের অধীনে সামন্তরাজা হয়েছিলেন। গৌরাণ্ডি গ্রামে ইছাই গোয়ালার রাজধানী ছিল বলেও প্রসিদ্ধি আছে।

এই সকল ঐতিহাসিক সংকেত এবং কিংবদন্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্যের ইঙ্গিত দেয় সত্য; কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণের অভাবে ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করাই সম্ভব নয়। কেবল এইটুকু মাত্র অনুমান হয় যে কোন একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এই কাহিনীর অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে; তবে প্রকৃত ঘটনা কালের প্রভাবে মানুষ বিস্মৃত হওয়ায় লোকপরম্পরায় প্রচলিত কিংবদন্তীগুলিই ধর্মমঙ্গল কাব্যে স্থান পেয়েছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্য রাঢ়ের জাতীয় কাব্য ঃ

ধর্মমঙ্গল কাব্য মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মত সমস্ত বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত নয়। এই কাব্যের প্রসার বাঙ্গালা দেশের অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ, —এই অঞ্চলকে রাঢ় অঞ্চল বলা হয়। ভাগীরথীর পশ্চিমতীর থেকে ছোটনাগপুর পর্যন্ত এই কাব্যকাহিনীর সীমা। উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে ধর্মমঙ্গলের কোন ব্যাপ্তি নেই। ধর্মরাজও রাঢ় অঞ্চলের দেবতা। বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলেই এই দেবতার জনপ্রিয়তা। ধর্মরাজের গাজন রাঢ় অঞ্চলেরই একটা প্রসিদ্ধ উৎসব। ধর্মমঙ্গলের কবিগণ প্রায় সকলেই রাঢ় অঞ্চলের লোক। এই কাব্যকাহিনীতে রাঢ় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে। চরিত্রগুলির রুক্ষতা বীরত্ব ইত্যাদিতে মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিকতা অপেক্ষা রাঢ় অঞ্চলের প্রভাবই সুস্পষ্ট। কবিদের আত্মবিবরণীতে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের রাঢ় দেশের গ্রামের ও গ্রামের মানুষের বিবরণ আছে। ময়না, ঢেঁকুর, বল্লুকা নদী প্রভৃতি রাঢ় অঞ্চলেই যত্রতত্র পাওয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলের জাতীয় বিশিষ্টতা ধর্মমঙ্গল কাব্যে মূর্ত হওয়ার জন্যই এই কাব্যগুলিকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বা জাতীয় মহাকাব্য বলা হয়ে থাকে। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মমঙ্গলকে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য বলতে স্বীকৃত নন। কারণ তাঁর মতে জাতীয় মহাকাব্য যেমন জাতীর জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত থাকে, ধর্মমঙ্গল কাব্য

সেরূপভাবে রাঢ়ের জাতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িত নয়। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মপূজা এবং ধর্মঠাকুরের কাহিনী সীমাবদ্ধ। রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলী মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য যেমন বাঙ্গালীর উচ্চ বর্ণের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে, ধর্মমঙ্গল তেমন নয়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য পুরাপুরি স্বীকার করা যায় না। এককালে হয়ত কোন নিম্ন বর্ণের মানবসমাজ থেকে ধর্মরাজের পূজা বা কাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু ধর্মরাজের পূজা বাঙ্গালীর সকল শ্রেণীর কাছেই গৃহীত হয়েছে এবং ধর্মরাজের উৎসব বাঙ্গালীর সবজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও লিখেছেন, "লাউসেনের কাহিনীর পশ্চাদ্‌পটে রাঢ়ের বিস্মৃত যুগের কাহিনী নিহিত থাকিলেও জাতীয় মহাকাব্য হইতে গেলে যেরূপ সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাপকতা প্রয়োজন ধর্মমঙ্গলের আঞ্চলিক কাহিনী সেরূপ ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই।"

এ বিষয়ে আমদের বক্তব্য এই যে বিংশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যগুলির জনজীবনে প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। ইংরাজী শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রভাব এ দেশে দৃঢ়মূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর পুরাতন সংস্কৃতি এবং গভীর ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি টলেছে। আপন সংস্কৃতিকে বাঙ্গালী ভুলতে বসেছে। যুগের পরিবর্তনে দৈবনির্ভরতা মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। তাই মঙ্গলকাব্যগুলির ব্যাপকতা এবং মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রভাব সম্যকভাবে নির্ণয় করা সহজ নয়। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে বহু কবি যখন লাউসেনের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেন—, কাব্য গান করেছেন গায়নরা কখনও বা কবিরা স্বয়ং, তখন এই কাব্যকাহিনীর ব্যাপকতা ছিল বলেই মনে হয়। কবিদের মধ্যে যেমন উচ্চ এবং নিম্ন বর্ণের মানুষ ছিলেন,—শ্রোতার মধ্যেও তেমনি উচ্চনীচ নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মানুষই থাকতো। এ যুগে মনসামঙ্গল ছাড়া অন্য কোন মঙ্গলকাব্যেরই ব্যাপকতা দেখা যায় না। মঙ্গলচণ্ডী গ্রাম্য মেয়েদের ব্রতের মধ্যেই এখনও বেঁচে আছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা না থাকলে প্রায় তিনশত

বৎসর যাবৎ তা বেঁচে থাকতে পারতো না। তবে একথা হয়ত সত্য যে লাউসেনের বীরত্ব গাথা বাঙ্গালীর শান্ত জীবনধারার সঙ্গে মিশে যেতে পারেনি। তথাপি একথা স্বীকার্য যে রাঢ়ের জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে, রাঢদেশের বহুসংখ্যক কবির দ্বারা রচিত রাঢ়ের মাটিতে উদ্ভূত কাহিনী সর্বসাধারণের মধ্যে এককালে প্রসারিত হয়েছিল। একমাত্র রাঢ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাঢ়ের জীবনধারার বৈশিষ্ট্যবাহী—রাঢ়ের কবিকুলের দ্বারা রচিত ও গীত এই কাব্যটি রাঢ়ের জাতীয় কাব্য হিসাবে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে বৌদ্ধপ্রভাব ঃ

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন ঃ "বৌদ্ধধর্ম নিম্ন শ্রেণীর হাতে পড়িয়া যে বিকৃত ভাব ধারণ করে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি তাহার হিন্দু সংস্করণ। রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতিতে বৌদ্ধভাবের যে স্পষ্ট পরিচয় আছে, পরবর্তী ধর্ম কাব্যগুলিতে ক্রমেই তাহা তেত্রিশ কোটি হিন্দু দেবতার উঠন্ত প্রভাবের নীচে চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি স্বীকার্য যে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বৌদ্ধরাজা ও সাধুগণের মহিমা কীর্তন করিতেই প্রথম রচিত হইয়াছিল।" পণ্ডিতদের মতে বৌদ্ধধর্মের অবনতির যুগে 'সহজিয়া সম্প্রদায়' ও 'নাথ সম্প্রদায়ের' জন্ম হয়। নাথপন্থী শৈব ও যোগীদের ধর্মমতের সঙ্গে অনার্য প্রভাবের সংমিশ্রণের ফলে ধর্মঠাকুরের উপাসনার রীতি পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধ স্তূপ—শূন্যবাদ—বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্তর্গত ধর্ম প্রভৃতির সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সাদৃশ্যবশতঃ ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধদেবের রূপান্তর বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। ধর্মঠাকুরের পূজক ডোম জাতিকে ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত বৌদ্ধ বলে মানা হয়। ধর্মঠাকুরের আদি পুরোহিত রামাই পণ্ডিত ডোম জাতীয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও ডোমজাতির ভূমিকা কম নয়। লাউসেনের কাহিনীতে কালুডোম ও তার পত্নী লড়াই ডোম ও তাদের পুত্র পরিবার—প্রভৃতি অনেকটা স্থান দখল করে আছে। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানে সদাডোমের কাহিনী আছে। ধর্মপূজা বিধানে

ও শূন্যপুরাণে যে শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন ধর্মের পূজানুষ্ঠান বর্ণিত হয়েছে তাতে ও ধর্মকে বৌদ্ধ দেবতা বলে অনেক পণ্ডিত গ্রহণ করেছেন। শূন্যপুরাণের মতে সিংহলে ধর্মের প্রাধান্য এবং ধর্মপূজাবিধানে ধর্মপূজকদের সদ্ধর্মী আখ্যা ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধের সাদৃশ্য বহন করে।

ধর্মপূজায় এবং ধর্মমঙ্গলে বৌদ্ধপ্রভাব হয়ত আছে তথাপি ধর্মোপাসনা বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি একথা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। ধর্মঠাকুরের রূপ এবং গুণ কল্পনায় বৈদিক সূর্য দেবতা এবং বরুণ—পৌরাণিক শিব, বিষ্ণু, যম এবং সোম ;—অনার্য দেবতা 'দরম্' প্রভৃতির সঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাবের সংমিশ্রণে উৎপত্তি হয়েছে ধর্মঠাকুর এবং ধর্মোপাসনার। ধর্মপূজায় পশু বলিদান, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি ধর্মঠাকুরের বুদ্ধত্বকে অপ্রমাণিত করে। ধর্মঠাকুর কুষ্ঠরোগের দেবতা। বুদ্ধের সঙ্গে কুষ্ঠ রোগের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মোপাসনায় পুত্রলাভ হয়—বুদ্ধোপাসনায় পুত্রলাভের কথা শোনা যায় না। ধর্মঠাকুরের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে কোন কোন সহজিয়া নিবন্ধের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ধর্মের গাজনের বিবাহ-অনুষ্ঠান ধান্য কৃষির কাব্যরূপক, ধর্মের গাজনের বোলান বৈদিক যাগযজ্ঞে ঋষিদের বিচারসভার আধুনিক রূপ ; ধর্মঠাকুরের সৃষ্টিকাহিনী ঋগ্বেদের সৃষ্টিকাহিনীর অনুরূপ, সদাডোমের কাহিনীতে একাদশীর দিনে ধর্মঠাকুরের মাংস পারণার কাহিনী বৈদিক একাদশিনী ইষ্টি থেকে আগত, ধর্মরাজের গাজনের অনুষ্ঠান বৈদিক রাজসূয় যজ্ঞের সঙ্গে এবং ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ঋগ্বেদের যমযমীর উপাখ্যানের সাদৃশ্য বাহক। ধর্মমঙ্গল কাব্যের হরিশ্চন্দ্র লুইধরের উপাখ্যান ঐতরেয় ব্রাহ্মণের হরিশ্চন্দ্র-রোহিতের কাহিনী থেকে আগত। ধর্মমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিপ্রকরণ প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে বর্ণিত সৃষ্টিবর্ণনার অনুরূপ। সুতরাং ধর্মমঙ্গল কাব্যে এবং ধর্মঠাকুরের পূজার্চনায় বৈদিক পৌরাণিক, লৌকিক এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে,—তাতে সন্দেহ নেই। অনার্য প্রভাবও পড়া অসম্ভব নয়। এমনকি তুর্কী সৈন্যদের

প্রভাব ও পড়েছে ধর্মঠাকুরের অশ্বারোহী মূর্তিতে। এই সব দিক বিবেচনা করে ধর্মোপাসনা যে নিছক নিম্নশ্রেণীর মানুষের হাতে তৈরী বিকৃত বৌদ্ধধর্ম, একথা কোন মতেই স্বীকার করা চলে না। তবে একথা সত্য যে ধর্মোপাসনায় বৌদ্ধধর্মের বিলীয়মান প্রভাবটি আপন ছাপ রেখে গেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের বীরত্ব ও মহামদের চক্রান্তের মূল কাহিনীতে বৌদ্ধপ্রভাব অপেক্ষা রামায়ণ ও ভাগবতের প্রত্যক্ষ প্রভাবই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধর্মপূজা বিধানে বৌদ্ধপ্রভাব কিছু কিছু লক্ষিত হলেও ধর্মমঙ্গল কাব্যে বৌদ্ধপ্রভাব তেমন স্পষ্ট নয়।

ধর্মমঙ্গলের কবি ঃ

খৃষ্টীয় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। প্রায় আঠারজন কবির কাব্য পাওয়া গেছে। অধিকাংশ কবির রচনাই অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে। ধর্মমঙ্গলের দুইটি কাহিনী—হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী ও লাউসেনের কাহিনী। তন্মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীটিই প্রাচীনতর বলে বোধহয়। ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণ ও যাদুনাথের ধর্মপুরাণে লাউসেনের কাহিনী নেই।

ময়ূর ভট্ট ঃ ধর্মমঙ্গলের কবিগণ অধিকাংশই ময়ূরভট্টকে আদি কবি বলে বন্দনা করেছেন। মাণিক গাঙ্গুলী লিখেছেন,

বন্দিয়া ময়ূরভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥

ঘনরাম লিখেছেন, "ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি।" সীতারাম দাস লিখেছেন,

ময়ূরভট্ট মহাশয় যোগে নিবন্ধিল
প্রকাশ করিল যেই ধর্মের মঙ্গল।
তাহার স্মরণ করি সবে গাই গীত।

কিন্তু ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায় নি। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ময়ূরভট্টের রচিত 'শ্রীধর্মপুরাণ' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভাষা ও রচনাশৈলী আধুনিক কালের হওয়ায় পণ্ডিতগণ এই কাব্যটিকে প্রাচীন কবির রচনা বলে স্বীকার করেন না। ডঃ সুকুমার সেনের মতে গ্রন্থটি রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যের রচনা। বীরভূমের স্বর্গীয় শিবরতন মিত্র সংগৃহীত ময়ূরভট্টের পুঁথিটিকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পঞ্চদশ শতকের রচনা বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু পুঁথিটির আর সন্ধান পাওয়া যায় নি। সংস্কৃত কবি ময়ূরভট্ট সূর্যশতক রচনা করে কুষ্ঠরোগ মুক্ত হয়েছিলেন। ধর্মমঙ্গলের কবি ময়ূরভট্ট সম্পর্কে অনুরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অনেকে মনে করেন যে সূর্যশতক রচয়িতা ময়ূরভট্টই ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "মনে হয়, ময়ূরভট্ট কোন বাঙ্গালী কবির প্রকৃত নাম নহে। সংস্কৃত সূর্যশতক রচয়িতা ময়ূরভট্টের নামটিই এখানে কোন বাঙ্গালী কবি গ্রহণ করিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন।"

খেলারাম : পণ্ডিত হারাধন দত্ত খেলারাম নামে এক প্রাচীন ধর্মমঙ্গলের কবির বিবরণ দিয়েছেন। খেলারামের পুঁথি পাওয়া যায় নি। হারাধন দত্ত মহাশয় খেলারামের পুঁথি থেকে যে কালজ্ঞাপক পয়ারটি উদ্ধৃত করেছেন তা নিম্নরূপ :

ভুবন শকে বায়ুমাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥
হে ধর্ম এ দাসের পূরাও মনস্কাম।
গৌড় কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম॥

এ থেকে জানা যায় যে ১৪৪৯ শকাব্দ বা ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে কার্তিক মাসে খেলারাম কাব্য রচনা করেছিলেন। হুগলীর বদনগঞ্জের শ্যামবাজার গ্রামে খেলারামের নিবাস ছিল। খেলারামের কাব্যের নাম গৌড়কাব্য। এর বেশী খেলারাম

সম্পর্কে জানা যায় না। ডঃ সুকুমার সেন খেলারামের পুঁথির অস্তিত্বে এবং উক্ত কালজ্ঞাপক পয়ারের প্রাচীনত্বে সংশয় প্রকাশ করেছেন। খেলারাম নামে এক বা একাধিক গায়নের নামও ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন পুঁথিতে পাওয়া যায়। সুতরাং খেলারাম গায়ন ছিলেন কিংবা কাব্য রচয়িতা ছিলেন, নির্ণয় করা যায় নি।

শ্যাম পণ্ডিত: শ্যাম পণ্ডিত ধর্মমঙ্গলের একজন প্রাচীনতর কবি। তাঁর কাব্যের নাম নিরঞ্জনমঙ্গল। শ্যাম পণ্ডিতের কাব্যের কোন সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নি। যে খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গেছে, তাতে অন্যান্য কবির ভণিতা আছে,—অন্যান্য কবির রচনাও মিশ্রিত হয়েছে। শ্যাম পণ্ডিতের কাব্যের পুঁথি বীরভূম ও বর্ধমান জেলার পশ্চিম দিকে পাওয়া গেছে। মনে হয় কবি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। শ্যাম পণ্ডিতের কাব্যে প্রাচীনত্বের ছাপ আছে, আঞ্চলিক ভাষারও নিদর্শন আছে। গৌড় যাত্রাকালে কামারের কাছে প্রদত্ত লাউসেনের আত্মবিবরণীতে বল্লালসেনের নাম উল্লেখ করে কবি লাউসেনকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছেন। শ্যাম পণ্ডিতের রচনায় নাট্যগুণ এবং স্বচ্ছন্দগতি লক্ষিত হয়।

ধর্মদাস: শ্যাম পণ্ডিতের কাব্যে ধর্মদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। ধর্মদাস একজন স্বতন্ত্র কবি। তাঁর কাব্যের নাম নিরঞ্জনমঙ্গল। ধর্মদাসের কাব্যে সৃষ্টিপত্তন বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ধর্মদাসের বর্ণনা প্রাঞ্জল ও বাস্তবসম্মত। তিনি কাব্যে নানাবিধ পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। ইনি জাতিতে বণিক, নিবাস বসর গ্রামে। ডঃ সুকুমার সেন মন্দারণবাসী বৈদ্য বংশীয় অপর এক ধর্মদাসের উল্লেখ করেছেন। ইনি রূপরামের ধর্মমঙ্গলকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন।

রূপরাম চক্রবর্তী: ডঃ সুকুমার সেনের মতে ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি রূপরাম চক্রবর্তী। মাণিক গাঙ্গুলী তাঁকে আদি কবিরূপে বন্দনা করেছেন।

বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্ম গুণগান॥

রূপরামের কাব্যে হেঁয়ালিতে রচনাকাল লিপিবদ্ধ আছে।

শাকে শীমে জড় হৈলে যত শক হয়।
তিন বাণ চারি যুগ বেদ যত রয়॥
রসের উপরে রস তায় রস দেহ।
এই শকে গীত হৈল লেখা করি লেহ॥

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় এই হেঁয়ালীর অর্থ করেছেন ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ১৫৭১ শক বা ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দ রূপরামের কাব্য রচনার কাল। ডঃ দীনেশ সেনের মতে রূপরাম খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। মাণিকরামের বর্ণনা অনুসারে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য দুইজন রূপরামের অস্তিত্ব স্বীকার করেন; একজন আদি রূপরাম। কিন্তু দুইজন রূপরামের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ হস্তগত হয়নি। ডঃ ভট্টাচার্যের মতে আদি রূপরামের কাব্যের প্রভাব মাণিক গাঙ্গুলী এবং পরবর্তী রূপরামের উপরে পড়েছে। রূপরাম চক্রবর্তীর পূর্ববর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের অপর কোন কবির খাঁটি রচনা পাওয়া যায়নি।

রূপরামের আত্ম-বিবরণী

মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলে যে আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন পরবর্তী কালের মঙ্গলকাব্যের কবিগণ মুকুন্দরামের সেই আত্মবিবরণী অনুসরণ করেই আত্মবিবরণী লিখেছেন। কিন্তু রূপরামের আত্মবিবরণীর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। মুকুন্দরামের আত্মবিবরণীতে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের পটভূমিকায় কবির দুঃখদারিদ্র্যের মর্মান্তিক কাহিনী ঈষৎ কৌতুকের সুরে বর্ণিতহয়েছে। রূপরামের আত্মকাহিনীটি কবির নিজের প্রথম জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্যে মনোরম।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জন্মস্থান দামিন্তা থেকে প্রায় তিন ক্রোশ

উত্তর-পশ্চিমে বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরামের জন্ম হয়। রূপরামের পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তী ছিলেন বড় পণ্ডিত—বাড়ীতে ছিল চতুষ্পাঠী। বহু ছাত্র চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করতো। কবির মায়ের নাম দৈমন্তী বা দময়ন্তী। রূপরাম বাল্যকালে পিতার চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও অভিধান অধ্যয়ন করতেন। কবির ছোট ভাই ও ছোট দুটি বোন—সোনা ও হীরা কবির খুব প্রিয় ছিল। বড ভাই রত্নেশ্বর যেন "জ্বলন্ত আগুন"। রূপরামের পড়াশুনায় অমনোযোগিতার জন্য রত্নেশ্বর কবিকে প্রায়ই ভর্ৎসনা করতেন। পিতার মৃত্যুর পর রত্নেশ্বর সংসারের কর্তা হওয়ায় বড ভাইএর তিরস্কার কবির কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। একদিন বুধবারে বড ভাইএর সঙ্গে ঝগড়া করে রূপরাম গৃহত্যাগের সংকল্প করলেন। এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে পরিধেয় ধুতি ও পাথেয় সংগ্রহ করে রূপরাম গৃহত্যাগ করলেন এবং খুঙ্গি পুঁথি নিয়ে আড়াই ক্রোশ দূরে পাসণ্ডা গ্রামে রঘুনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে হাজির হলেন। পার্শ্ববর্তী আড়ুই গ্রামে রঘুনাথের টোল ছিল। রূপরামের প্রতি রঘুনাথের দয়া হোল এবং রূপরামকে বাড়ীতে রেখে তিনি পড়াতে লাগলেন। রূপরাম একটু উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন। গুরুর সঙ্গে তাঁর তর্কবিতর্ক চলতো। একদিন গুরু বিরক্ত হয়ে পুঁথির বাড়ি দিয়ে রূপরামকে প্রহার করে তাড়িয়ে দিলেন এবং নবদ্বীপে গিয়ে পড়াশুনা করতে নির্দেশ দিলেন। রূপরাম নবদ্বীপে বিদ্যানিধি ভট্টাচার্যের টোলে পড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। শনিবার দুপুরবেলা পলাশনের বিলের কাছে এসে বিপদে পড়লেন। প্রথমেই "গোটা দুই কাছাড খাই গোপালদীঘির পাড়ে।" তারপরেই নিকটে দেখলেন দুটি বাঘ : "দুটা বাঘ দুদিগে বসিয়া লেজ নাড়ে।" এই বিপদের সময়ে ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণের বেশে আবির্ভূত হয়ে রূপরামকে আশ্বস্ত করলেন, তারপরে আদেশ দিলেন ধর্মমঙ্গল রচনা করতে।

> সুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ সুন্দর।
> কলধৌত কাঞ্চন কুণ্ডল ঝলমল॥

তরাসে কাঁপল তনু প্রাণ দুরদুর।
আপনি বলেন ধর্ম দয়ার ঠাকুর॥
আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।
বারদিনের গীত গাও শুন রূপরাম॥
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাদুলি।
তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুঁজে বুলি॥

র্মঠাকুর কবির কানে 'মহাবিদ্যা' মন্ত্র দিয়ে অদৃশ্য হলেন। কবি ভয় পেয়ে দৌড় দিলেন বাড়ীর পথে। মায়ের সঙ্গে দেখা করার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠলো। বেলা শেষে গ্রামে পৌঁছে শাঁখারি পুকুরে এক পেট জল খেয়ে চুপি চুপি বাড়ীর দরজায় হাজির হলেন। প্রথমেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে দেখা। রত্নেশ্বর ভাইকে ভৎর্সনা করলেন, "কালি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আজি আইলা ঘরে।" তিনি ভাইএর পুঁথিপত্র ফেলে দিলেন। ছোট বোন দুটি—সোনা আর হীরা দরজায় বসে ছিল। বড় দাদার ভয়ে তারা মাকে খবর দিতে পারলো না। রূপরামের মায়ের সঙ্গে দেখা করা হোল না। দামোদরের জলে উদর পূর্ণ করে কবি দীঘনগরে পৌঁছালেন। সেখানে এক তাঁতীর বাড়িতে পেট ভরে ফলার খেলেন, কিছু দক্ষিণাও পেলেন। দীঘনগর ছেড়ে পশ্চিম-মুখে চলে কবি গোপভূম পরগণার এড়াল গ্রামে পৌঁছালেন। অতঃপর গোপ-ভূমের রাজা ব্রাহ্মণবংশীয় গণেশ রায় ধর্মের স্বপ্নাদেশ লাভ করে রূপরামকে দ্বাদশ পালায় ধর্মমঙ্গল রচনা করতে বললেন। তখন রাজমহলে বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন শাহ্ সুজা।

গোয়ালাভূমের রাজা গণেশ রায় নাম।
বিপ্রকুল চূড়ামণি বড় ভাগ্যবান॥
তারে গিয়া স্বপনে বলেন নিরঞ্জন।
প্রতিষ্ঠা করিতে তারে দিল নানাধন॥

এতেক দিলেন দ্রব্য শুন সর্বজন।
আচম্বিতে দুটি পাল্য দিল দরশন॥
পাল্য দেখি মহারাজা আনন্দিত মনে।
দ্বাদশমঙ্গল জুড়াইল শুভক্ষণে॥

কবি কাব্য রচনা করে দোহারদের সহায়তায় গানও করতেন।

এই আত্মবিবরণীতে কবি সহজ ভাষায় তাঁর প্রথম জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বাস্তব বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণে—তৎকালীন সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তবে কবি ইচ্ছামত অলৌকিকতার আশ্রয় নিয়েছেন ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব বর্ণনার উদ্দেশ্যে। মুকুন্দরাম পরিণত বয়সে তাঁর প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা যেরূপ কৌতুক সহকারে বর্ণনা করেছেন—সেই বর্ণনায় রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র মনোরমভাবে ফুটে উঠেছে। মুকুন্দরামের সেই বিপুল অভিজ্ঞতা এবং গভীর জীবনবোধের পরিচয় রূপরামের আত্মকাহিনীতে নেই। তথাপি কবির ব্যক্তিজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা একটি ছোটগল্পের আস্বাদ এনে দেয়। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সহৃদয়তা ও অন্তর্দৃষ্টি মিলিত হইয়া এই বর্ণনাটিকে সবিশেষ উপভোগ্য করিয়াছে। পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে যদি আধুনিক ছোট গল্পের স্বাদবাহী কোন টুকরা থাকে, তবে সে রূপরামের এই আত্মকাহিনী।"

রূপরামকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রতিভাবান কবিদের মধ্যে অন্যতম বলা যায়। রূপরামের রচনারীতি সহজ সরল এবং অনায়াস-গতি সম্পন্ন। তাঁর কাব্যে অলংকারের বাহুল্য নেই। স্বচ্ছন্দরীতিতে কাহিনী বর্ণনা পাঠকের মনোহরণ করে। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

কাব্যবিচার

"চরিত্রসৃষ্টি, স্বচ্ছন্দ বর্ণনা, সহজ আলংকারিকতা, শোক ও পরিহাস সৃষ্টিতে রূপরাম প্রায় মুকুন্দরামের কাছাকাছি গিয়া পড়িয়াছেন।"

রূপরামের বর্ণনায় পাণ্ডিত্যের অভাব নেই। জামতি পালায় কুলটা নয়ানীর রূপসজ্জার বর্ণনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় :

কপালে সিঁদুর পরে তপন উদয়।
চন্দন চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয়॥
চন্দ্রকোলে শোভা যেন করে তারাগণ।
ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ॥

জাম্বতী নর্তকীর কাজল ও সিন্দুর বর্ণনাটিও সুন্দর :

মোহন কাজল পরে মোহন সিন্দুর।
প্রভাতের তপন তিমির করে দূর॥

শিশু লাউসেনের বর্ণাটি উৎপ্রেক্ষা অলংকারে অনুপম হয়ে উঠেছে :

নির্মল সুবীর যেন শিরিষের ফুল।
পঙ্কজ সদৃশ দৃষ্টি চরণ রাতুল॥
তিলফুল উন্নতি নাসিকা অনুপাম।
তনুরুচি শোভে যেন দুর্বাদল শ্যাম॥

এই জাতীয় বর্ণনাগুলিতে চিত্ররীতিও উপভোগ্য। বাৎসল্যরস সৃষ্টিতেও কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যানে বলিপ্রদত্ত লুইচন্দ্রকে পুনর্জীবিত দেখে পিতামাতার আনন্দ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

এত শুনি গাজনে ধাইলা রাজরাণী।
লুঞ্যা লুঞ্যা বল্যা ডাকে চক্ষে পড়ে পানি॥
বাপধন বাছা কোথা খোলা ভাই বলে।
লুইচন্দ্র তখন ধাইয়া পড়ে কোলে॥
আচল ধরিয়া লুঞ্যা হাসে খলখল।
মদনা বুকের মাঝে ঝাপিল আঁচল॥

লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিলা পুত্রের বদনে।
রাজরাণী হরিষ আনন্দ বড় মনে॥

চরিত্রসৃষ্টিতেও কবি বহুলাংশে স্বাভাবিকতা রক্ষা করতে পেরেছেন। শালে ভর দিয়ে আত্মবিসর্জনের দ্বারা পুত্রলাভের জন্ত সামুলা যখন রঞ্জাবতীকে বারংবার প্ররোচিত করেছে তখনও রঞ্জাবতী কোন আশ্বাস পায়নি। সামুলার প্রতি রঞ্জাবতীর উত্তর অত্যন্ত বাস্তবতা সম্মত। রঞ্জাবতীকে অসাধারণ না করে কবি একজন সাধারণ নারীতে পরিণত করেছেন। রঞ্জাবতী বলছে :

আমি যদি প্রাণ দিব শালের উপর
কবে তবে সাক্ষাৎ হইবে মায়াধর।
সবে বলে মরিলে জীবন নাহি পায়
তোমার বচন শুন্যা প্রাণ উড়্যা যায়।

দাসদাসী পরিজন রঞ্জাবতীর অবস্থা দেখে মজা উপভোগ করেছে।

কল্যাণী মাণিকী বলে ঘর নাঞী যাব।
তুমি মৈলে দুইজনে চামর ঢুলাব॥

অতএব অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হযে রঞ্জাবতীকে শালে ভর দিতে হয়েছে। কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং অল্প কথায় একটি চরিত্র ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা ছিল। বর্ণনাতেও স্বাভাবিকতা রক্ষায় তিনি কৃতকার্য হয়েছেন। রূপরামের কাব্য পড়তে পড়তে স্থানে স্থানে মুকুন্দরামকে মনে পড়া স্বাভাবিক। ডঃ সুকুমার সেন রূপরামের কবিকৃতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা যথার্থ। তিনি লিখেছেন, রূপরামের "জীবনের সম্বন্ধে খানিকটা সচেতনতা কল্পনার উদ্দামতা ও উচ্ছলতাকে সংযত করিয়াছে।"

রামদাস আদক : রামদাস আদক সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের আর একজন কবি। রামদাসের কাব্যের নাম অনাদিমঙ্গল। কাব্যের প্রারম্ভে

রামদাস মুকুন্দরাম ও রূপরামের অনুসরণে যে বিস্তৃত আত্মবিবরণী দিয়েছেন তা গতানুগতিক আত্মকাহিনী হলেও বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কবি লিখেছেন,

ভূরসুটে রাজা রায় প্রতাপনারায়ণ।
দানদাতা কল্পতরু কর্ণের সমান॥
তাঁহার রাজত্বে বাস বহুদিন হতে।
পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে॥

ভূরসুট পরগণার রাজা প্রতাপনারায়ণের (ভারতচন্দ্রের পূর্ব পুরুষ) রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত আরামবাগের নিকটবর্তী হায়াৎপুর গ্রামে কবি রামদাসের জন্ম হয়। কবি জাতিতে চাষী কৈবর্ত,—বংশগত বৃত্তি কৃষিকর্ম। বাল্যকালেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কবি লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। খাজনা বাকী পড়ায় চৈতন্য সামন্ত নামে কবির স্বগ্রামবাসী এক রাজকর্মচারী রামদাসের পিতামাতাকে বাড়ীতে না পেয়ে বালক রামদাসকে ধরে নিয়ে গিয়ে কাছারি ঘরে তিনদিন আটকে রেখেছিল। মুক্তি পেয়ে রামদাস মাতুলালয়ের পথ ধরলেন। পথে নানাবিধ শুভ লক্ষণ দেখা গেল। পথিমধ্যে এক সিপাহী ভয় দেখিয়ে রামদাসের মাথায় একটা ভারী মোট চাপিয়ে দিলে রামদাস ভাবলেন :

দেশে খাজনার তরে পলাইয়া যাই।
বিদেশে বেগারি বুঝি লইবে সিপাই॥

রামদাস মাথা হেঁট করে বোঝা ফেলে বসে পড়লেন। সিপাহী মাথায় মোট চাপিয়ে তাড়না করে, রামদাসকে মোট বহনে বাধ্য করে। কিছুক্ষণ পরে সিপাহী অদৃশ্য হয়ে গেল। রামদাসের জ্বর এলো।—তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিছু পরে উঠে জল খেতে গিয়ে দেখেন পুকুরে জল নেই। এমন সময় জলের ঝারি হাতে এক ব্রাহ্মণ এসে হাজির হলেন। তিনি রামদাসকে ধর্মমঙ্গল গান করতে বললেন এবং নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন।

ধর্ম বলে রামদাস মূর্খ নও তুমি।
জাড়গ্রামের কালু বামন হই আমি॥
আসরে জুড়িবে গীত আমা সঙরণে।
মুখেতে ঠেকিলে গীত চাইও কর পানে॥
এত বলি ঠাকুর ধরিল তানি কর।
মহামন্ত্র লিখি দিল দ্বাদশ অক্ষর॥

রামদাসের কাব্যের ভাষা আধুনিক। আত্মকাহিনীটিতে কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ভূরস্থট পরগণার রাজা প্রতাপনারায়ণ ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ—সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কোন কোন পুঁথিতে কাব্যরচনার কালও বিজ্ঞাপিত হয়েছে :

সময়

বেদ বসু তিন বাণ শকে সুপ্রচার।
ভাদ্র আদ্য পক্ষে আট দিবস তাহার॥

১৫৮৪ শকে বা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে এই কাব্য সমাপ্ত হয়।

রামদাসের কাব্যের ভাষা সহজ ও কবিত্বময়। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "মোটামুটি আদক কবির কবিত্বশক্তি প্রশংসারই যোগ্য। কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টিতে সংহত রচনা কৌশল, পরিচ্ছন্ন প্রবাহ, ক্লাসিক গঠন এবং স্নিগ্ধ পদলালিত্য এই কাব্যে নিতান্ত দুর্লভ নহে।" রামদাসের কাহিনী সুবিন্যস্ত ; অলংকার এবং বাগ্‌রীতি মুকুন্দরাম ও ভারচন্দ্রকে স্মরণ করায়। স্থানে স্থানে বাগ্‌রীতি চমকপ্রদ।

কাব্য বিচার

যেমন— চিনিতে রোপিয়া নিম দুগ্ধের সিঞ্চনে
জেতের স্বভাব তিক্ত না ছাড়ে কখনে।

অথবা,— যুবক স্বামীর কথা পীযুষের কণ।
বৃদ্ধ সোয়ামীর কথা ছেঁচা ঘায়ে লুন॥

সংস্কৃত ঘেঁষা ভাষা ব্যবহারে এবং পুরাণ কথার বর্ণনায় কবি দক্ষতার পরিচয়

দিয়েছেন। মার্জিত রুচি ও অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিভঙ্গী কাব্যটিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছে।

তবে রামদাসের কাব্যের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক। তাঁর কাব্যের সমগ্র পুঁথিও পাওয়া যায়নি। পুঁথির বিচ্ছিন্ন অংশগুলি গায়নের মুখ থেকে সংগৃহীত গানের দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে। রামদাসের কাব্যের সঙ্গে রূপরামের কাব্যের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ডঃ সুকুমার সেনের মতে রামদাসের কাব্যের বারো আনা রূপরামের কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য গায়নদের হস্তক্ষেপের ফলেও এরূপ হওয়া সম্ভব। রূপরামের কাব্য থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করায় রামদাসের কাব্যের পূর্ণ মুল্যায়ন সম্ভব নয়।

সীতারাম দাসঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের গতানুগতিক কাহিনী ও রীতি অনুসরণ করে সীতারাম দাস কাব্য রচনা করেছিলেন। একটি পুঁথিতে ১০০৪ সাল সীতারামের কাব্যের রচনাকাল বলে উল্লিখিত হয়েছে। কেউ কেউ এই সালকে বঙ্গাব্দ ধরে ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দ গ্রহণ করে থাকেন। সীতারাম কাব্য রচনা করেছিলেন মল্লভূমিতে। সুতরাং ১০০৪ সালকে মল্লাব্দ ধরে ১৬৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে কাব্যটি রচিত হয়েছিল বলে অনেকের অভিমত। শেষোক্ত কালটিই সঙ্গত বোধহয়। সীতারামের কাব্য রূপরামের পূর্বে রচিত হতে পারে না। আত্মবিবরণী রচনায় অধিকাংশ ধর্মমঙ্গলের কবির পথ প্রদর্শক রূপরাম।

মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবির মত সীতারামও আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে দেবতার স্বপ্নাদেশের বিবরণ দিয়েছেন। গতানুগতিক ধারার অনুবর্তন হলেও সীতারামের আত্মবিবরণীতে বৈচিত্র্য আছে। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে মাতুলালয়ে কবি সীতারামের জন্ম হয়। কবির পিতার নাম দেবীদাস, মাতার নাম কেশবতী। কবির পিত্রালয় বর্ধমান জেলার সুখসাগর গ্রাম। কবির গৃহদেবতা ছিলেন গজলক্ষ্মী। সীতারাম দাসের আত্মবিবরণীর বৈশিষ্ট্য এই যে কবির গৃহদেবতা গজলক্ষ্মীর আদেশে কবি

আত্মবিবরণী

ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। সেকালে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা ধর্ম উপাসনা করতে বা ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় ব্রতী হতে পারতেন না। সীতারামও প্রথমে সাহস করেন নি। পরে ধর্মঠাকুরের আদেশ পেয়ে কাব্য রচনা করলেন। একদিন কুশলরাম সরকার খুড়ার ইচ্ছায় সীতারাম গেলেন শাওড়াবুলি কাঠ আনতে। পথে ধর্মঠাকুর সন্ন্যাসীর বেশে কবিকে ধর্মমঙ্গল রচনায় নির্দেশ দিলেন।

প্রভু বলে নিরঞ্জন নৈরাকার আমি
আমার মঙ্গলগীত কর গিয়া তুমি।
পূর্ব জন্মে কত তপ জপ কৈলা
সে কারণে তুমি মোর বনে দেখা পাইলা।
গীত কর আমার না কর মন হীন
তোমার কীর্তি রহিব শিকের যেন চিন।

কবি ভরসা পেলেন না। তখন ধর্মঠাকুর আশ্বাস দিলেন।

বাত শুনি তখন বলেন নিরঞ্জন
শুন সীতারাম তুমি আমার বচন।
লিখিতে যখন তোমার না চলিবে পুঁথি
হাতের কলম লয়্যা রেখ্য তুমি তথি।
সেই কালে সরস্বতী বসিব বদনে
লেখ্যা যেও পুঁথি তুমি যেবা আইসে মনে।

কবির কুললক্ষ্মী গজলক্ষ্মীও কবিকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন।

শিওরে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা।
উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা॥

ইন্দাস গ্রামের ধর্মঠাকুরের পুরোহিত নারায়ণ পণ্ডিতও কবিকে উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়েছিলেন। তাঁরই অনুরোধ ও উপদেশ মত সীতারাম কাব্য রচনা

শুরু করলেন। কবির খুড়া সংবাদ পেয়ে নারায়ণ পণ্ডিতের বাড়ী থেকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে কবি চল্লিশ দিনে কাব্য শেষ করলেন।

সীতারামের রচনা সহজ সরল ও বিবৃতিমূলক। আত্মকাহিনীটিও সহজ ভাষায় রচিত,—কাহিনীর গতিও সাবলীল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাস্তবধর্মী চিত্র আছে। এই চিত্রগুলি মনোরম। খুঁটিনাটি বাস্তব বিবরণ এবং পরিবেশ রচনা স্বাভাবিক হয়েছে। আত্মকাহিনীটি ছাড়া সীতারামের কাব্যে আর কোন স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা চোখে পড়ে না,—যা সীতারামকে কবি হিসাবে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে। কাহিনী রচনায় বা চরিত্র নির্মাণে কবি কোন প্রকার অভিনবত্ব দেখাতে পারেননি। কবি কতকটা প্রাচীন পাঁচালীর মত সহজ ভাষায় কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। সীতারামের ভাষায় আলংকারিক পারিপাট্য নেই,—কিন্তু বর্ণনা নীরস এবং অপাঠ্য বোধহয় না। অবশ্য এই সরল অনাড়ম্বর ভঙ্গীর মধ্যেও কখনও সখনও কবিত্বের স্ফুরণ যে চোখে পড়ে না তা নয়। বৈশাখে মধ্যাহ্নে বনের শোভার মনোরম বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য।

কাব্যবিচার

বৈশাখ সময় তার কুড়চির ফুল।
ঝুপ্ ঝুপ্ ফুল খসে বাতাসে আকুল।
কাত কাত কাননে হরিণী কালসার।
ক্ষণেক দিবস হয় ক্ষণেক আন্ধার॥

যাদবনাথ বা যাদুনাথঃ যাদবরাম নাথ বা যাদুনাথ ধর্মপুরাণ বা ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। কাব্য মধ্যে কবি রচনাকালের উল্লেখ করেননি। তথাপি কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে তাঁর কাব্যের রচনাকাল নির্ণয় করা যায়। বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের বন্দীত্ব ও মৃত্যুকালে কবির কাব্য শেষ হয়।

ক্ষেত্রি বংশেতে জন্ম নাম কৃষ্ণরাম
প্রভাতে উঠিয়া মুখে সরে যার নাম।

কৃষ্ণরামের নামে পাপ তাপ বিমোচনে
চিরকাল রাজভুক্তি করেন বর্ধমানে।
মরিল বলরাম রায় অরাজক পুরী
সেই কালে কৃষ্ণ রায় নিল বসুন্ধরি।
ভার্যা বন্দী দাস হয়ে করোরি তাহার
সেই কালে গীত সাঙ্গ হইল আমার।

বিদ্রোহী শোভাসিংহের হাতে বর্ধমান রাজ কৃষ্ণরাম পত্নী ও অন্তরপুরিকাগণ সহ বন্দী হন এবং রাজার করোড়ী অর্থাৎ দেওয়ান শত্রুর দাসত্ব করেন। সেই সময়ে কৃষ্ণরামের কাব্য সমাপ্ত হয়। বাঙ্গালা ১১০৩ সালে বা ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম শোভাসিংহের হাতে নিহত হন। সুতরাং যাদুনাথের কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সমাপ্ত হয়। আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় যে কবির পিতামহের নাম দামোদর এবং পিতার নাম বিনোদ নাথ। কবির নিবাস ছিল দোমগ্রামে (হাওড়া জেলার ডোমজুড় গ্রাম ?)। কবি ভণিতায় অধিকাংশ স্থলে "যাদুনাথ" নাম ব্যবহার করেছেন। কবি খুব সম্ভবতঃ নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত যোগী ছিলেন। তাঁর কাব্যের পুঁথি ডোমজুড়ের এক যোগী তাঁতীর বাড়ী থেকে পাওয়া গেছে এবং ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায় বিশ্বভারতী থেকে তা প্রকাশিত হয়েছে। কবি কাব্যে চৈতন্যবন্দনা করেছেন— চণ্ডীর প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি আবার ধর্ম-নিরঞ্জনের দশ অবতারও বর্ণনা করেছেন। দশম অবতারে বুদ্ধ কল্কী ও ধর্ম এক হয়ে পাত্‌শাহ রূপে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত হয়েছেন।

দশমে বন্দিনু বোদ্ধ কল্কি অবতার।
সত্যশূন্য নাম তার মেলেশ্চ আকার।
যবন রূপে দিল্লীয়ে কৈলে পাৎসাই ঠাকুরালি
যবন রূপে একাকার সংহারিলে কলি॥

কবির অসাম্প্রদায়িক মনোভাবটি লক্ষ্য করার মত। কবি পৌরাণিক, শাক্ত

ও লৌকিক দেবদেবী এমনকি মুসলমান পীর ফকিরের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

যাদুনাথের কাব্যে রামাই পণ্ডিত ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এতে লাউসেনের কাহিনী নেই। হরিশ্চন্দ্র কাহিনীতেও বিশিষ্টতা আছে। হস্তিনাপুরের রাজা হরিশ্চন্দ্র ধর্মদ্বেষী,—তিনি ধর্মের উপাসকের উপরে অত্যাচার উৎপীড়ন করেন,—ধর্মের দেউল ভেঙ্গে দেন,—ধর্মের পূজা নিষেধ

কাব্যবিচার

করেন। ফলে ধর্মের অভিশাপে অপুত্রক হয়ে থাকেন। একদিন রাজা পাত্র বিশ্বামিত্রের উপরে রাজ্যভার দিয়ে রাণীর সঙ্গে সন্ন্যাসী বেশে চলে গেলেন। বনের মধ্যে তাঁদের নানা দুর্গতি ভোগ করতে হয়। অবশেষে বল্লুকা নদীতে আত্মবিসর্জনে উদ্যোগী হলে ধর্মের নির্দেশে আদ্যাদেবী তাঁদের হিমসাগর নদী পার হয়ে বল্লুকা দ্বীপে যেতে নির্দেশ দিলেন। বল্লুকা দ্বীপে রাজারাণী রামাই পণ্ডিতের দর্শন পান। রামাই পণ্ডিতের উপদেশে কঠোর তপস্যায় রাজারাণী পুত্রবর পেলেন ধর্মের কাছ থেকে, কিন্তু এই সর্তে যে পুত্রকে বলি দিতে হবে ধর্মঠাকুরের কাছে। পরবর্তী কাহিনী অন্যান্য ধর্মপুরাণের অনুরূপ।

যাদুনাথের ধর্মপুরাণের ভাষা সংযত। কাব্যে কবির রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লুইচন্দ্রকে হত্যা করার পর পিতামাতা মিলিত হয়ে রন্ধন করে সন্ন্যাসী বেশী ধর্মঠাকুরকে তৃপ্ত করার কাহিনীটি একদিকে যেমন নির্মম, অপরদিকে তেমনি করুণ। কবি করুণরস পরিবেষণে কৃতকার্য হয়েছেন। কবি ধর্মপুরাণের সঙ্গে সংস্কৃত পুরাণের কাহিনী সংমিশ্রিত করেছেন। জননী মদনার স্নেহব্যাকুলতা বর্ণনায় কবি কৃষ্ণজননী যশোদার বাৎসল্যরসের পদাবলী অনুসরণ করেছেন। তৎসম শব্দবহুল সংযত ভাষায় কবি আবেগ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। মৃত লুইচন্দ্রকে ফিরে পেয়ে মদনার স্নেহসিক্ত হৃদয়ের বর্ণনাটি বেশ চমৎকার।

যশোদা সন্তুষ্ট যেন পাইয়া শ্রীহরি।
রামেরে পাইল যেন কৌশল্যা সুন্দরী॥
তেমনি হইল রাণী পুত্র পাইয়া কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন মণ্ডলে॥
মুখে মুখ দিয়া রাণী চুম্বেন বয়ান।
বুক ভরি কোলে করি জুড়ান পরাণ॥

কাব্যটিতে বৈষ্ণবীয় প্রভাব আছে প্রচুর।

ঘনরাম চক্রবর্তী ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্যেরও তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলই সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়ে শিক্ষিত সমাজে সমাদর লাভ করে। কবি প্রদত্ত ভণিতা থেকে জানা যায় যে ঘনরামের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার চার ক্রোশ দক্ষিণে দামোদরের তীরে কইয়ড় পরগণার কুকুড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে। কবির পিতার নাম গোরী-কান্ত, মাতার নাম সীতা এবং পিতামহ ধনঞ্জয়। ঘনরামের মাতামহ গঙ্গাহরি রায়না নিবাসী ছিলেন। কবির চার পুত্র ঃ রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ। কবি ছিলেন বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের আশ্রিত। ভণিতায় কবি অনেক স্থানে মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের কল্যাণ কামনা করেছেন।

অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রসগান।

ঘনরামের পুঁথিতে এবং মুদ্রিত কাব্যে আত্মপরিচয়মূলক গতানুগতিক কাহিনী পাওয়া যায় না। ডঃ সুকুমার সেন ঘনরামের কাব্যের গায়ন নাড়গাঁ

নিবাসী অমূল্যচরণ পণ্ডিতের কাছ থেকে ঘনরামের আত্মবিবরণী সংগ্রহ করেন। এই বিবরণ অনুসারে ঘনরাম কৃষ্ণপুরের নিকটবর্তী রামবাটিতে টোলে পড়তেন।

আত্মবিবরণী

একদিন টোলের ভট্টাচার্যের জন্য পূজার ফুল তুলতে গিয়ে ঘনরামের পায়ে বেগুন কাঁটা ফোটে। পায়ে হাত দিয়ে কাঁটা তুললে সে হাতে ফুল তোলা যাবে না ভেবে ঘনরাম পায়ে কাঁটা নিয়েই ফুল তুলে আনলেন। ব্রাহ্মণ পূজায় বসে দেখেন যে দেবতার পায়ে বেগুন কাঁটা ফুটেছে। ঘটনা অবগত হয়ে দেবতার প্রতি অভিমান ভরে তিনি গৃহত্যাগ করে পুরী যাত্রা করলেন। দুপুরে ক্লান্ত হয়ে তিনি পথের ধারে গাছতলায় নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখলেন যে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে তাকে পুরীর পথ জিজ্ঞাসা করছে। একটু পরেই আর একটি ছেলে এসে দাদা বৌদিদির সংবাদ জানতে চাইলে ব্রাহ্মণ তাঁকে পথের সংবাদ দিলেন। অতঃপর রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে পুরীযাত্রীরূপে দেখেও চিনতে না পারার অপরাধে হনুমান তাঁর গালে চড় দিয়ে পূর্বাগত তিন ব্যক্তিকে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ বলে বর্ণনা দিলেন। হনুমান রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে চিনতে না পারায় পুরীতে তীর্থযাত্রার জন্য ব্রাহ্মণকে ধিক্কার দিলেন। ব্রাহ্মণ লজ্জিত হয়ে আবার ঘরে ফিরলেন এবং ছাত্র ঘনরামকে রামায়ণ রচনা করতে আদেশ দিলেন। ঘনরাম রামায়ণ শুরু করলেন রাম বন্দনা দিয়ে। পরদিন তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন যে রামবন্দনার স্থলে ধর্মঠাকুরের বন্দনা লেখা আছে। পুঁথির পাতা ছিঁড়ে ফেলে আবার রামবন্দনা লিখলেন। রামচন্দ্র রাত্রে ঘনরামকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করতে আদেশ দিলেন। ঘনরামও স্বপ্নাদেশ মত ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করলেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গায়নের মুখ থেকে সংগৃহীত আত্মকাহিনীটিকে প্রামাণ্য হিসাবে স্বীকার করেন না। কবি ছিলেন রামভক্ত। তাঁর কাব্যে রামায়ণের প্রভাবও প্রচুর ; রামভক্তিরও যথেষ্ট পরিচয় আছে তাঁর কাব্যে। কবি গুরুর কাছ থেকে কবিরত্ন উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

নিজ গুণে করি যত্ন নাম দিলা কবিরত্ন
কৃপাময় করুণা আধান।

ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন যে ঘনরামের গুরুর নাম রামদাস।

কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে ঘনরাম লিখেছেন,

শক লিখে রাম গুণ-রস সুধাকর
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি
যাম সংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি।

এ থেকে জানা যায় যে ১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনে শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে শুক্রবারে ঘনরামের কাব্য সমাপ্ত হয়েছিল। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে ৮ই অগ্রহায়ণ গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছিল। ঘনরাম মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। কীর্তিচন্দ্রের পিতা ১৭০২ খৃষ্টাব্দে নিহত হন,—কীর্তিচন্দ্র পরলোক গমন করেন ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে। কীর্তিচন্দ্রের রাজত্বকালে ১৭১১ খৃষ্টাব্দে ঘনরাম কাব্য সমাপ্ত করেন।

রচনাকাল

ঘনরামের কাব্যের নাম শ্রীধর্মমঙ্গল। ভণিতায় শ্রীধর্মসঙ্গীত, শ্রীধর্মকীর্তন, নূতন মঙ্গল, ধর্ম-ইতিহাস, অনাদি মঙ্গল, মধুর ভারতী, মধুর মঙ্গল প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়।

কাব্য পরিচয়

ঘনরামের কাব্যে দিগ্‌বন্দনা নেই;—দেবতার স্বপ্নাদেশের বিবরণ গায়নের মুখ থেকে সংগৃহীত আত্মবিবরণীতে থাকলেও মুদ্রিত পুস্তকে পাওয়া যায় না। কবি মুখ্যতঃ গুরুর আদেশেই কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি সশ্রদ্ধ ভাবে গুরুর বন্দনা করেছেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের গতানুগতিক ধারায় যে সকল প্রতিভাবান কবি স্বকীয় বিশিষ্টতার ছাপ রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরাম ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।. তিনি নিজে ছিলেন সুপণ্ডিত। তাই পাণ্ডিত্যের প্রভা তাঁর কাব্যকে দ্যুতিসম্পন্ন করেছে। পাণ্ডিত্যের গুরুভার কবির সহজ

কবিত্ব শক্তির গতি প্রতিহত করতে পারে নি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "স্বভাবত কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সংযোগই ঘনরামের কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।" ঘনরামের কাব্যে পুরাণকথার বাহুল্য দেখা যায়। কবি নানাবিধ পুরাণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কাব্যের সৌষ্ঠব বর্ধিত করেছেন। কাব্যের চরিত্রগুলিকেও পৌরাণিক চরিত্রের আদর্শে বর্ণনা করেছেন। রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। কবি রামায়ণ কাব্য রচনা করতেই শুরু করেছিলেন। কিন্তু রামায়ণ কাহিনীর পরিবর্তে তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্যই রচনা করলেন। তাঁর কাব্যের নায়ক লাউসেনের চরিত্রে রাম ও কৃষ্ণের প্রভাব পড়েছে। কর্পূর সেনের চরিত্রে বলরাম বা লক্ষ্মণের প্রভাব পড়েছে। মহামদ ত স্পষ্টতঃ কংসরাজা। চরিত্র ছাড়াও অন্যত্র পুরাণের প্রভাব দেখা যায়। কবি নানা স্থানে প্রসঙ্গক্রমে পুরাণকথা বর্ণনা করেছেন। বাল্মীকি-রামায়ণ পাঠের বর্ণনাও কাব্যে আছে। পুরাণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি পুরাণকথার অনুরূপ কাহিনীও সৃষ্টি করেছেন। পুরাণ কাহিনী বর্ণনার দ্বারা কবি অনেক ক্ষেত্রে নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, কর্ণসেন কর্তৃক রামায়ণ কাহিনীর 'মায়া মুণ্ড' উপাখ্যান শ্রবণ কালে লাউসেনের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন কিম্বা মহাভারতের অন্তর্গত সমুদ্রমন্থনের উপাখ্যানে সমুদ্রমন্থন কালে বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তি সন্দর্শনে দানবগণের এবং মহাদেবের কামভাব বর্ণনার সুযোগে নৃত্যরতা নর্তকীর নৃত্যদর্শনে কর্ণসেনের কামভাবের বর্ণনার উল্লেখ করা যায়। চরিত্রগুলি স্ব স্ব কার্যের সমর্থনে যত্র তত্র রামায়ণী কথার উল্লেখ করেছেন। শুধু রামায়ণ কেন, মহাভারত এবং ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের কাহিনীর উল্লেখও যত্র তত্র আছে। কিন্তু পুরাণ কাহিনীর যত্র তত্র সমাবেশ ঘনরামের কাব্যের গতি ব্যাহত করে নি। কবি সুকৌশলে গতানুগতিকে কাহিনীর সঙ্গে পুরাণরস পরিবেষণ করেছেন। ফলে তাঁর কাব্য জাতীয় জীবনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়েছে এবং মহাকাব্যোচিত বিশালতা লাভ করেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রথাবদ্ধ রীতিতেই ঘনরাম চরিত্র চিত্রণেও কিছু দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য অনেক কবির মতই তিনি লাউসেনের বীরত্ব কাহিনী এবং রঞ্জাবতীর কৃচ্ছ্রসাধনের ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তথাপি কাহিনীতে ও চরিত্রবর্ণনাতে ঘনরামই ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য কবিদের তুলনায় কৃতিত্বের অধিকারী। বীরাঙ্গনাদের চরিত্র বর্ণনায় বীর রমণীর বীরত্বের সঙ্গে মাতৃত্ব, পাতিব্রত্য প্রভৃতি রমণী সুলভ গুণাবলীর সংমিশ্রণের ফলে চরিত্রগুলির গৌরব বর্ধিত হয়েছে এবং চরিত্রগুলি নিছক প্রাণহীন পুত্তলিকা না হয়ে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠেছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য লখাইএর চরিত্র। মহামদের বিরুদ্ধে স্বামীকে উত্তেজিত করতে না পেরে লখা নগরবাসীদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছে। কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে লখা যুদ্ধে অনিচ্ছুক পুত্রকে উত্তেজিত করে যুদ্ধে পাঠিয়েছে। মাতা ও পত্নীর প্ররোচনায় সাকা যখন যুদ্ধে যাবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে, লখা চোখের জলে ভেসেছে।

চরিত্র চিত্রণ

> শুনি শোকে লখের নয়নে বহে নীর।
> রাজার বিপত্তি ভাবি মন করে স্থির ॥
> আশিস করিয়া বলে এস মোর বাপ।
> মুখে করে চুম্বন মরমে বড় তাপ ॥

সাকার মৃত্যুর পর পুত্রের ছিন্ন মুণ্ড দেখে লখা কেঁদে আকুল হয়েছে যে কোন সাধারণ বাঙালী জননীর মত।

> কাটা মাথা কোলে দিতে ডাকে উভরা।
> অমনি পড়িল লখে আছাড়িয়ে পা ॥
> বাছা কোথা আমার, আমার দুলালিয়া।
> মড়া মাথা নিয়ে কাঁদে মুখে মুখ দিয়া ॥
> অভাগিনী আপনি ডাকিনী হনু বাছা।
> যে হেতু ভাবিনু ভয়, তাই হল সাঁচা ॥

কে মারিল আমার সোনার সাকাবীর।
কি পাপে মায়ের প্রাণ না হয় বাহির ॥

লখার পাতিব্রত্য এবং ধর্মপরায়ণতাও লক্ষণীয়। স্বামী কালুকে সে বলেছে, প্রাণপতি গতি সতী যুবতীর দে।" কালু রাত্রিকালে যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করলে লখা বলেছে—

অধর্ম আচরি বল কতকাল জীবে।
সত্য পাল শতেক পুরুষ স্বর্গে নিবে ॥

ময়ুরা চরিত্রটিও পাতিব্রত্যে, বীরত্বে এবং ধর্মজ্ঞানে উজ্জ্বল। ময়ুরা পতি সাকাকে রণে যেতে উত্তেজিত করেছে,—লাউসেনের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণের কথাও উল্লেখ করেছে। আবার সাকা রণক্ষেত্রে প্রাণ দিলে—

শাশুড়ী চরণে ধরে ফুকারিয়া কাঁদে।
ধূলায় লোটায় রামা বুক নাহি বাঁধে ॥
মায়ামোহ ময়ুরা মাথায় মারে হাঁড়ী।
ধূলায় লোটায়ে কান্দে শাশুড়ি বহুড়ী ॥
কাঁদিয়া ময়ুরা বলে কোথা হে গোঁসাই।
তোমা বিনা অভাগীর আর কেহ নাই ॥

কালু ডোমের অপরা পত্নী সনকার চরিত্রটি জীবন্ত এবং বাস্তবতা সম্মত। কালু ডোম যুদ্ধে যেতে নারাজ হওয়ায় লখা কালুর নির্দেশে সনকাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে যুদ্ধে যাবার জন্য অনুরোধ করেছে। সনকা কালুর দুয়োরাণী। বঞ্চিতার বেদনা এবং স্বামী সোহাগিনী লখার প্রতি ঈর্ষা তার কথায় সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়েছে। সনকা বলেছে

কাজ বুঝে কস কারে কেবা তোর দিদি।
কার কি ভাসিল বানে তোর বাম বিধি ॥

বিষম বচন বাণে বুক করে ফার।
তু তার সোহাগের মাগ সে তোর ভাতার॥
বিবাহ বাসরে সবে স্বামী বলে জানি।
দুখে গেল গতর গায়ের রক্ত পাণি॥
ভাল মন্দ নাহি জানি ভাতারের ভাত।
ঝুড়ি পেড়ি চুপড়ী বুনিতে গেল হাত॥
মোর গায়ে উড়ে ঘড়ি তোর গায়ে চুয়া।
দাসীতে যোগান পান গালে গোটা গুয়া॥
সব সুখ সম্পদে ভাতার পুতে মেতে।
তুমি কর ঘর বাড়ী আমি বেচি পেতে॥

* * *

তোর ঔষধের গুণে ভাতার ভাসুর।
গা জ্বলে গরবখাকী হেথা হতে দূর॥

ভাষায় কিছু গ্রাম্যতা থাকলেও সনকার মুখে তা স্বাভাবিকই হয়েছে। ঈর্ষার জ্বালা আর বঞ্চনার ব্যথায় সনকা চরিত্রটি একটি জীবন্ত মানুষে পরিণত হয়েছে।

কালু যদিও বীর এবং বিশ্বাসী, তবু সে শাপগ্রস্ত হয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকায় এবং কোন প্রকারে যুদ্ধে যেতে স্বীকৃত না হওয়ায় তার চরিত্রের আর একটা দিকও উদ্ঘাটিত হয়েছে। কোন প্রকারে কালুকে জাগাতে না পেরে লখা তাকে একটি চড় দেয়। চড় খেয়ে জাগ্রত হয়ে কালু যা বলেছে তা একমাত্র নিম্নশ্রেণীর 'চুয়াড়' জাতির পক্ষেই সম্ভব।

উঠে রুঠে অমনি লখেকে দিল তাড়া।
কোপে তাপে কয় কিছু দিয়া ঝুঁটি নাড়া॥
হেদে লো ডুমনী শ্যালী ধাউতালী ঠাটী।
কে রাখে রাখুক দেখি নাক চুল কাটি॥

অতঃপর শান্ত হয়ে সে পত্নীকে বলেছে যে যুদ্ধ করে প্রাণ না দিয়ে বরং তারা স্থান ত্যাগ করে দূর দেশে পালাবে এবং জাতিগত বৃত্তির দ্বারা জীবনযাপন করবে।

বীর বলে বউলো বচন বলি শুন।
বল দেখি সংসারে না ধরি কোন গুণ॥
ঝুড়ি বেড়ি চুপড়ি ধুচুনি কুলা ডালা।
বৃত্তি বেচে ববঙ্ক কবিব পেট পালা॥
শিঙ্গা তার বলে চল পলাইয়া যাই।
হেন সুখ সম্পদ্ সম্মান মুখে ছাই॥
কি কাজে কাটাব মাথা কাহার লাগিয়া।

এই উক্তিতে ডোমবীর কালুর চরিত্রটি উজ্জ্বল হয় নি বটে,—কিন্তু ধান্যঘরে আত্মগোপনকারী কালকেতুর মত কালুর চরিত্রটি স্বাভাবিক হয়েছে।

লাউসেনের চরিত্রটি বীরত্বে ও মহত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বীর লাউসেনের পাশে ভীরু কর্পূর সেনের চরিত্রটি ভীরু বাঙ্গালীর চরিত্র হিসাবে সুস্পষ্ট ভাবে অংকিত হয়েছে। ঘনরামের কাব্যে কর্পূর চরিত্রটি পূর্বাপর সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। ভট্ট গঙ্গারাম অর্থলোভ ও মিথ্যার বেসাতি নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঘনরামের কাব্যে চরিত্রগুলি সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার স্পর্শে জীবনরস সিক্ত হয়ে উঠেছে।

বাস্তবতা

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ হলেও ঘনরামের কাব্যে বাস্তবতার অভাব নেই। চরিত্র চিত্রণ ছাড়াও সৈন্যনির্বাচন, যুদ্ধাস্ত্র বর্ণনা, যুদ্ধবর্ণনা, প্রভৃতির মধ্যে বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। এ ছাড়া বাঙ্গালীর সমাজজীবন ও পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণও কবি দিয়েছেন। রঞ্জাবতীর বিবাহে সামাজিক ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, বিবাহানুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকা, স্ত্রী-আচার ও

লৌকিক আচারের বর্ণনা, নব বধূকে ঔষধাদি প্রদান, রঞ্জাবতীকে পুত্রলাভের জন্য প্রবীণা নারীদের বিচিত্র উপদেশ, কলিঙ্গার বিবাহের বর্ণনা, মহামদের প্রজা নির্যাতনের বেনামীতে সেকালের অত্যাচারী শাসকের উৎপীড়নের বর্ণনা,— রন্ধনের বিচিত্র আয়োজন, রঞ্জাবতীর সাধভক্ষণ, ইছাই ঘোষের নগর পত্তন ও প্রজা স্থাপন, বিভিন্ন জাতির জীবিকার বিবরণ প্রভৃতিতে কবির বাস্তবানুরাগ সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারেও কবি বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। ঘনরাম সংস্কৃত ঘেঁষা ভাষা প্রয়োগে দক্ষ হলেও জামতি গোলহাট পালায় নারীদের মুখে চটুল ভাষা বসিয়েছেন আবার কালু ডোম লখা ডোম প্রভৃতির মুখে রাঢ়ের গ্রাম্য-ভাষা সন্নিবিষ্ট করেছেন। এতে চরিত্রগুলি বাস্তব হয়ে উঠেছে। ডোম জাতির জীবনযাত্রায়, তাদের আহার বিহার মদ্যপান প্রভৃতির বর্ণনাতেও কবি বাস্তবানুগত্য প্রদর্শন করেছেন। কবির বাস্তববোধও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি সমগ্র কাব্যেই পরিব্যাপ্ত।

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বীররস প্রধান। ঘনরামের কাব্যেও যুদ্ধবর্ণনা ও যুদ্ধের উৎসাহ উদ্দীপনা বর্ণনায় বীররস প্রাধান্য পেয়েছে। করুণ রসের দীর্ঘ বিলাপ বর্ণনার অবসর এই কাব্যে কম। তৎসত্ত্বেও কবি করুণরস

রস

সৃষ্টিতে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পূর্বোল্লিখিত সনকা ও ময়ূরার বিলাপ বর্ণনায় ঘনরামের করুণ রস পরিবেষণে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়াও নানা স্থানে স্বল্প কথায় কবি করুণ রস পরিবেষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। * মায়ামুণ্ড পালায় লাউসেনের মায়ামুণ্ড দেখে কর্ণসেনের গৃহে যে শোকের রোল উঠেছিল কবি সংক্ষেপে তা নিপুণতার সঙ্গে বর্ণন করেছেন।

কান্দে রাজা কর্ণসেন উথলিয়া তাপ।
কোথারে আমার বাছা কি হলো রে বাপ॥
বাছা বলে বার হইল খোনা দাই মা।
মাথা দেখি অমনি আছাড়ে পড়ে গা॥

বাছা কোথা আমার কোথা দুলালিয়া।
মরা মাথা লয়ে কান্দে মুখে চুম্ব দিয়া॥
শুনিয়া চঞ্চল হইল চারি রাজার ঝি।
কলিঙ্গা বলেন বুন বসে কর কি॥
অকালে ফুরাল হাট কপাল খেয়াও।
কি লয়ে সংসার আর কার মুখ চাও॥

স্বল্প পরিসরে শোকের এই যে জীবন্ত বর্ণনা, তাতে কবির দক্ষতা নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণিত হয়। আদি রসের বর্ণনায় কবির প্রশংসনীয় সংযম লক্ষিত হয়। হাস্যরসেও ঘনরামের দক্ষতা আছে। কৌতুক রসের বর্ণনাতেও কবি সংযম পরিমিতিবোধ এবং মার্জিত রুচির পরিচয় দিয়েছেন। স্থূল ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতার দ্বারা তিনি হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস করেন নি। ভারতচন্দ্রের মত চাঁচাছোলা ব্যঙ্গপ্রবণতাও তাঁর কাব্যে দেখা যায় না। ঘনরামের কাব্যে হাস্যরস স্নিগ্ধ কৌতুকে উজ্জ্বল। গৌড়রাজ কানাড়াকে বিয়ে করতে এলে কানাড়া দেবী পাবর্তীর কাছে বুড়ো বরের জন্য যখন আক্ষেপ করছে. পার্বতী তখন বলছেন, "কোথা পাব যুবক আপনি ভজি বুড়া"। দেবীর এই পরিহাসে কৌতুক উচ্ছলিত হয়ে উটেছে। বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিয়েতে রাণীর আপত্তিকে গৌড়রাজ এক কথায় থামিয়ে দিয়েছেন নিজের বৃদ্ধত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা কৌতুকও সৃষ্টি করেছেন। গৌড়রাজ বলছেন, "আমি যে এমন বুড়া ঘটিয়াছে কি।" এ কথা শুনে রাণীর অবস্থাও কৌতুকাবহ হয়ে উঠেছে—"হাসি মুখ হেঁট হল বেণুরায়ের ঝি।" গোলহাট পালায় শিব পার্বতীকে তত্ত্বজিজ্ঞাসা করলে পার্বতী স্বামীর চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করে কৌতুক রসের যোগান দিয়েছেন: "এই তত্ত্ব জানিতে যাও কুচনী পাড়ায়।" এমনি টুকরো টুকরো কৌতুক রসোজ্জ্বল ছত্র ঘনরামের কাব্যে সর্বত্রই ছড়ানো আছে। ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন, "ঘনরামের রচনার বিশেষ গুণ প্রসন্নতা ও ভদ্ররুচি।" তৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে মুকুন্দরামের কাব্যের মত

সহানুভূতি মাখা স্নিগ্ধ কৌতুক রসে আগাগোড়া ঘনরামের কাব্য প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি।

ঘনরাম সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের অনুসরণে ছোট ছোট শ্লোক বা পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন। প্রবচনের মত সংক্ষিপ্ত—স্বল্প কথায় গভীর ভাবদ্যোতক পঙ্‌ক্তিগুলি ভারতচন্দ্রের প্রতিভাকে স্মরণ করায়

ভাষা প্রযোগ দক্ষতা

১। মৃতদেহ দাহ করে চিতার অনলে।
সজীব শরীর সদা দহে চিন্তানলে॥

২। রোগ ঋণ রিপু শেষ দুঃখ দেয় বয়ে।

৩। কোন তীর্থ নহে দূর দাঁড়াইলে মন।

৪। সুখ দুখ সংসারে সমান দশা দুটা।
পক্ষভেদে চন্দ্রমা যেমন বাড়া টুটা॥

৫। মিছাবাণী সেঁচা পানী কতক্ষণ রয়।
কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে।
কতক্ষণ রয় শিলা শূন্যেতে ফেলিলে॥

৬। নফরের সাধ্য কেন ঠাকুরের ভার।
নখে কাটা যায় যাহা কি কাজ কুঠার॥

৭। বিশেষ কাঞ্চন কাচে অনেক অন্তর।
পদরজতুল্য অর্থ নফর চাকর॥

৮। সুবৃক্ষ চন্দন গন্ধে সুশোভিত বন।
সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন॥
কুপুত্র হইলে গোত্রে কুলাঙ্গার কহে।
কুবৃক্ষ কোঠরে অগ্নি উঠে বন দহে॥

এই ধরনের বাক্য ব্যবহার কবির প্রয়োগ কুশলতার পরিচয় দেয়। এই প্রয়োগগুলি প্রবচনরূপে প্রচলিত হওয়ার যোগ্য। অবশ্য কতকগুলি প্রয়োগ সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের সহজ সুন্দর অনুবাদ।

শব্দ প্রয়োগ নৈপুণ্য ঘনরাম অবশ্যই কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। দেব দেবীর স্তবে তিনি সাধারণতঃই সংস্কৃত বহুল ভাষা ব্যবহার করেছেন,—পৌরাণিক পরিবেশ রচনাতেও প্রচুর তৎসম শব্দের ব্যবহার করেছেন ;—আবার নারীদের মুখের ভাষায়, ডোমদের মুখের ভাষায় প্রচলিত গ্রামীণ শব্দ ব্যবহার করেছেন। দু একটি উদাহরণ দিলেই কবির ভাষা প্রয়োগের দক্ষতটুকু ধরা পড়বে।

দেবীর স্তব ঃ দুর্গতি নাশিনী দুর্গা দেবের দেবতা।
দানবদলনী দুঃখ দারিদ্র্য দংশিতা॥

অন্যত্র— নমঃ নারায়ণী নমঃ নগেন্দ্রনন্দিনী।
নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গ খর্পব ধারিণী॥

লক্ষ্মী বন্দনা ঃ— ত্রিলোক জননী লক্ষ্মী বণিতা বিষ্ণুর।
চারুচিত্ত চিত্তচোর চরণে নূপুর॥
ঈষৎ কৃপায় যাঁর ভূপতি ভিক্ষুক।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি বাচাল হয় মূক॥

যুদ্ধসজ্জা :

লোহাটা দুর্বার হাঁকে মার্ মার্
রাজার লস্কর মাঝে।
কোপে নৃপবর কুঞ্জর উপর
ধর্ ধর্ হুকুম গজে॥

জামতি পালায় কুলটা নারীর বর্ণনা ঃ—

কান্দিতে কান্দিতে শিশু পাছু পাছু ধায়।
মদনে মাতিয়া মাগী ফিরে নাহি চায়॥
ধেয়ে ধেয়ে কেঁদে ছেলে ধরিল কাপড়।
কোপে তাপে বলে মাগী গালে মারি চড়॥

ফিরে যারে সাপে খেকো বাপের মাথা খাগা।
হেথা কি আসিস মোর আশে দিতে দাগা॥

নারীদের কথোপকথন :

আই আই অভাগী মাগী কি করিল কাজ।
এক মেয়ের লাজ হলে সকল মেয়ের লাজ॥

ভাষা প্রয়োগের এই বৈপরীত্য ঘনরামের কাব্য প্রতিভাকে উজ্জ্বল করেছে।

অলংকার প্রয়োগেও ঘনরাম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অনুপ্রাস ও যমকের প্রয়োগের দ্বারা কবি স্থানে স্থানে শব্দের যাদু সৃষ্টি করেছেন।

মন্দ মতি মহামদ হাঁকে মার মার।
হান্ হান্ হাঁকে লখে ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
হাতাহাতি বেড়ে যত ভূপতির ঠাট্।
ভামারে ডোমিনী তাকে জোড়ে এল কাট॥

অন্যত্র :

বলিতে বলিতে বড় বাধিল নস্কর।
তড়বড়ি সাজনি তাজনি ধর্ ধর্॥
হাতী হয় রাহুত মাহুত যূথে ধায়।
ঢালী পাইক পদাতি পসারি পায় পায়॥
ঠায় ঠায় ডোমিনী সবারে ধরে কাটে।
শত শত সেনায় সংহারে ফলাসাটে॥
অড়ে অড়ে ধানুকী বন্দুকী কানে কাণ।
হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড়্ রণে ছুটিল কামান॥
বীরদাপে কোপে তাপে লাফে লাফে লখে।
ঢালঢালি সম্মুখ সমরে আইল হেঁকে॥

ঘনরামের কাব্যের শব্দের ঘনঘটা ভারতচন্দ্রের শব্দকৌশলকে মনে পড়ায়।

ঘনরাম সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শব্দের সঙ্গে ফার্সী শব্দও কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন। শব্দ প্রয়োগের দিক থেকেও তিনি ভারতচন্দ্রের পথিকৃৎ।

বাঙ্গালা ছন্দের ক্ষেত্রেও ঘনরামের কৃতিত্ব আছে। তিনি বিভিন্ন রসের বর্ণনায় বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করেছেন। সাধারণতঃ তিনি পয়ার ছন্দেই কাব্য রচনা করেছেন। চটুল রসের বর্ণনায় পয়ারকে শ্বাসাঘাত প্রধান করে তুলেছেন। দেবদেবীর স্তব, যুদ্ধবর্ণনা, করুণরসের বর্ণনা প্রভৃতিতে মাঝে মাঝে ত্রিপদী ব্যবহার করেছেন। আবার যুদ্ধের বর্ণনায় তীব্র গতি সঞ্চারের জন্য তিনি লঘু ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করেছেন। নূতন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সৃষ্টিতে ঘনরাম কৃতিত্বের অধিকারী। সুরিক্ষার পালায় একাবলী ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙ্গালা ছন্দের ক্ষেত্রে ঘনরাম কৃতিত্বের অধিকারী।

মোট কথা ঘটনা বিন্যাসে, চরিত্র চিত্রণে, শব্দ ও ছন্দের প্রয়োগ কৌশলে, সমাজ ও পরিবারিক চিত্রের বাস্তব বর্ণনায় ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাওয়ার যোগ্য। ঘনরামের কাব্যে মুকুন্দরাম, কাশীরামদাস প্রভৃতির প্রভাব আছে। তবে এই প্রভাব তেমন সুগভীর নয়। এই বৃহৎ কাব্যখানি কবির স্বকীয় বিশিষ্টতারই পরিচায়ক।

ঘনরাম ও মুকুন্দরাম ঃ

ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে মুকুন্দরামের প্রভাব আছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে মুকুন্দরামের প্রভাব যতটা স্পষ্ট, ঘনরামের কাব্যে ততটা নয়। ঘনরামের বর্ণনায় স্থানে স্থানে মুকুন্দরামের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যের মর্মমূলে তা প্রবেশ করে নি। চরিত্র চিত্রণে ঘনরাম কিছু কিছু কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন,—কোন কোন ক্ষেত্রে মুকুন্দরামের মত জীবনরস সঞ্চারেও সক্ষম হয়েছেন। গতানুগতিক অলৌকিক কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে তিনি বাস্তব সমাজের বিবরণ দিয়েছেন,—অজস্র পুরাণকথা পরিবেশ অনুসারে কাব্যমধ্যে প্রবিষ্ট করেছেন,—পয়ার ত্রিপদী ছন্দে ভাবানুসারী

ভাষা প্রয়োগে তিনি কাব্যকে গতিশীলতা দিয়েছেন। পুরাণ কথা পরিবেষণ, বাস্তব বর্ণনা, চরিত্র সৃষ্টিতে জীবনরস সঞ্চার—মুকুন্দরামের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে যে কৌতুকোচ্ছলতার সঙ্গে জীবনের ও সমাজের বিচিত্র দিকগুলি উদ্ঘাটিত হয়েছে—ঐতিহাসিক নিষ্ঠায় সমকালীন সমাজের নিখুঁত জীবন্ত চিত্র অংকিত হয়েছে—চরিত্রসৃজনে ঔপন্যাসিকের মত চরিত্রগুলির বিচিত্র মনোভঙ্গী বর্ণনায় যে আশ্চর্য দক্ষতা প্রকাশিত হয়েছে—আত্মজীবনের আলোক যে ভাবে চরিত্রগুলি উদ্ভাসিত হয়েছে,—তা ঘনরামের কাব্যে পাওয়া যায় না। যে নিখুঁত পর্যবেক্ষণ দক্ষতা ও গভীর সহানুভূতি মুকুন্দরামকে জীবন রসিক কবি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে—ঘনরামের কাব্যে তা নেই। ঘনরামের বিশাল কাব্যের সুদীর্ঘ বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে প্রাণহীন একঘেয়েমিতে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু বীররস বর্ণনায় স্থানে স্থানে করুণ ও হাস্যরস সৃষ্টিতেও ঘনরামের দক্ষতা অনস্বীকার্য। বীর রসের ক্ষেত্রে তিনি মুকুন্দরামকে অতিক্রম করে গেছেন। মুকুন্দরামের কাব্যের মত ঘনরামের কাব্যেও দেশপ্রীতির পরিচয় আছে। মুকুন্দরামের সমকক্ষ না হলেও ঘনরাম মঙ্গলকাব্যের একজন বিশিষ্ট কবি,—একথা অস্বীকার করা যায় না।

ভারতচন্দ্র ও ঘনরাম ঃ

ঘনরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের পথিকৃৎ,—সন্দেহ নেই। ছন্দ এবং ভাষা প্রয়োগে তিনি ভারতচন্দ্রের পথ প্রদর্শক। ঘনরামের পক্ষে এটা গৌরবের বিষয়। কিন্তু ভাষা ও ছন্দ প্রয়োগ কৌশলে ভারতচন্দ্র ঘনরামের পথানুসারী হলেও তিনি ঘনরামের থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ছন্দের যে নিপুণ প্রয়োগ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা মধ্যযুগের বাঙ্গালা কাব্যে নেই। সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙ্গালা ও পার্শী শব্দের মিশ্রিত ভাষা প্রয়োগে ভারতচন্দ্র যে শিল্প নৈপুণ্যের

রিচয় দিয়েছেন, তাও তুলনারহিত। এই তুটি ক্ষেত্রেই ঘনরামের কাব্য ারতচন্দ্রের পূর্বগামী। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত শিল্পকুশলতা ঘনরামের ছিল া। ছন্দশিল্পী ভারতচন্দ্র শব্দ, চিত্র ও ছন্দোমাধুর্যের সহায়তায় বাঙ্গালা ভাষার সৌন্দর্য বিধানে যে বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন,—সে প্রতিভার রিচয় ঘনরাম দিতে পারেন নি। মুকুন্দরাম, ঘনরাম প্রভৃতি পূর্বসূরীর প্রভাবকে ভারতচন্দ্র স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও াণ্ডিত্য বলে অন্নদামঙ্গল কাব্যে বাঙ্গালা ভাষার যে রূপসজ্জা বিধান করেছেন, া প্রাগাধুনিক যুগের কোন কবির কাব্যেই পাওয়া যায় না। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কাহিনী নির্মাণে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকলেও শব্দ ও ছন্দের প্রয়োগ নৈপুণ্যে তা বৈচিত্র হীন হয়ে ওঠে নি। ঘনরামের কাব্যের কাহিনী নির্মাণে বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু তাঁর কাব্যের সুদীর্ঘ বর্ণনা বৈচিত্র্যহীন মনে হয়। একদিক থেকে ঘনরাম কিছু কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। ভারতচন্দ্রের নির্মিত চরিত্রগুলি ছাঁচে ঢালা নিষ্প্রাণ বোধ হয়—তুই একটি চরিত্র ছাড়া সবগুলিই যেন প্রাণহীন পুতুল। ঘনরামের চিত্রিত চরিত্রগুলি সে তুলনায় অনেকাংশে জীবন্ত। তু-একটি চরিত্র বাদে অন্যান্য চরিত্রগুলিতে তিনি জীবনরস সঞ্চার করতে পেরেছেন।

রামেশ্বর ও ঘনরাম ঃ

রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে বিষয়বস্তু গতানুগতিক,—শিল্প চাতুর্যও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু হরগৌরীর গৃহস্থালী ও সংসারযাত্রায় বাঙ্গালী সমাজের বাস্তব চিত্র বর্ণিত হয়েছে। রামেশ্বরের কাব্যে দৈনন্দিন বাস্তব জগতের চিত্র যেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ঘনরামের কাব্যে সমাজের বাস্তব অবস্থার বর্ণনা থাকলেও তা তেমন জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। তথাপি কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনায় এবং চরিত্র চিত্রণে ঘনরাম রামেশ্বর অপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

রূপরাম ও ঘনরাম ঃ

ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম কবি না হলেও তাঁর কাব্যই সর্বপ্রথম

মুদ্রিত হওয়ায় শিক্ষিত সমাজে সর্বাধিক প্রচারলাভ করেছিল। ডঃ সুকুমার সেন বলেন যে রূপরামের কাব্যেরই প্রচার ছিল সর্বাধিক। ছাপাখানার কল্যাণেই ঘনরামের কাব্য অধিকতর প্রচারলাভ করেছে। একথা সত্য হলেও ঘনরামের প্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না।

রূপরামকে মঙ্গলকাব্যের প্রথম কবি বলা চলে। পরবর্তী অনেক কবির কাব্যেই রূপরামের প্রভাব পড়েছে। ঘনরামের আত্মবিবরণীতেও রূপরামের আত্মবিবরণীর প্রভাব সুস্পষ্ট। গতানুগতিক কাহিনী বর্ণনা সকল কবির কাব্যেই স্থান লাভ করলেও রূপরাম সহজ ভাষায় কাহিনী বর্ণনা করে কাহিনীকে গতিশীল করে তুলেছেন, চরিত্র সৃষ্টিতে এবং করুণ ও কৌতুক রস পরিবেষণে তাঁর বিশিষ্ট ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। ঘনরামের কাব্য কাহিনীও গতানুগতিক। তথাপি কাহিনী গ্রন্থনে, বাস্তব বর্ণনায়, চরিত্র সৃষ্টিতে এবং ভাষাতে ও ছন্দের প্রয়োগ কৌশলে তাঁর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। রূপরামের কাব্যের পরিসর স্বল্প। ঘনরাম বিস্তৃত পটভূমিকায় পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। ঘনরামের মত পাণ্ডিত্য রূপরামের ছিল না। পাণ্ডিত্য ঘনরামের কাব্যের সৌষ্ঠব বর্ধিত করেছে। প্রসঙ্গানুসারে অজস্র পুরাণ কাহিনী তিনি সুকৌশলে লাউসেনের কাহিনীর সঙ্গে সংমিশ্রিত করেছেন। শব্দপ্রয়োগ দক্ষতা এবং ছন্দোবৈচিত্র্যেও তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রকাশ লক্ষিত হয়। ভাষায় আলংকারিকতারও অভাব নেই। বীর করুণ হাস্য প্রভৃতি রস পরিবেষণেও তাঁর নৈপুণ্য নগণ্য নয়। তবে বিশাল পটভূমিকায় কাহিনী বর্ণনা কিছুটা বৈচিত্র্যহীন এবং নিষ্প্রাণ বোধ হয়। তৎসত্ত্বেও ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। রূপরামের আদর্শকেই তিনি গ্রহণ করেছেন, একথা সত্য। কিন্তু নানা দিক থেকে তিনি স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর সুমুদ্রিত করেছেন তাঁর কাব্যে। ভারতচন্দ্রের পূর্বসূরীদের মধ্যে ঘনরাম অন্যতম। পাণ্ডিত্যে এবং প্রতিভায় রূপরাম অপেক্ষা ঘনরামের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়িত। সুতরাং কেবলমাত্র ছাপাখানার দৌলতেই ঘনরামের কাব্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছে একথা বলা চলে না। উৎকর্ষের দিক থেকে ঘনরামের

কাব্য উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হওয়ার জন্যই ঘনরামের কাব্য অধিক প্রচার লাভ করেছে। তবে ছাপাখানার দানও অস্বীকার্য নয়। রূপরামের প্রতিভা উপেক্ষার যোগ্য নয় ঠিকই। তথাপি একই কাব্যধারায় একই অঞ্চলে দুই কবির আবির্ভাব ঘটায় উচ্চতর প্রতিভাসম্পন্ন কবির কাব্যটির সমাদর সমধিক হওয়াই স্বাভাবিক।

মাণিকরাম গাঙ্গুলী

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আর এক কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী। রূপরাম, ঘনরাম ও মাণিকরাম—এই তিনজন কবিরই সম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া গেছে। মাণিক গাঙ্গুলীর কাব্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।

মাণিকরাম তাঁর কাব্যে যে রচনাকাল দিয়েছেন, তা হেঁয়ালী ধরনের। মাণিকরামের কাব্যে উল্লিখিত রচনাকালটি নিম্নরূপ :

সাকেরী ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধসহ যুগ দক্ষে যোগ তার সনে॥

এই পঙ্ক্তি দুটির অর্থ করা একেবারেই অসম্ভব বোধ হয়। সুতরাং মাণিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যের রচনাকাল নিয়ে প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মাণিক গাঙ্গুলীর বংশধরদের কাছ থেকে যে পুঁথি পেয়েছেন, তাতে আছে :

রচনাকাল

সাকে রিত্ত সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধি সহ জ্জোগ দক্ষে যোগ তার সনে॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
সর্বরী সয়াগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত॥

যোগেশচন্দ্র এই পঙ্ক্তি কটির অর্থ করে স্থির করেছেন যে ৬৪৭+৮৪২=১৪৮৯ শক বা ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে মাণিকরাম তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সিদ্ধ শব্দের অর্থ ঋষি অর্থাৎ সাত ধরে ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দ মাণিকরামের কাব্য-

রচনার কালরূপে গণ্য করেন। যোগেশচন্দ্র মাণিক রামের বংশলতা ও পঞ্জিকা বিচার করে দেখিয়েছেন যে মাণিকরামের গ্রন্থ সমাপ্তির কাল ১৭০৩ শক ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ। তিনি সিন্ধ শব্দকে সিন্ধা রূপে গ্রহণ করে অর্থ করেছেন ২৪। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধা অর্থে ৮৪ (চৌরাশি সিন্ধা) ধরে ১৭০৯ শক বা ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ পেয়েছেন। মোট কথা মাণিকরাম যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন, তা অধিকাংশ পণ্ডিতই স্বীকার করেন। মাণিকরামের কাব্যের ভাষা আধুনিক হওয়ায় তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হওয়াই সম্ভব বোধ হয়। কবি কাব্য মধ্যে বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের উল্লেখ করেছেন :

বিষ্ণুপুরে মন্দির শ্রীমদনমোহনে।
পূর্বেতে আছিল প্রভু বিপ্রের সদনে॥

মদনমোহনের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং কবি সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের পূর্বে কাব্য রচনা করেন নি,—এ সিদ্ধান্ত সুপ্রমাণিত হয়। ডঃ সুকুমার বলেছেন যে মাণিকরামের কাব্যে রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জনের কাহিনীর উল্লেখ তাঁর অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাব্যরচনার ইঙ্গিত দেয়। কারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে এই কাহিনী প্রায় অজ্ঞাত ছিল। মাণিকরাম ময়ূরভট্ট ও রূপরামকে বন্দনা করেছেন। রূপরামের ধর্মমঙ্গল রচিত হয় ১৬৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং একথা অনুমান করা যেতে পারে যে রূপরামের খ্যাতি প্রসারিত হওয়ার পর মাণিকরাম ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন।

আত্মকাহিনী : মাণিকরামের কাব্যে বিস্তৃত আত্মকাহিনী বর্ণিত হয়েছে রূপরামের আত্মকাহিনীর অনুসরণে। এই কাহিনীতে বৈচিত্র্য আছে ঠিকই। কিন্তু একই রীতিতে ধর্মঠাকুরের আদেশ লাভ করার অলৌকিক কাহিনী ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করায়, তা চিত্তাকর্ষক হতে পারে না। মাণিকরামের ভণিতা ও আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে কবির পিতামহ অনন্তরাম,

পিতা গদাধর, মাতা কাত্যায়নী এবং পত্নী শৈব্যা।. কবিরা ছয় ভাই। তিনিই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। কাব্য রচনাকালে কবির তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল—কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, রমানাথ ও অভয়া। কবির এক ভাই ছকুরাম তাঁর কাব্যের গায়ন ছিলেন। কবিরা বংশানুক্রমে শীতলসিংহ ধর্মঠাকুরের সেবায়েত ছিলেন।

নানাস্থানে চতুষ্পাঠীতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পরে মানিকরাম তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে তুড়াড়ি গ্রামে যান। সেখানে এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়েছে। কবি তৎক্ষণাৎ খুঙ্গি পুঁথি নিয়ে বাড়ী রওনা হলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে কবি পথ হারিয়ে ফেললেন। খাটুলে পৌছানোর পরে এক নির্জন মাঠের মধ্যে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়,—কিছু পরেই বৃদ্ধ যুবকের মূর্তি পরিগ্রহণ করলেন। কবি ব্রাহ্মণের পরিচয় পেলেন, তাঁর নাম রাজ্যধর বিদ্যাপতি, নিবাস রঞ্জপুরে—তিনি অসাধারণ পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কবিকে তাঁর বাড়ী যেতে নির্দেশ দিয়ে অদৃশ্য হলেন। কিছু পরেই ধর্মের পাদুকা গলায় বেঁধে এক ধর্মপূজক পণ্ডিত এসে হাজির হলেন। পণ্ডিত মাণিকরামকে ধর্মঠাকুরের সেবা করার নির্দেশ দিলেন। কবি এক দিব্য সরোবর দেখে তার জলে তৃষ্ণা নিবারণ করে সেই সরোবরে পদ্মফুল তুললেন। কিন্তু পাদুকা সহ পণ্ডিত তখন অদৃশ্য হয়েছেন। মাণিকরাম বাড়ী পৌছালেন। দুদিন বাড়ীতে থাকার পর তিনি গেলেন রঞ্জপুরে। পথে সেই ব্রাহ্মণকে ক্রুদ্ধ অবস্থায় দেখলেন। মাণিকের কথায় ব্রাহ্মণ তুষ্ট হলেন এবং রঞ্জপুরে গিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। রঞ্জপুরে ব্রাহ্মণের কোন সন্ধান না পেয়ে মাণিকরাম ঘরে ফিরলেন। বাড়ী এসে তাঁর খুব জ্বর এলো। জ্বরের ঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে সেই ব্রাহ্মণ তাঁকে আশ্বস্ত করে ধর্মের গীত রচনা করতে বলেছেন।

কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ

উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ।

গীত রচ ধর্মের গৌরব হবে বাড়া
নকল দেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া।

ব্রাহ্মণ কবির কাছে আত্মপরিচয় দিলেন, তিনিই বিশ্বের কারণস্বরূপ বাঁকুড়া রায়। মাণিকরাম কাব্য রচনা করতে অঙ্গীকার করলেন। কিন্তু ধর্মের গীত রচনায় যে জাতি যাবার সম্ভাবনা।

এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান।
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে
স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে।

ধর্মঠাকুর মাণিকরামকে আশ্বস্ত করে অন্তর্হিত হলেন। কবি নিশ্চিন্ত মনে কাব্য রচনায় হাত দিলেন।

এই আত্মবিবরণীতে কাহিনীগত বৈচিত্র্য থাকলেও অন্যান্য কবিদের মত দেবতার আবির্ভাবের অবাস্তব কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। তাই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এই কাহিনীতে বাস্তব রসের সন্ধান মেলে না ; মনও তৃপ্ত হয় না।

কাব্যবিচার ঃ মাণিকরামের কাব্য ঘনরামের কাব্য থেকে হ্রস্বায়তনের হলেও আয়তন নিতান্ত স্বল্প নয়। মাণিকরাম ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। লাউসেনের বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল।
মুরারি ভারবিভট্ট নৈষধ পিঙ্গল ॥
কালিদাস কৃত কাব্য অন্য কাব্য কত।
অলংকার জ্যোতিষ আগম তর্কশাস্ত্র ॥
ছন্দ শাস্ত্র পুরাণ পড়িল তারপর।
উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বছর ॥

মনে হয় লাউসেনের বিদ্যার্জনের এই বিবরণ কবির নিজের বিদ্যাশিক্ষারই বিবরণ। মাণিকরাম তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্য কাব্যে প্রয়োগ করেছেন। তিনি

রামায়ণ মহাভারত থেকে প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কাব্যমধ্যে প্রচুর সংস্কৃত অলংকারও তিনি ব্যবহার করেছেন। তৎসম শব্দের প্রয়োগও তাঁর কাব্যে প্রচুর। ছন্দপ্রয়োগেও তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। তৎসত্ত্বেও পাণ্ডিত্যের গুরুভারে মাণিকরামের কাব্যের গতি ব্যাহত হয় নি।

মাণিকরামের কাব্য অন্যান্য কবিদের মতই চব্বিশ পালায় বিভক্ত। বারদিন ধরে গান করার জন্য এই কাব্যের নাম 'বারোমতি' বা 'বারমাতি'। কবি নিজেই কাব্যের নাম হিসাবে 'শ্রীধর্মমঙ্গল' ও 'বারমাতি' ব্যবহার করেছেন। কাব্যের দিগ্‌বন্দনা অংশে বিভিন্ন গ্রাম্য দেবদেবীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। মাণিকরামের কাব্যে সৃষ্টিপত্তন কাহিনী রূপরামের কাব্যের অনুরূপ। লাউসেনের কাহিনী গতানুগতিক—ঘনরামের কাব্যের অনুসারী। মাণিকরামের কাব্যে মার্কণ্ড মুনির উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। কবি রাঢ়ের ধর্মপূজা ও ধর্মঠাকুরের উৎসব সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কাব্য মধ্যে কবি আদিরসের বাড়াবাড়ি করেছেন। চরিত্র সৃষ্টিতে মাণিকরাম কিছু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কর্পূর চরিত্রটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কর্পূর যে কোন বিপদের সময়ে লাউসেনকে এগিয়ে দিয়ে নিজে নিরাপদ দূরত্বে থাকবার চেষ্টা করেছে, আবার বিপদ অতিক্রান্ত হলে বীরত্বের নিষ্ফল আস্ফালন করেছে। কালুডোমের দারিদ্র্য পীড়িত জীবনটি কবি সহানুভূতি সহকারে বর্ণনা করেছেন। দারিদ্র্যের প্রকোপে কালুকে শাক লাউ সিদ্ধ করে খেতে হয়,—তাতেও নুন জোটে না।

> ম্লানমুখ সদাই শূকর সঙ্গে ফির্য়া।
> কটিতে কৌপীন তায় গণ্ডা দশ গির্য়া॥
> তৈল বিনা তাম্রকেশ তনু যেন খড়ি।
> কেবল সঙ্কট কষ্ট কপালের ডেড়ি॥

মানিকরামের কাব্যে বর্ণিত চরিত্রগুলি মোটামুটি বাস্তবানুগত। কিন্তু কাহিনী, ভাষা, চিত্রনির্মাণ প্রভৃতিতে তিনি কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। ভাষা

ব্যবহারে মাণিকরামের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে; তিনি আঞ্চলিক ভাষা যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধে দক্ষিণ রাঢ়ের কথ্য ভাষার নিদর্শন মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলে যে পরিমাণে এবং যতটা খাঁটিভাবে পাওয়া যায় তাহা আর কোথাও মিলে না। দোষের মধ্যে হইল মাঝে মাঝে অপরিচিত ও উৎকট তৎসম শব্দ দিয়া অনুপ্রাস সৃষ্টি করিয়াছেন।"

ঘনরাম ও মাণিকরাম ঃ

মাণিকরামের কাব্য পড়ে মনে হয় যে তিনি ঘনরামের কাব্যের অনুসরণে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। মাণিকরামের কাহিনী ও ঘনরামের কাহিনী একই রীতিতে বর্ণিত হয়েছে। রঞ্জাবতীর শালে ভর, লাউসেনের জন্ম, লাউসেনের প্রতি মহামদের অত্যাচার, লাউসেনের বীরত্ব কাহিনী প্রভৃতি বর্ণনায় মাণিকরাম ঘনরামেরই অনুসারী। এমনকি, সামাজিক আচার, আচরণ, রাজসভা, যুদ্ধায়োজন প্রভৃতি বর্ণনাতেও মাণিকরামের কাব্য ঘনরামের অনুসারী। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মাণিকরাম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "ঘনরামের পর তাহার কাব্য না লিখিলেও চলিত।" ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "মাণিকরাম মোটামুটি ভাবে ঘনরামের কাব্যেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তবে ঘনরামের তুলনায় মাণিকরামের রচনা কতকটা সংক্ষিপ্ত। অনুপ্রাস প্রিয়তা উৎকটরূপে দেখা দিয়াছে এবং ঘনরামের মতই তাহা পয়ারের দ্বিতীয় চরণে।" অলংকার প্রয়োগেও মাণিকরাম ঘনরামের অনুসরণ করেছেন।

তথাপি ঘনরামের কাব্য অপেক্ষা মাণিকরামের কাব্যে কিছু স্বতন্ত্রতা আছে। মাণিকরামের কাহিনীর পরিসর ঘনরামের কাব্য অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। ঘনরামের কাব্যে মার্কণ্ড মুনির ধর্মপূজার উল্লেখ নেই কিন্তু মাণিকরাম মার্কণ্ড মুনির ধর্মপূজা বর্ণনা করেছেন। মাণিকরামের কাব্যে গৌড়েশ্বরের মায়ের নাম

সাফুল্লা, ঘনরামের কাব্যে বল্লভা। মাণিকরামের কাব্যে লাউসেনের অশ্বের নাম 'অস্থির পাথর' আর ঘনরামের কাব্যে 'আণ্ডির পাথর'। মাণিকরাম সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা করেছেন রূপরামের কাব্যের অনুসরণে। ঘনরামের কাব্যে সৃষ্টিপত্তনের বিবরণ তা থেকে পৃথক। ঘনরামের কাব্যে রঞ্জাবতী কর্ণসেনকে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী শুনিয়েছে। আর মাণিকরামের কাব্যে সামুলা রঞ্জাবতীকে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী শুনিয়েছে। হরিশ্চন্দ্রের পরিচারিকা হাড়িনী রাজাকে অপুত্রক বলে গঞ্জনা দেওয়ায় রাজা মনোদুঃখে রাজ্য ত্যাগ করে বল্লুকা নদীতীরে গমন করেন এবং সেখানে মার্কণ্ডেয় মুনির সাক্ষাৎ লাভ করেন। রাজা মার্কণ্ডেয় মুনির কাছ থেকে ধর্মপূজায় উপদেশ পান। কাহিনীবর্ণনায় এই রকম কিছু কিছু বিশিষ্টতা থাকলেও ঘনরামের কাব্যের সঙ্গে রূপরামের কাব্যের সাদৃশ্য কম নয়। মাণিকরাম ঘনরামেব মতই প্রচুর পুরাণ প্রসংগের অবতারণা করেছেন। রূপরামও তাঁর কাব্যে পুরাণকথাব অবতারণা করেছেন। এই তিন কবিব কাব্যেই চরিত্রগুলিতে বামায়ণ মহাভারত ভাগবত ইত্যাদি চরিত্রের আদর্শ আছে। তথাপি ঘনরাম চরিত্রসৃষ্টিতে অধিকতর কুশলতা দেখিয়েছেন। ছোট ছোট চরিত্রগুলিতে কবির নিপুণ হস্তের পরিচয় আছে। মাণিকরামও ছোটখাট চরিত্রগুলি বাস্তবতা সহকারে বর্ণনা করেছেন। ঘনরামের কাব্যে শব্দ কৌশল—ভাষা বিন্যাস—ছন্দের বৈচিত্র্য,—চিত্র নির্মাণ ইত্যাদিতে যে প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে, মাণিকরামের কাব্যে তা অনুপস্থিত। ছন্দ, শব্দ ও ভাষা প্রয়োগ কৌশলে ঘনরাম রায়গুণাকরেব পথ প্রদর্শক। মাণিকরাম সে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "ভাষা ভঙ্গিমায় তিনি রামেশ্বর, ঘনবাম বা ভারতচন্দ্রের মত চমকপ্রদ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই, যদিও তিনি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর অন্তত: দুই দশক পরে ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।"

মাণিকরামের কাব্যে রূপরামের কাব্যের অনুস্মৃতিও অত্যন্ত স্পষ্ট। স্থানে স্থানে দুই কবির কাব্যে যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়, তা থেকে মনে হয় যে

মাণিকরাম রূপরামের কাব্যকে হুবহু অনুকরণ করেছেন। দুই কবির ইছাই ঘোষের পালাটি একই প্রকার।

ধর্মমঙ্গলের অপ্রধান কবি ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও কয়েকজন কবির কাব্য পাওয়া গেছে। এইগুলি অধিকাংশই গতানুগতিক কাহিনী বর্ণনা। সাহিত্য হিসাবে এগুলির মূল্য খুব বেশী নেই।

রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যে ঃ

দ্বিজ রামচন্দ্র বা রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জের ধর্মমঙ্গল ১০৩৮ মল্লাব্দ বা ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে মল্লভূমের রাজা গোপালসিংহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল। রামচন্দ্রের কাব্যের কয়েকটি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গেছে। এই কাব্যের কিয়দংশ সাহিত্য সংহিতায় প্রকাশিত হয়েছে। ভণিতা থেকে জানা যায় যে কবির নিবাস ছিল আধুনিক বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আমোদর তীরে চামোট গ্রামে। গোকুল নগরের ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহে রামচন্দ্র ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। রামচন্দ্র তাঁর কাব্যকে অনাদ্য মঙ্গলও বলেছেন।

রামচন্দ্রের ভাষা প্রাঞ্জল। পাঁচালীর আকারে তিনি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাভঙ্গীও প্রাঞ্জল। ছন্দ প্রয়োগে কবির দক্ষতা ছিল। কাব্যে কবিত্বের তেমন পরিচয় না থাকলেও পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। কবি সংস্কৃত ছন্দ কাব্যে ব্যবহার করেছেন। পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর তাঁর কাব্যকে স্থানে স্থানে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

নরসিংহ বসু ঃ

নরসিংহ বসুর পৈত্রিক নিবাস ছিল গোপভূমের অন্তর্গত বসুধা গ্রামে (আধুনিক বর্ধমান জেলার পানাগড়ের নিকটে)। নরসিংহের পিতামহ মথুরা বসু বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের সময় বর্ধমানের চাবি

ক্রোশ দক্ষিণে শাঁখারি গ্রামে বাস করেন। মথুরা বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র ঘনশ্যামের
ত্র নরসিংহ বসু। নরসিংহ ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। তিনি অল্প বয়সে
পিতৃহীন হয়েছিলেন এবং পিতামহ পিতামহীর স্নেহে বর্ধিত হন। পিতামহ
কবির বিদ্যাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। নরসিংহ বাঙ্গালা, পার্শী, উড়িয়া
হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি পিতামহ সম্পর্কে লিখেছেন :

পিতৃব্যবহারে পালিল যত্ন করি।
বাঙ্গালা পারসী উড়্যা পড়াল্য নাগরী ॥

নিজের বিদ্যা এবং বুদ্ধিবলে নরসিংহ মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে বীরভূমের রাজা আসফুল্লাহ খানের উকিল নিযুক্ত হয়েছিলেন। একসময়ে খাজনার টাকা দিতে না পারায় আসফুল্লা খাঁর জমিদারী বিপন্ন হলে নরসিংহ নবাবের কাছ থেকে সময় নিয়ে টাকা সংগ্রহ করে শিবিকারোহণে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ঝড়বৃষ্টির ফলে তিনি আউস গ্রামে আশ্রয় নিলেন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। কিছুদূরে জুঝাটি গ্রামে খেজুর তলায় ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। নরসিংহ পাল্কি ত্যাগ করে একাকী ঠাকুর প্রণাম করতে গেলেন। সেই সময়ে প্রণাম কালে এক সন্ন্যাসী এসে তাঁকে ধর্মের গীত গাইতে অনুরোধ করলেন।

অপূর্ব সন্ন্যাসী এক আস্যা উপস্থিত।
আশীর্বাদ দিয়া কন গাও কিছু গীত ॥
অপরূপ বচন বলিল মহাশয়।
চারিপার্শ্বে মোহিত কতক হইল ভয় ॥
ভূমে পড়্যা দণ্ডবৎ জুড়্যা দুই কর।
মাথা তুল্যা চাহিতে সন্ন্যাসী অগোচর ॥

দুদিন নিজ বাড়ীতে কাটিয়ে নরসিংহ মুর্শিদাবাদ যাত্রা করলেন। পরে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় হাত দেন। কবি দিনে কাজ করতেন নবাবের দরবারে আর রাত্রে কাব্য রচনা করতেন।

নরসিংহ কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন ১৬৩৬ শকাব্দে বা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে রচনাকাল সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

শক শশী পিঠে ঋতু ভুবনেতে রস।
কবির আরম্ভ কর্কটের দিন দশ॥

নরসিংহ বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু এই পাণ্ডিত্যের প্রকাশ তাঁর কাব্যে নেই। তাঁর কাব্যের ভাষা সহজ মার্জিত ও গ্রাম্যতা দোষমুক্ত। কাব্যখানি আকারে বড়। কিন্তু সহজ ভঙ্গীতে রচিত কাব্যকাহিনীর গতি পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত হয় নি।

হৃদয়রাম সাউ ঃ

হৃদয়রাম সাউ ১১৫৬ বঙ্গাব্দে বা ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। বর্ধমান জেলায় বনপাশ ষ্টেশনের নিকটবর্তী খুরুল গ্রামে মাতৃ-পিতৃহীন অবস্থায় কবি মাতুলালয়ে বসবাস করতেন। চাঁদরায় ধর্মঠাকুরের সেবায় অংশ নিয়ে মাতুলদের সঙ্গে বিবাদের ফলে কবি গ্রাম ত্যাগ করে গ্রাম প্রান্তে তুলসী পুকুরে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন। সেই সময়ে ধর্মঠাকুর স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে কবিকে নিরস্ত করেন এবং নিদিয়াদহ বিল থেকে ধর্মঠাকুরের শিলামূর্তি উদ্ধার করে পূজা করতে নির্দেশ দেন। কবি নির্দেশমত ধর্মঠাকুরের বিগ্রহ উদ্ধার করে বীরভূম জেলায় নান্নুরের নিকট-বর্তী উচ্চকরণ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এখানেই কবি ধর্মঠাকুরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। হৃদয়রাম ছিলেন জাতিতে শুঁড়ি। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দ, মাতা মুকুতা, মাতামহের নাম কমল।

হৃদয়রামের কাব্যে 'মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব আছে। তবে তাঁর কাব্যে কবিত্ব শক্তির তেমন পরিচয় নেই। হৃদয়রামের কাব্যের ভাষা

সংস্কৃত বহুল হলেও, বর্ণনা বেশ স্বচ্ছন্দ গতি। রঞ্জাবতীর রূপ বর্ণনা প্রসংগে কবি লিখেছেন,

নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নির্মাণ
কামান জিনিয়া ভুরুখানি।
মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম যেন মুকুতার দাম
অঙ্ক পসি যেন পদ্মমণি॥

এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। মুকুন্দরামের প্রভাবও এই বর্ণনায় সুস্পষ্ট।

রামকান্ত রায়ঃ

রামকান্ত রায় ধর্মমঙ্গল রচনা করেন ১১৯৭ বঙ্গাব্দে বা ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে। কাব্যরচনার কাল নির্দেশ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

এগার শ সাতানয় সালের আশ্বিনে।
আরম্ভ করিনু শুক্লা একাদশীর দিনে॥
মনে যাহা করি তাহা লিখি অনায়াসে।
বারমতি সাঙ্গ হল বাষট্টি দিবসে॥

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ১১৫৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭০০ খৃষ্টাব্দ রামকান্তের কাব্য রচনার কাল বলে মনে করেন। কবির নিবাস ছিল দামোদর নদের অপর পাড়ে বর্ধমান শহরের দক্ষিণে সেহারা গ্রামে। রামকান্ত তাঁর কাব্যে গতানুগতিক রীতিতে আত্মকাহিনী বর্ণনা করেছেন।

বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের জমিদারী সেহারা গ্রামে পুরুষানুক্রমে রামকান্ত বাস করতেন। কবি জাতিতে কায়স্থ। তিনি চাষী গৃহস্থের ছেলে। কিছুকাল বেকার জীবন যাপন করার ফলে কবির কাছে জগৎ-সংসার ও জীবন বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। একদিন ভাদ্রমাসে রামকান্ত পিতার আদেশে ক্ষেতে মজুরদের জলখাবার দিতে গিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত

ও অবসন্ন হয়ে পড়লেন। এমন সময়ে এক অদ্ভুত দর্শন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

অর্ধচন্দ্র কপালে কানেতে জবাফুল।
মাথায় লম্বিত জটা সর্প সমতুল॥
দিব্যধৃতি পরিধান কুসুম আকার।

এই ব্রাহ্মণ কবিকে 'বারমতি' লেখার আদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। বাড়ী গিয়ে কবি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন এবং স্বপ্নে দেখলেন যে ব্রাহ্মণ তাঁকে বলছেন,

দেখা দিনু মাঠেতে চিনিলে নাই মোরে।
বুড়া রায় থাকি আমি সরকারের ঘরে॥
বাবলা তলায় সদাই মোর স্থিতি।
ইচ্ছা হল্য তোরে লেখাইব বারমতি॥
জাগাইব নিজ পাট বাবলা দেহারা।
বহুকাল গুপ্তভাবে রেখেছি সেহারা॥

বাবলাতলায় ধর্মঠাকুর বুড়ারায়ের সেবক বাঞ্ছারামের বাড়ীতে কবি কাব্য রচনা করেন। কবির আত্মকাহিনীটি বাস্তব রসাশ্রিত। ডঃ সুকুমার সেন এই আত্মকাহিনীটি সম্পর্কে বলেছেন, "রামকান্তের আত্মকাহিনীতে অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে দক্ষিণ রাঢ়ের চাষীঘরের একটু দুর্লভ বাস্তব ছবি পাইতেছি। দেশের আসল ইতিহাসের পক্ষে এই বর্ণনার মূল্য আছে। সাহিত্যমূল্যও উপেক্ষার নয়। বেকার অবস্থায় পড়িয়া তরুণ রামকান্ত মনের দ্বন্দ্ব বিক্ষোভের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে আধুনিক ভাবনার আভাস আছে।"

প্রভুরাম মুখুজ্জ্যে

মল্লভূমির রাজা গোপালসিংহের রাজত্বকালে প্রভুরাম মুখুজ্জ্যে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। গোপালসিংহের মৃত্যুর (১৭৪৮ খৃঃ) পূর্বেই কাব্যটি সমাপ্ত

হয়। প্রভুরামের নিবাস ছিল মল্লভূমিতে আলিগুবিন্যা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম জানকীরাম, মাতা অন্নপূর্ণা ও পিতামহের নাম গোবিন্দ। প্রভুরাম কাব্যে আত্মবিবরণী না দিলেও দিগ্‌বন্দনা থেকে জানা যায় যে তিনি বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে পড়তেন। একদিন দুপুরবেলা মাঠে গরু চরাতে গিয়ে ধর্মঠাকুরের আদেশ পান ধর্মমঙ্গল রচনার জন্য। দিগ্‌বন্দনায় তিনি বাঙ্গালা উড়িষ্যা সীমান্তের প্রসিদ্ধ ধর্মঠাকুরের ও অন্যান্য দেবতার উল্লেখ করেছেন।

সহদেব চক্রবর্তী :

সহদেব চক্রবর্তীর কাব্যের নাম অনিলপুরাণ। ১১৪১ সালে (১৭৩৪ খৃঃ) ৪ঠা ভাদ্র সহদেব ধর্মঠাকুর কালুরায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাব্য রচনা শুরু করেন। কবি লিখেছেন :

কবি পরিচিতি

দ্বিজ সহদেব গান পূর্বতপ ফলে।
যাহারে করিলে দয়া একচল্লিশ সালে॥
চৈত্রের চতুর্থ দিনে পূর্ণিমার তিথি।
হেন দিনে যারে দয়া কৈলা যুগপতি॥

১১৪১ সালে ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমা না থাকায় কবির রচনা কাল নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। কেউ কেউ মনে করেন, পূর্ণিমার পর চতুর্থী তিথিতে সহদেব কাব্য আরম্ভ করেন। সহদেবের পুঁথিতে তারকেশ্বর বন্দনায় তারকেশ্বর প্রতিষ্ঠার (১১৪১ বঙ্গাব্দ) কথা উল্লেখ করেছেন। স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুপ্ত একটি পুঁথিতে ১১৯৩ বঙ্গাব্দ (বা ১৭৮৭ খৃঃ) দেখেছিলেন। সুতরাং ১১৪১ সাল থেকে ১১৯৭ সালের মধ্যে সহদেবের কাব্য রচিত হয়েছিল বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। সহদেবের নিবাস ছিল হুগলী জেলার বালিগড় পরগণার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে। কবির পিতার নাম বিশ্বনাথ, পিতামহ রাজারাম ও অগ্রজ মহাদেব।

সহদেবের কাব্যে বার বার কালুরায়ের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। কালুরায়

কবি তাঁকে কাব্য রচনায় স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন। মনে হয় কবি কালুরায়ের সেবক ছিলেন।

সহদেবের কাব্যের নাম অনিলপুরাণ। সহদেবের অনিলপুরাণ ধর্মমঙ্গল কাব্য নয়,—এতে লাউসেনের কাহিনী নেই। এটি ধর্মপুরাণ; কিন্তু বিশুদ্ধ ধর্মপুরাণও নয়। অনিলপুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণ বর্ণিত হয়েছে —হরিশ্চন্দ্র ও লুইচন্দ্রের কাহিনীও সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে

কাব্যবিচার

এর সঙ্গে স্থান পেয়েছে শিবের পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী—নাথ সাহিত্যের গোরক্ষনাথ মীননাথ প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যগণের জীবনী এবং নানা পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনী। পৃথক পৃথক কতকগুলি বিষয় সন্নিবিষ্ট হওয়ায় কাব্যটি একটি অখণ্ড রসমূর্তি লাভ করে নি। একক কাব্য হিসাবে এটিকে বিচার করা চলে না। কাব্যে চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টাও যেমন নেই, কাহিনী গ্রন্থনেও তেমনি কোন নৈপুণ্য নেই। তথাপি কবির বর্ণনাভঙ্গী প্রাঞ্জল,—ভাষা মার্জিত এবং স্থানে স্থানেও মর্মস্পর্শী। ভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ স্থানে স্থানে সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। যেমন—

অতি অনুপাম শোভা শোভিত কৈলাস।
ষড়্ ঋতু বসন্ত সমীর বারো মাস॥
কুসুম দিগন্ত গন্ধ সদা বিকশিত।
অলিগণ গায় শিব দুর্গার চরিত॥

অনিলপুরাণে "নিরঞ্জনের রুস্মা" নামক আখ্যানটিও স্থানলাভ করেছে। বৈষ্ণব প্রভাব এই কাব্যে যেমন আছে, তেমনি কবির শক্তি ভক্তিরও প্রকাশ আছে।

বৈষ্ণব ভাবের উদাহরণ—

মিছা মায়া মধুরসে বন্দী হয়্যা মায়া পাশে
হরিপদে না রহে ভকতি।
তসরের পোকা যেন লূতায় বসিয়া হেন
নিজ সুখে মজে লঘু গতি॥

যোগীর পরম ধন গোবিন্দের পদে মন
শুনেছি সনক সনাতন।...

শক্তি ভাবুকতা—

শরণ লইনু জগৎ জননী
ও রাঙ্গা চরণে তোর।
ভব জলধিতে অনুকূল হৈতে
কে আর আছয়ে মোর।

এই উদ্ধৃতিগুলিতে কবির আন্তরিকতা সহজে ফুটে উঠেছে। কিছু কিছু হেঁয়ালীর পদে কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অনিলপুরাণের কাব্যমূল্য অল্প হলেও ধর্মতত্ত্ব ও সে যুগের সামাজিক ইতিহাস হিসাবে এর মূল্য যথেষ্ট আছে।

অন্যান্য কবি :

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ (ইছাই ঘোষের পালার লেখক), দ্বিজক্ষেত্রনাথ, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী, নিধিরাম গাঙ্গুলী কবিচন্দ্র প্রভৃতি কবিদের ধর্মমঙ্গল কাব্যের পুঁথি পাওয়া গেছে ; কিন্তু গতানুগতিক কাহিনী বর্ণনা ছাড়া কবিত্বের দিক থেকে এঁর কেউই বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি।

শিবায়ন

শিব পূজা বা শিব উপাসনা ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন। ঋগ্বেদের রুদ্র—পুরাণের শিব। শিবের পত্নী শিবানী—রুদ্রাণী—পার্বতী—অম্বিকা—উমা। তিনিই আবার চণ্ডী—দুর্গা—অন্নপূর্ণা। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবখণ্ডে শিব-শিবানীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনীতে শিব-শিবানী সম্পর্কে সংস্কৃত পুরাণাদিতে বর্ণিত কাহিনী বিবৃত হয়েছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে শিব ঠাকুরের পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর সমন্বয়ে শিবায়ন

কাব্য আত্মপ্রকাশ করে। পণ্ডিতদের মতে পৌরাণিক শিবের সঙ্গে অনার্যকৃষ্টির সংমিশ্রণের ফলে 'শিবায়নে'র শিব-কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে।

কাহিনী : দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ—দক্ষযজ্ঞ বিনাশ—সতীর পার্বতী রূপে জন্ম—শিবের সংগে বিবাহ বর্ণনার পর লৌকিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। শিবের গৃহে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত পার্বতী শিবকে কৃষিকর্মের দ্বারা দারিদ্র্যমোচনের পরামর্শ দিলেন। শিব পত্নীর পরামর্শে কৃষিকার্য করতে সিদ্ধান্ত করে ইন্দ্রের নিকট থেকে ভূমি পাট্টা নিলেন, বিশ্বকর্মা শিবের ত্রিশূল গালিয়ে লাঙ্গল গড়ে দিলেন, কুবেরের কাছ থেকে বীজধান ধার করলেন। শিব অনুচর ভাগনে ভীমকে সঙ্গে নিয়ে চাষের কাজে লেগে গেলেন। চাষে প্রচুর ফসল ফললো,—নারদের ঢেঁকি ধার করে ভীম চাল তৈরী করলো। গৌরীর সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য এলো। শিব চাষে এমন মশগুল হয়ে পড়লেন যে কৈলাসে আর ফিরতে চাইলেন না। পার্বতী ডাঁশ, মশা ও মাছি পাঠিয়ে শিবকে উত্যক্ত করে তুললেন। শিবও নানা উপায়ে বলদ, মহিষ ও নিজেকে ডাঁশ-মশা-মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা করলেন। তখন দেবী পার্বতী বাগ্দিনীর বেশে শিবের ক্ষেতে জল ছেঁচে মাছ ধরতে লাগলেন। শিব বাগ্দিনীর রূপে মোহিত হয়ে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব করলেন এবং বাগ্দিনীর সহায়তাকল্পে নিজেই জল ছেঁচে মাছ ধরতে লাগলেন। বাগ্দিনী শিবের মদন বিহ্বলতার সুযোগে তাঁর হাত থেকে পিতলের আংটি চেয়ে নিলেন এবং কৌশলে শিবের হাত থেকে মুক্তি নিয়ে কৈলাসের পথ ধরলেন। শিবও কামমোহিত হয়ে বাগ্দিনীর পশ্চাদপসরণ করে কৈলাসে উপস্থিত হলেন। পার্বতী স্বরূপ ধারণ করে শিবের বাগ্দিনী প্রীতিতে রোষ প্রকাশ করে তাঁর গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন। নারদের পরামর্শে তিনি শিবের নিকট থেকে প্রার্থনা করলেন একজোড়া শাঁখা। শিবের সামর্থ্য নেই পত্নীকে শাঁখা দেবার—তিনি ভর্ৎসনা করলেন পত্নীকে শাঁখা পরার সাধের জন্য, এবং পিতৃগৃহে গিয়ে গহনা পরার সাধ মিটিয়ে

আসতে বললেন। পার্বতী অভিমানভরে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। শিব নারদের পরামর্শ অনুসারে পার্বতীর পিতৃগৃহে শাঁখারীর বেশ ধরে গিয়ে পার্বতীর হাতে শাঁখা পরিয়ে দিলেন। পার্বতীর অভিমান দূর হোল। তিনি স্বামীর সঙ্গে কৈলাসে ফিরে এলেন।

এই কাহিনীর মধ্যে ঘটনাগত ঐক্যের অভাব থাকায় কাহিনীতে অসঙ্গতি সহজেই চোখে পড়ে। এই অসঙ্গতির ফলেই চরিত্রগুলির স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয় নি। শিবের বিচিত্র ভূমিকার জন্যই শিবচরিত্র একটি সুসঙ্গত পরিণতি লাভ করতে পারে নি।

শিবায়নের কবি ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীতে দুজন শিবায়ন কাব্যের কবির সন্ধান পাওয়া যায়,—কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী ও কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ।

শঙ্কর চক্রবর্তী ঃ শঙ্কর চক্রবর্তী বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের সভাকবি ছিলেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে কাব্য রচনা করে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

শঙ্কর চক্রবর্তী বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁর শিবায়ন কাব্য রচিত হয়।

শঙ্করের শিবায়নের 'মাছধরা পালা' শীর্ষক একটি মাত্র পালা পাওয়া গেছে। এই কবিরই 'ভাগবতামৃত' কাব্যের ভূমিকার সম্পাদক মাখনলাল মুখোপাধ্যায় 'শঙ্খপরা' নামে আর একটি পালার উল্লেখ করেছেন। শঙ্করের শিবায়ন কাব্য সম্পূর্ণ না পাওয়া গেলে তাঁর এই কাব্য সম্পর্কে আলোচনা সম্ভব নয়। 'মাছ ধরা পালায়' শিবের দারিদ্র্য হেতু গৌরী শিবকে তিরস্কার করলে শিব ভাগনে ভীমসেনকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাস ত্যাগ করে মর্তে চাষবাসে মন দিলেন। স্বপ্ন দেখে গৌরীর মন চঞ্চল হওয়ায় তিনি বাগ্দিনী

বেশে বৃদ্ধপত্তির মন আকৃষ্ট করেন—তাঁকে দিয়ে মাছ ধরিয়ে কৌশলে কৈলাসে নিয়ে এলেন। এই পালাটিতে কবির প্রতিভার পরিচয় না থাকলেও সহজ ভাষায় বাঙ্গালা দেশের সমাজের বিবরণটির একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়ঃ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ রায় (দাস) 'শিবায়ন' নামক সুবৃহৎ কাব্যটি রচনা করেন। রামকৃষ্ণের নিবাস ছিল আধুনিক হাওড়া জেলার আমতার নিকবর্তী দামোদর নদের তীরে রসপুর গ্রামে। কবি দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ বংশীয়। কাব্যারম্ভেই তিনি নিজের বংশ পরিচয় বিবৃত করেছেন। এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে

কবিপরিচয়

কবির পিতামহের নাম যশশ্চন্দ্র রায়, মাতামহের নাম সূর্য মিত্র, পিতা কৃষ্ণ রায়, মাতা রাধা দাসী। ভণিতায় কবি নিজেকে 'কবিচন্দ্র' বা 'কবিচন্দ্র দাস' রূপে উল্লেখ করেছেন। "কবিচন্দ্র রচিলা সঙ্গীতে শিবায়ন।" মনে হয় 'কবিচন্দ্র' তাঁর উপাধি ছিল। রামকৃষ্ণের দুই পত্নী ছিল। প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত ছয়টি পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত একটি পুত্র ছিল। কাব্য মধ্যে কবি প্রথম পুত্র জগন্নাথ ও দ্বিতীয় পুত্র বলরামের জন্য দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। অন্য কোন পুত্রের উল্লেখ না থাকায় কেউ কেউ অনুমান করেন যে কাব্যটি কবির প্রথম জীবনে রচিত হয়েছিল।

রামকৃষ্ণের কাব্যের প্রাচীনতম পুঁথির লিপি সমাপ্তিকালে ১১ই শ্রাবণ ১০৯১ সাল (১৬৮৪ খৃঃ)। সুতরাং কাব্যের রচনাকাল এই সময়ের পূর্বে হওয়াই সম্ভব। রামকৃষ্ণের কাব্যের রচনাকাল কাব্য মধ্যে উল্লিখিত হয় নি। কবির পুত্র জগন্নাথ পিতার মৃত্যুর পর বর্ধমান রাজসরকারে সাহায্য

রচনা কাল

প্রার্থনা করায় কিছু ভূ-সম্পত্তি পেয়েছিলেন। ১০৯১ বঙ্গাব্দে বা ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে দানপত্রটি লিখিত হয়। সুতরাং ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছিল। কবির বর্তমান বংশধর পাঁচুগোপাল রায় অনুমান করেছেন যে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। এরূপ

ক্ষেত্রে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে কাব্যটি রচিত হওয়া সম্ভব।* রামকৃষ্ণের শিবায়নের সম্পাদক ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। শোনা যায় যে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম কবির গৃহদেবতাকে বলপূর্বক কেড়ে নিয়ে যাওয়ায়, কবি ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণের শিবায়ন পঁচিশটি পালায় বিভক্ত। সৃষ্টিতত্ত্ব, কালবিভাগ, তীর্থ-মহাত্ম্য, দক্ষযজ্ঞ, উমার জন্ম, তপস্যা, বিবাহ, বাসরযাপন, কৈলাসযাত্রা, মনসার উপাখ্যান, সমুদ্রমন্থন, বলিরাজার কাহিনী, সগর রাজার উপাখ্যান, গঙ্গাবতরণ, ত্রিপুরাসুর ও তাড়কাসুর বধ, শিবদুর্গার কোন্দল, অন্ধকাসুর বধ, পরশুরাম ও রাবণের উপাখ্যান, উষা ও অনিরুদ্ধের কাহিনী প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যে শিবের লৌকিক কাহিনী তেমন প্রাধান্য লাভ করে নি; প্রাধান্য লাভ করেছে বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হরগৌরী সম্পর্কিত উপাখ্যান —সৃষ্টিতত্ত্ব, তীর্থমহিমা, মন্বন্তর, দেবদেবীর মূর্তি বর্ণনা প্রভৃতি। রামকৃষ্ণের শিবায়ন মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা সংস্কৃত পুরাণের অধিকতর নিকটবর্তী। রামকৃষ্ণ সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। তিনি নিজেই লিখেছেন:

রামকৃষ্ণের কবিত্ব

শুনিনু দর্শন ছয় বেদশাস্ত্র যত কয়
অষ্টাদশ পুরাণ ভারত।
বাল্মীকাদি মুনিবর বেদব্যাস পরাশর
ভিন্ন ভিন্ন সভাকার মত॥
আপনার মনোরথে নানা পুরাণের মতে
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধ॥

কবির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার। তিনি হরি ও হরকে এক অভিন্ন রূপে বর্ণনা করেছেন। মীননাথ, গোরক্ষনাথকে তিনি বন্দনা করেছেন; আবার চৈতন্য মহাপ্রভুকেও বন্দনা করেছেন; রামকৃষ্ণ কাব্যের মূলকাহিনীর সঙ্গে বহু

উপকাহিনী সংশ্লিষ্ট করেছেন। আদিরস বর্ণনার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও কবি কোথাও সংযম হারান নি। তাঁর কাব্যে মঙ্গলকাব্য সুলভ গ্রাম্যতা কোথাও নেই। মনসার উপাখ্যানে কবি চণ্ডী মনসা গঙ্গার বিবাদ বর্ণনা করেছেন। রামকৃষ্ণের বর্ণিত মনসার উপাখ্যান মনসামঙ্গল কাব্যের লৌকিক কাহিনী নয়,—মহাভারত-পুরাণের জরৎকারু প্রসঙ্গ। মূল কাব্যের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত হলেও হরপার্বতীর লৌকিক কাহিনীটিও রামকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন। এই সকল ক্ষেত্রে কবি পুরাণের মহিমামণ্ডিত পরিবেশের উচ্চগ্রাম থেকে অবতরণ করে লঘু সুরে কথা বলেছেন। শিবের বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল, প্রভৃতিতে বাঙ্গলার গার্হস্থ্য চিত্রই কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। হর-গৌরীর কোন্দল বর্ণনায় নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের অভাব-অনটনের চিত্রই প্রকট হয়ে পড়েছে। শিবের প্রতি গৌরীর উক্তিতে একটি আশাহতা বধূর চিত্রই ফুটে উঠেছে।

শয়নে তোমার পাশে নিদ্রা নাহি হয় ত্রাসে
জটায় জলের কুলকুলি।
সাপের ফোঁস ফোঁস শুনি সাত পাঁচ মনে গুণি
পালাইতে পরম আকুলি॥
হস্তপদ যদি নাড়ি চামড়ার ঘড়ঘড়ি
শয্যে সাপ করে ইলিবিলি॥
এমত সুখের শয্যা ইতি পতি পরিচর্যা
যদি করে নারী তারে বলি॥

গৌরীর বিয়েতে বুড়ো বর দেখে এয়োদের কৌতুকর মন্তব্যটিতেও কবির কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

দোজ বর‍্যা বরে সই কিছু নহে হারা।
ঊর্দ্ধমুখে আছে চক্ষে দেখিবেক তারা॥

মোরা নাহি যাব কেহ বরের নিকট।
চৌদিকে চরায় চক্ষু চাহে কটমট ॥
আইয় বলে হের দেখ নারদের নাট।
উঠানে দাণ্ডাল্য বর যেন ইন্দ্রকাঠ ॥

জামাতা বরণের কালে শিব দিগম্বর হয়ে পড়লে কবি তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা করেছেন কৌতুকের সঙ্গে।

হর হইলা দিগম্বর মুনি বলে ধর ধর
মেনকা পালায় পাছে রড়ে।
আইলা তথা ভীমনাথ বহে ঘুরুলিয়া বাত
বসন উড়িয়া কোলে ঝড়ে ॥
লাজ পাইয়া যত নারী প্রবেশিল অন্তঃপুরী
নাকে হাতে দাঁতে জিভ চাপে।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ বা গিরিরে নিন্দে
মেনকা মরিতে চাহে তাপে ॥

এয়োরাও বরের নিন্দা করেছে :

আই আই আই আই কি লাজ কি লাজ গো
গৌরীর বর নাকি এইটা।
বরের ঘর নাঞি দ্বার নাঞি আঁত নাঞি দাঁত নাই
আর নাঞি তার নাঞি দায় ॥

এই সকল বর্ণনায় কবি শিবায়ন কাব্যের প্রচলিত রীতিই অনুসরণ করেছেন। তথাপি বর্ণনাগুলি উপভোগ্য হয়েছে। রামকৃষ্ণ শিব সম্পর্কিত আদি রসাত্মক কাহিনীগুলিকে প্রাধান্য দেন নি। কবি প্রকৃতপক্ষে শিব পুরাণ রচনা করেছেন। তবে জনচিত্তের উপযোগী লৌকিক কাহিনীকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। লৌকিক কাহিনীতেও কবির সংযম প্রকাশ পেয়েছে। পুরাণের কাহিনী বর্ণনায় যেন গাঢ়বন্ধ সংযত রুচির পরিচয় আছে, তেমনি লৌকিক

কাহিনীতেও ঈষৎ চপল লঘু সুর সৃষ্টিতেও কবির কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই লঘু সুরটি কাব্যে অধিক স্থান পায় নি। সংযত গম্ভীর ভাবপ্রকাশের দ্বারা কবির বিদগ্ধ মনের পরিচয় লাভ করা যায়।

রামকৃষ্ণের ভাষা গ্রাম্যতা মুক্ত—মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের ভাষা। তাঁর কাব্যে ছন্দ সম্পদ ও ছন্দ পারিপাট্য প্রশংসার যোগ্য। তাঁর কাব্যভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পড়েছে, বিষয়ানুসারে ব্রজবুলি পদও কবি কিছু কিছু কাব্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। আবেগতরল বা কৌতুকোচ্ছল ভাব এবং ভাষা এই কাব্যে স্বল্প হলেও যেটুকু আছে তাতে কবির দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে। কাব্যমধ্যে স্থানে স্থানে দুএক ছত্র গদ্যও কবি সংযুক্ত করে দিয়েছেন। এই গদ্য আধুনিক সাধু গদ্যের অনুরূপ। সপ্তদশ শতাব্দীতেই বাঙ্গালা গদ্যের মজবুত কাঠামোটি যে তৈরী হয়ে গিয়েছিল রামকৃষ্ণের কাব্যের গদ্য ব্যবহারই তার প্রমাণ। কবিত্ব শক্তি, পাণ্ডিত্য এবং উচ্চতর ভাব ও রুচির দিক থেকে রামকৃষ্ণ সপ্তদশ শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য কবি।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য ঃ রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্য সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। রামেশ্বর কাব্যমধ্যে বিস্তৃতভাবে বংশ পরিচয় দিয়েছেন।

ভট্ট নারায়ণ মুনি সন্তান কেশর কনী
যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত কৃতকীর্তি গোবর্ধন চক্রবর্তী
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর শম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুই নারী
অযোধ্যা নগর নিকেতন।

পূর্ববাস যদুপুরে হেমৎ সিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীতি।
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত ॥

মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের অন্তর্গত বরদা পরগণার অন্তর্ভুক্ত যদুপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়। কবির পিতার নাম লক্ষ্মণ, পিতামহ চক্রবর্তী, মাতা রূপবতী, ভ্রাতা শম্ভুরাম। কবির দুই পত্নী—সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা রামসিংহ। তিনি যদুপুরে বসেই সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেছিলেন। জমিদার বা সামন্ত রাজা হেমৎ সিংহের অত্যাচারে কবি স্বগ্রাম ত্যাগ করে কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। রামসিংহ কাঁসাই নদীর তীরে অযোধ্যা নগরে কবির বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং কবিকে তাঁর সভায় পুরাণ পাঠক নিযুক্ত করেন। এই রামসিংহের নির্দেশেই কবি শিবায়ন কাব্য রচনা শুরু করেন। কিন্তু কাব্যটি শেষ হয় রামসিংহের পরলোক গমনের পরে রাজা যশোবন্ত সিংহের আমলে।

কবি পরিচয়

অজিত সিংহের তাত যশোবন্ত নরনাথ
রাজা রামসিংহের নন্দন।
সিদ্ধ বিদ্যা রাজ-ঋষি তাহার সভায় বসি
রচে রাম গণেশ বন্দন ॥

কবি যশোবন্ত সিংহের শৌর্য, বীর্য ও বিদ্যোৎসাহিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ১৭১১—১২ খৃষ্টাব্দে রামসিংহের মৃত্যুর পর যশোবন্ত সিংহ রাজা হলে রামেশ্বর সভাকবি হয়েছিলেন। সুতরাং এই সময়ের পরে রামেশ্বর শিবায়ন কাব্য সম্পূর্ণ করেছিলেন। যশোবন্ত সিংহের জন্য রামেশ্বর মহাভারতের রাজধর্মের পুঁথি লিখেছিলেন। পুঁথি লেখা শেষ হয়েছিল ২১শে আষাঢ় ১১৫১ সালে। রামেশ্বর শিবায়ন কাব্যে হেঁয়ালিতে রচনাকালের নির্দেশ দিয়েছেন।

রচনা কাল

শর্কে হৈল চন্দ্রকলা বাম করতলে
বাম হৈল বিধি কান্ত পড়িল অনলে।
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হৈল সারা ॥

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে ১৬৩২ শকাব্দে বা ১৭১০-১১ খৃষ্টাব্দে রামেশ্বরের শিবসংকীর্তন রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। কবির পোষ্টা যশোবন্ত সিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত ঢাকার ডেপুটি গভর্নর সরফরাজ খানের প্রতিনিধি সৈয়দ আলির দেওয়ান হয়ে ঢাকায় যান এবং ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে সরফরাজের জামাতা মুরাদ আলির সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। দেওয়ানি গ্রহণের পূর্বেও যশোবন্ত মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তির সঙ্গে চাকরি করতেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে যশোবন্ত মুর্শিদকুলির নিকট চাকরী গ্রহণের পূর্বে রামেশ্বর শিবায়ন কাব্য সমাপ্ত করেছিলেন। সুতরাং ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৫।২০ বৎসর পূর্বে কাব্যটি রচিত হওয়া সম্ভব। যোগেশচন্দ্রের মতের সঙ্গে এই মত প্রায় মিলে যায়। শিবায়নের সম্পাদক (ক. বি.) যোগিলাল হালদারের মতে যশোবন্ত কর্মত্যাগ করে ঘরে ফেরার পরে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ শিবায়ন রচিত হয়েছিল। রামেশ্বরের শিবায়ন যে ভারতচন্দ্রের পূর্বে রচিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার পূর্বেই রামেশ্বরের শিবায়ন রচিত হয়েছিল।

কাব্য বিচার ঃ

রামেশ্বর সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ফার্সী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ফার্সী ভাষার জ্ঞানের পরিচয় আছে সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে। কিন্তু কবি শিবায়ন কাব্যে ফার্সীজ্ঞানের চিহ্নও রাখেন নি। সংস্কৃত জ্ঞানের

পরিচয় আছে শিবায়ন কাব্যে। শিবসংকীর্তন সাতটি পালায় বিভক্ত। প্রথম তিনটি পালায় কবি শিবের পৌরাণিক কাহিনীগুলি বিবৃত করেছেন। বিভিন্ন পুরাণ এবং কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য থেকে কবি উপাদান সংগ্রহ করেছেন। পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনায় কবির পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু প্রতিভার মৌলিকতা প্রকাশ পায় নি। গতানুগতিক কাহিনী বর্ণনায় রামেশ্বর কোন কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারেন নি। ভারতচন্দ্র পৌরাণিক এবং গতানুগতিক কাহিনী অবলম্বন করেও কাহিনী গ্রন্থনে এবং শিল্প চাতুর্যে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, রামেশ্বর তা পারেন নি। মনে হয় রামেশ্বর স্থানে স্থানে পুরাণাদি অনুবাদ করে দিয়েছেন। এই অংশের ভাষাতেও তেমন সাবলীলতা নেই। কিন্তু রামেশ্বরের প্রতিভার মৌলিকতা প্রকাশিত হয়েছে শিবায়নের লৌকিক কাহিনী বর্ণনায়। হর-পার্বতীর গৃহস্থালী, দারিদ্র্য কলহ, শিবের কৃষিকার্য, মাছধরা, বাগ্দিনী আসক্তি, পার্বতীকে শাঁখা পরানো প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনায় কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই কাহিনীগুলি কবির উদ্ভাবিত না হলেও কাহিনী বিন্যাসে এবং চরিত্র বর্ণনায় কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব রসানুভূতির পরিচয় আছে। কবি হরপার্বতীর দারিদ্র্য ও সংসারযাত্রা বর্ণনায় একটি দুঃস্থ ক্ষুধাকাতর বাঙ্গালী পরিবারের চিত্র এঁকেছেন। শিবের কৃষিকার্যের খুঁটিনাটি বর্ণনায় কবির বাস্তব অভিজ্ঞতাই রূপায়িত হয়েছে। এই বাস্তবধর্মী বর্ণনাগুলিতে গ্রাম্যতা দোষও মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে পড়েছে। দেবচরিত্রগুলি দেবত্ব হারিয়ে বাঙ্গালা দেশের সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছে। ভিক্ষালব্ধ অন্ন পরিবেষণের দ্বারা স্বামীপুত্রের তৃপ্তিবিধানের চিত্র বর্ণনায় ঈষৎ কৌতুক রস সৃষ্টি হলেও বর্ণনাটি একটি ক্ষুধাতুর দরিদ্র পরিবারের ভোজন লোলুপতার বাস্তব চিত্র!

বাস্তবতা

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটী সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥

তিন জনে একুনে বদন হইল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥
তিনজনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
সুক্ত খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে॥
কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য হয়ে খা॥

বাঙ্গালী মেয়ে স্বামীপুত্রকে পেট ভরে খাইয়ে তৃপ্ত করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে যে প্রাণপণ প্রয়াস করে—স্বামীপুত্রের তৃপ্তিতে নিজেকে পরম সুখী বোধ করে, সেই চিত্রটিই এখানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

গৌরীর বিবাহ খেলায় 'বরকন্যা বিদায়' অংশে কন্যার জননী জামাতাকে আশীর্বাদ করে জামাতার কাছে যে অনুনয় করেছে, তাতে বাঙ্গালী-কন্যার জননীর চিরকালীন আর্তিটি প্রকাশ পেয়েছে।

কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কৈর তুমি॥
আঠু ঢাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভর্যা ভাত।
প্রীতি কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ॥

ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর কামনার মতই বাঙ্গালী জননীর এই আন্তর কামনাটি চিরকালের। হাঁটু ঢাকা বস্ত্র আর পেট ভরে ভাত এইটুকু হলেই বাঙ্গালী জননী খুশী। এই বর্ণনায় যে জীবনের রস সঞ্চারিত হয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কন্যাকে বিদায় দেওয়ার এই অশ্রুসজল বিবরণটিও বাঙ্গালীর সংসারের নিত্যকালের ঘটনা। দরিদ্র ভিক্ষুক শিবের সংসারে পোষ্য সংখ্যাও

নিতান্ত কম নয়। ভিক্ষান্নে উদর পূর্তি হয় না। তাই পার্বতী স্বামীকে পরামর্শ দিলেন চাষ করতে।

চাষ চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে দাস দাসী আদি ছাড় পরিজন॥

এই পরামর্শও অত্যন্ত বাস্তবোচিত। অন্নের সংস্থান না হলে দাসদাসী রেখে বিলাস করা চলে না। শিব যখন পার্বতীকে বীজধান ধার করে আনতে বললেন, তখন পার্বতী জানালেন যে এমন কর্ম কুলবধূর পক্ষে সম্ভব নয়।

চাষে বাসে কাজ নাই মাগ্যা খাব ভিখ।
মায়্যার করজ করা মরণ অধিক॥
মদ্দ যায় গোঠে মাঠে মায়্যা থাকে ঘরে।
ভাঁড়াবার দায় নাই নিত্য দায় ধারে॥
মদ্দের করজ হৈলে মায়্যা দেয় টাল্যা।
কোনে থাকে কুলবধূ কথা কয় ছাল্যা॥

বাঙ্গালার গ্রাম্য সমাজের একটি নিখুঁত বাস্তব চিত্র পার্বতীর উক্তিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। চাষের খুঁটিনাটি বিবরণ, বিবাহের বিচিত্র মেয়েলী অনুষ্ঠান, কুলীন কন্যার বিবাহের সমস্যা প্রভৃতি বর্ণনাগুলি কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

কৃষিকার্যে স্বচ্ছলতার মুখ দেখে শিব যখন মর্ত ছেড়ে কৈলাসে ফিরে যাওয়ার কথা ভুলেই গেলেন, তখন পার্বতী শিবকে উত্যক্ত করতে মশা, ডাঁশ, জোঁক প্রভৃতি পাঠালেন। মশা মাছি ডাঁশ জোঁকের রক্তশোষণ বাঙ্গালার পল্লীতে ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে? ডাঁশ মাছির উপদ্রব এবং শিবের বিতাড়ন পর্বটি কবি কৌতুকের সঙ্গেই বর্ণনা করেছেন।

কৌতুক রস

ঠুস ঠাস ঠুই ঠাই ঠাকুরের করে।
দশ পাঁচ উড়্যা যায় দুই চারি মরে॥
কট কট কট্যা কোটি কোটি দেই ডঙ্ক।

মাঠে পাস্যা মাছি ডাঁশ মাতাইল রঙ্গ ॥
ভীমসনে ভ্রূকুটি করিয়া ভূতনাথ।
চট্ চাট্ শুনি কর্ণ চাপড় নির্ঘাত ॥

শিবের ভাগনে ভীম, হেলে বলদ আর মোষের দুর্গতিও কবি হাস্যকৌতুকের সঙ্গেই বর্ণনা করেছেন।

বাড় বাড় করে ভীম বাপ্ বাপ্ বল্যা।
কামড়ে কাতর হৈয়া কান্দে দুটি হেল্যা ॥
ঝর্ঝর শোণিত ধারা সকল শরীরে।
দড়ি ছিড়্যা মহিষ প্রবেশ কৈল নীরে ॥
আঠু পাড়্যা বুড়্যা আঁড়্যা বস্যা গেল পাঁকে।
ঠাঞি জান্যা ঠেঁটা কাক ঠোকরাল্য টাকে ॥
আস্যা ঢলঢল্যা মাছি বসিলেন তায়।
মাছ্যাতা পাড়িবামাত্র কৃমি হৈল তায় ॥

মশার কীর্তন ও শিবের মশক নিবারণের বর্ণনাটিও কৌতুকপ্রদ।

মশার কীর্তন শিবের নর্তন
দাস মহিষের ভঙ্গ।
লোমকূপ সকলে শোণিত নিকলে
জর্জর করিল অঙ্গ ॥
চাপড়ে চট্ চাট্ হেল্যার হটপাট
সট্ সট্ নড়িছে বর্চ।
এরূপ মর্দন মশার কর্দম
হাতেক হৈল উচ্চ ॥
মশার পন্ পন্ শুনিয়ে ঘন ঘন
চক্ষের ঘুচিল ঘুম।

উষ ঘাস করি জড় শঙ্কর জ্বালে খড়
দড় বড় লাগাল্য ধূম ॥

ভীমের সঙ্গে বাগ্দিনীর ছদ্মবেশ ধারিণীর কলহ, বাগ্দিনীর আত্মপরিচয়, শিবের বাগ্দিনী আসক্তি প্রভৃতিতে প্রচুর হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। বাগ্দিনী শিবের কাছে আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে বলছেন,

বঙ্গদেশে বাস শিখরপুরে ঘর।
স্বামী বুড়া দোলুই দরিদ্র দিগম্বর ॥
বাপের নাম হেম দলুই সেব্য যার সৌরি।
মায়ের নাম মেনকা আমার নাম গৌরী ॥

বঙ্গদেশে বাস শুধু বাগ্দিনী গৌরীর নয়, শিব—মেনকা—ভীম—নারদ সকলেরই। এই আত্মপরিচয়েরই আরও মার্জিত শিল্পসৌন্দর্যময় রূপ আছে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে 'অন্নদার আত্মপরিচয়ে'।

বাগ্দিনী গৌরী ও কামাতুর শিবের কথোপকথনটিও মনোজ্ঞ।

হাস্যা হাস্যা ঘেস্যা ঘেস্যা ছুতে যায় অঙ্গ।
বাগ্দিনী বলে আই মা এ আর কি রঙ্গ ॥
বুড়া বুড়া মনুষ্যা হয়্যা কেমন করা সয়্যা।
মন মজিল পায়া মাঠে পায়্যা পরের মায়্যা ॥
দেব দেব বলে মোরে দয়া কর সই।
বাগ্দিনী বলে আমি তেমন মায়্যা নই ॥
আপনাকে আঁট নাই পরের মাগ চাও।
এত যদি আস্থা আছে ঘর কেন না যাও ॥

বাগ্দিনীর মোহে শিবের জলসেচন ও মাছ ধরার কাহিনীও কৌতুকাবহ। এই বর্ণনাগুলি সবই জীবন্ত এবং বাস্তব। এই সকল বর্ণনায় কবির সহজ কবিত্ব উৎসারিত হয়েছে। সংস্কৃত শব্দ যথাসাধ্য বিসর্জন দিয়ে কবি গ্রাম্য শব্দগুলি অনায়াসে প্রয়োগ করেছেন।

জীবন চিত্র

পার্বতীর শাঁখা পরার কাহিনীতে দরিদ্র বাঙ্গালী রমণীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ বাসনা পূরণের এক সকরুণ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। স্বামীর অবস্থা পার্বতীর না জানা নেই, তা সত্ত্বেও দুটি শাঁখা পরার বড় সাধ। কারণ শাঁখা এয়োতির চিহ্ন—মাঙ্গলিক চিহ্ন। গৌরী বলছেন,

লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া কড়া কথা নাহি কই ॥

শিব দরিদ্র ভিক্ষুক বটেন, কিন্তু নিজের অক্ষমতা ঢাকতে গৌরীকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করতেও তিনি পিছপা নন।

ভিখারীর ভার্যা হয়ে ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ ॥
বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ॥

এই সব বর্ণনায় কোন উচ্চতর আদর্শ সৃষ্টি হয়নি। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জীবনই চিত্রিত হয়েছে। পৌরাণিক হরপার্বতীর মহিমা মোটেই প্রকটিত হয়নি। নারদ, ভীম, মেনকা প্রভৃতি চরিত্রগুলিও মানবিকতার ঊর্ধ্বে ওঠে নি। যে ভাষায় পার্বতী বাগ্দিনী বেশে শিবের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন সে ভাষা কোন দেব-চরিত্রের মুখে শোভা পায় না। শিবায়নের হরপার্বতী চরিত্র সম্পর্কে নন্দ-গোপাল সেনগুপ্ত বলেছেন, "এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাশ জীবন নয়, এ অতীত বাঙ্গালার কোন এক শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতী ঠাকুরাণীর জীবন কাহিনী।"

রস

রামেশ্বরের কাব্যে কৌতুক রসের অভাব নেই। সূক্ষ্ম মার্জিত কৌতুক রস ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। শিবের সংসার, শিবকে মর্তলোক থেকে কৈলাসে আনার জন্য গৌরীর বিচিত্র প্রয়াস, বাগ্দিনী প্রসংগ, ক্রুদ্ধা পার্বতীর পিত্রালয় গমন কালে বৃদ্ধ স্বামীর তরুণী ভার্যাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা,— পার্বতীকে শিবের শাঁখা পরানো ইত্যাদি

ঘটনায় প্রচুর হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। ছদ্মবেশী শাঁখারী জামাতার সঙ্গে শাশুড়ী মেনকার আচরণটি কৌতুক রসে উতরোল হয়ে উঠেছে।

ঠেলা মার‍্যা ঠেলা মার‍্যা ঠাকুরের গায়।
সুন্দর শঙ্খের মূল্য শাশুড়ী শুধায়॥
পশুপতি পাছু হৈলে পড়ে গিয়া কোলে।
ব্যস্ত হৈল বিশ্বনাথ শাশুড়ীর গোলে॥

পার্বতীকে বিনামূল্যে শাঁখা পরাতে গিয়ে শিব যেভাবে বিপাকে পড়েছিলেন, তাতেও কৌতুকরস উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। পার্বতীকে শিব বলছেন,

লক্ষ্মীর দুর্লভ শঙ্খ বিনামূল্যে দিব।
যতনে করিব সেবা যতকাল জীব॥
নগেন্দ্রনগরে বর নাড়ি-খুজি কর‍্যা।
দেখিব দুর্গার মুখ দুটি আঁখি ভর‍্যা॥
হরের বচন শুন্যা হাসে যত মায়্যা।
মার মার করিয়া মেনকা আল্য ধায়্যা॥
পশুপতি লুকাইল পার্বতীর পিছু।
বিমলা বলেন মা বল্য নাই কিছু॥
কালা ভোলা বুড়া লোক পরিহাস্য করে।
সয়া সম্বন্ধের তরে সই অধিকারে॥
এ বয়সে রঙ্গ্যা বুড়া এত জানে রঙ্গ।
যুবাকালে না জানি কেমন ছিলে ঢঙ্গ॥

এইরূপ কৌতুকোচ্ছলতায় রামেশ্বরের শিবায়নের লৌকিক অংশটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। করুণ রস সৃষ্টির প্রচুর সুযোগ থাকলেও কবি সুযোগের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেননি।

মণ্ডনকলা

অনুপ্রাস ব্যবহারে রামেশ্বর নিপুণ। বিশেষতঃ পয়ারের দ্বিতীয় চরণে তিনি অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন। অনুপ্রাস বাহুল্য অনেক স্থলে রামেশ্বরের কাব্যের গুণ না হয়ে দোষে পরিণত হয়েছে। রামেশ্বরের কাব্যে অনুপ্রাসের উদাহরণ :—

পরিহাস পরিত্যজ পরস্ত্রীর প্রতি ॥
পরবধূগমনে গহীর অপরাধ।
বুড়াকালে বাড়্যায়েছ বিলক্ষণ সাধ ॥
পাপবুদ্ধে পরস্ত্রীকে পরিহাস করে।
দারুণ দমন তার শমনের ঘরে ॥
নানা অস্ত্রযুত হয়্যা ঘিচিল কামান।
চড়িয়া চলিল যেন বিভ্রের সমান ॥
হরিহরে হানাহানি শূল সুদর্শন।

রামেশ্বরের শিবায়নে অনুপ্রাসাধিক্য চিত্ত চমৎকারী হয়ে ওঠেনি। তথাপি স্থানে স্থানে আলংকারিক মণ্ডনকলা কাব্যের শ্রীবৃদ্ধিই করেছে।

রামেশ্বরের বাক্যরীতি স্থানে স্থানে প্রশংসার যোগ্য হয়ে উঠেছে। যেমন—

দিনে হও ব্রহ্মচারী রাতে গলাকাটা।
পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল ॥
জলহীন মীন যেন শিবহীন শিবা।
মরণ অধিক দুঃখ মাগ্যের বাখান ॥

এই বাক্যগুলি প্রবচনরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য।

বাস্তবতা, সরসতা, লৌকিক কাহিনী ও চরিত্র বর্ণনায় নিপুণতা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুকৌশল প্রয়োগ—রামেশ্বরকে অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন প্রধান কবিতে পরিণত করেছে।

রামেশ্বর ও রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ ও রামেশ্বর একই বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করলেও দুই কবির দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য আছে। দুজনেই পণ্ডিত ছিলেন। দুই কবির কাব্যেই পাণ্ডিত্যের প্রকাশ আছে। দুই কবিই সংস্কৃত পুরাণ এবং কুমারসম্ভব থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তৎসত্ত্বেও রামকৃষ্ণের কাব্যে শুধু পৌরাণিক উপাখ্যানই প্রাধান্যলাভ করেনি কবি পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিবসংহিতা নির্মাণ করেছেন। হরগৌরীর লৌকিক উপাখ্যান স্বল্প পরিসরে বর্ণিত হয়েছে এবং গৌণ বিষয় হয়ে উঠেছে। রামেশ্বরের কাব্যে পুরাণকাহিনী অপেক্ষা লৌকিক কাহিনীই প্রধান হয়ে উঠেছে। পুরাণকাহিনী বর্ণনায় রামেশ্বর স্বচ্ছন্দতার পরিচয় দিতে পারেন নি। কিন্তু কবির সহজ কবিত্ব গুণ এই লৌকিক কাহিনীগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে এবং কৌতুকের সংমিশ্রণে কাহিনী ও চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রামেশ্বরের কাব্যে হরপার্বতীর লৌকিক কাহিনী লঘু চপলতার সঙ্গে পরিবেষিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ তাঁর কাব্যে পৌরাণিক শিবের মহিমা রক্ষায় অধিকতর যত্নবান হওয়ায় তাঁর কাব্যে আদিরসের বাড়াবাড়ি বা গ্রাম্যতা দোষ বড় একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু নিঃস্ব ভিখারী পরস্ত্রীলোলুপ লৌকিক শিবের প্রতি অধিকতর আকর্ষণবশতঃ রামেশ্বর শিবচরিত্রের গৌরব রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর শিব, পার্বতী, মেনকা প্রভৃতি চরিত্রগুলি যেমন সাধারণ নিম্নবিত্ত বাঙ্গালীর চিত্র,--তেমনি এই চিত্র বর্ণনায় আদিরস এবং গ্রাম্যতা অস্বীকৃত হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগলক্ষণগুলি রামেশ্বরের কাব্যে প্রকটিত হয়েছে। শিব সম্পর্কে প্রচলিত লৌকিক কাহিনীগুলিকে লঘু সুরে বর্ণনা করায় রামেশ্বরের শিবায়ন অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু তরল আবেগ বর্জিত, ঘনসন্নিবদ্ধ পৌরাণিক কাহিনীতে ঠাসা রামকৃষ্ণের কাব্য তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। রামকৃষ্ণের পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর শিবায়ন রামেশ্বরের শিবায়নের মত সর্বজনের উপভোগ্য হয়নি। রামকৃষ্ণের শিবায়ন বিদগ্ধ রুচি পণ্ডিতজনের উপযোগী, আর

রামেশ্বরের শিবায়ন অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত সাধারণ গ্রাম্য মানুষের উপযোগী হয়েছে। রামেশ্বরের কাব্যের বহুল প্রচার এবং জনপ্রিয়তার ফলেই সম্ভবত: রামকৃষ্ণের শিবায়ন তেমন প্রসার লাভ করে নি।

মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও রামেশ্বর:

মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও রামেশ্বর—তিনজনই প্রতিভাবান কবি। কাব্যের বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনজনেই সমধর্মী। তথাপি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা দেখা যায়, রামেশ্বরের কাব্যে অনুরূপ প্রতিভার পরিচয় নেই। রামেশ্বরের প্রতিভা দ্বিতীয় শ্রেণীর। মুকুন্দরামের ও রামেশ্বরের জীবনকাহিনী একই প্রকারের। উভয়েই অত্যাচারী শাসকের অত্যাচারে পৈত্রিক বাসভূমি ছেড়ে রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনীও অনুরূপ; তবে আরও বৈচিত্র্যময়। নিজের জীবনের দুঃখময় বাস্তব অভিজ্ঞতা মুকুন্দরামের কাব্যে যে সহানুভূতি এবং সকৌতুক বাস্তব রস সঞ্চার করেছে, রামেশ্বরের কাব্যে তা পাওয়া যায় না। নিজের জীবনের রসে রামেশ্বরের কাব্য সিঞ্চিত হয় নি। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখকষ্টের কোন ছায়াপাত হয় নি। স্নিগ্ধ কৌতুক রসের সঙ্গে মুকুন্দরাম জীবনের বহু বিচিত্র অসঙ্গতিগুলিকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। কৌতুকোচ্ছলতা রামেশ্বরের কাব্যেও আছে। কিন্তু জীবনের বিচিত্র অসঙ্গতিকে সর্বস্তরে সহানুভূতি-মিশ্রিত কৌতুকের আলোকে উদ্ভাসিত করা রামেশ্বরের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ভারতচন্দ্রের কাব্যে রঙ্গব্যঙ্গ আছে প্রচুর—সূক্ষ্ম কৌতুকরসও আছে, কিন্তু আত্মজীবনের অভিজ্ঞতাজাত সহানুভূতির স্পর্শে মুকুন্দরামের কাব্যে চরিত্রচিত্রণে যে নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় লক্ষিত হয়—রামেশ্বরের কাব্যে তাও নেই। মুকুন্দরাম জীবনের গভীর তলদেশ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং মানব মনের সূক্ষ্ম

ভাবরাজিকেও অনায়াস দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। মুকুন্দরামের কাব্যে তাই অধিকাংশ চরিত্রই প্রাণের রসে ঝলমল করেছে। চরিত্র চিত্রণে অনুরূপ দক্ষতায় পরিচয় ভারতচন্দ্রের কাব্যেও নেই। ভারতচন্দ্র বর্ণিত অধিকাংশ চরিত্রই প্রাণহীন। রামেশ্বরের কাব্যে জীবনের লঘু সুরটি প্রধান হওয়ার ফলে মাঝে মাঝে গ্রাম্যতা দেখা দিয়াছে। মুকুন্দরামের কাব্যে কৌতুকের স্নিগ্ধতা সর্বব্যাপী, কিন্তু গ্রাম্যতাদোষ নেই। জীবনের সামগ্রিক রূপবর্ণনায় তিনি মহত্তর শিল্পীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মুকুন্দরামের কাব্যেও দেব-চরিত্রে মানবত্ব আরোপিত হয়েছে। তথাপি কবি দেবচরিত্রের দুর্গতি বর্ণনা করেন নি। রামেশ্বর দেবতাদের শুধু মাটির মানুষ করেন নি, দেবতাদের নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গও করেছেন। এই দিক থেকে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে রামেশ্বরের মিল আছে। ভারতচন্দ্র দেবতাদের নিয়ে রঙ্গরস ত করেছেনই, দেবচরিত্রের দুর্গতিও বর্ণনা করেছেন। তথাপি একদিক থেকে ভারতচন্দ্র প্রশংসনীয় সংযম রক্ষা করেছেন। তিনি দেবচরিত্রের হীনতা বর্ণনা করেন নি, গ্রাম্যতাকে প্রশ্রয় দেন নি,—শিবের কোচনী সম্পর্কের ইঙ্গিত মাত্র দিয়েছেন; কোথাও কোন আদিরসাত্মক বর্ণনা দেন নি। অবশ্য বিদ্যাসুন্দরের লৌকিক কাহিনীতে তিনি আদিরসের চূড়ান্ত করেছেন। রামেশ্বরের কাব্যে যে বৈষ্ণবতা দেখা যায় ভারতচন্দ্র বা মুকুন্দরামের কাব্যে তার অভাব আছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেবভক্তির বাষ্পটুকুও খুঁজে পাওয়া যায় না। মুকুন্দরামের কাব্যে দেবভক্তির প্রকাশ আছে। রামেশ্বরের কাব্যেও তা দুর্লভ নয়। রামেশ্বর তাঁর কাব্যকে মণ্ডণকলায় ভূষিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন,—তাঁর কতকগুলি প্রয়োগ প্রবচনের মত ব্যবহারযোগ্য। তথাপি ভারতচন্দ্রের মণ্ডনকলার সঙ্গে রামেশ্বরের কাব্যের তুলনাই হয় না। ভারতচন্দ্রের আলংকারিক ভাষা ও বিশিষ্ট প্রয়োগ পদ্ধতি একটা উচ্চতর শিল্পের রূপ নিয়েছে। ভারতচন্দ্রের প্রয়োগগুলি প্রবচনরূপে আজও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম ও রামেশ্বর উভয় কবির কাছ থেকেই কিছু কিছু ঋণ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু

স্বীয় প্রতিভার বলে তিনি যে কাব্যরীতির প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা উচ্চতর শিল্পকলা হিসাবে চিরকালই সমাদৃত হবার যোগ্য। সুগভীর অন্তদৃষ্টি অথবা অসাধারণ বাক্‌নৈপুণ্যের অভাবহেতু রামেশ্বর মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের সমকক্ষতা লাভের যোগ্য হতে পারেন নি।

দ্বিজ কালিদাস ঃ

দ্বিজ কালিদাস 'কালিকা বিলাস' কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যখানির নাম 'কালিকা বিলাস' হলেও কাব্যটি শিবায়ন কাব্যের সমগোত্রীয়। দেবী কালিকার সঙ্গে এই কাব্যের কোন সম্পর্ক নেই। কবির সময় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তাঁর কাব্যে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের প্রভাব পড়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি বর্তমান ছিলেন বলেই মনে হয়। কালিকা বিলাসের ভাষা আধুনিক পর্যায়ের।

কালিদাস পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুরাণের উপাদান প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী এবং কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য থেকেই তিনি অধিক ঋণ গ্রহণ করেছেন। মাঝে মাঝে তিনি কালিকাপুরাণ, চণ্ডী ও কুমারসম্ভবের অনুবাদ করে দিয়েছেন। অন্যান্য পুরাণ থেকেও অংশ বিশেষের অনুবাদ তিনি কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। দেবী কর্তৃক শুম্ভ দৈত্য বধের পর কুমারসম্ভবের কাহিনী শুরু করেছেন। শিবের কোচনী সম্পর্ক বর্ণনায় তিনি কুরুচি ও গ্রাম্যতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কোচনী নারীদের সঙ্গে শিবের মদনলীলার জুগুপ্সিত বর্ণনায় কবি অনেকটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। তবে দ্বিজ কালিদাস বর্ণিত আগমনী ও বিজয়ার গানগুলিতে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যজীবন সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হওয়ায় গানগুলি রসোত্তীর্ণ সার্থক কাব্যে পরিণত হয়েছে।

অপ্রধান কবি ঃ

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের অনুসরণে বহু অক্ষম কবি শিবমঙ্গল কাব্য

রচনা করেছেন। এই সকল কাব্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যমূল্য নেই। এগুলি গতানুগতিক কাহিনী বর্ণনা অথবা অক্ষম অনুকরণ মাত্র।

দ্বিজ মণিরাম রচিত বৈদ্যনাথ মঙ্গল অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির শিবমঙ্গল কাব্য। এই কাব্যে দেওঘরের বৈদ্যনাথ দেবের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। কবির পরিচয় কিছুই জানা যায় না। তবে ভাষা বিচারে কাব্যটিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত বলা যায়।

দ্বিজ রামচন্দ্র রচিত হরপার্বতীমঙ্গল ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রিত হয়। রামচন্দ্র কাব্যমধ্যে পৌরাণিক ও লৌকিক উভয় কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। ভারতচন্দ্রের ভাষা প্রয়োগ কৌশল অনুকরণ করলেও ভাষা ব্যবহারে কিছু নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিজ সৃষ্টিধর স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড অবলম্বনে মহেশমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে দ্বিজ রামচন্দ্র, পৃথ্বীচন্দ্র, প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ আচার্য প্রভৃতি শিবায়ন কাব্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে পৃথ্বীচন্দ্রের কাব্যটী উল্লেখযোগ্য। রাজা পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী পাকুড়ের জমিদার ছিলেন। ১৭২৮ শকে বা ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌরীমঙ্গল নামে এক বিরাট শিবায়ন কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বিচিত্র কাল্পনিক ও লৌকিক কাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। হরগৌরী ভক্ত রাজা জীমূতবাহন কর্তৃক মন্ত্রসেন নামে এক দুরাচার রাজার নিধনের কাহিনী কাব্যমধ্যে বর্ণিত হয়েছে। কোচনীদের সঙ্গে শিবের যৌনসম্পর্কের বিবরণও আছে এই কাব্যে। কবি পৃথ্বীচন্দ্র, কৃত্তিবাস; মুকুন্দরাম, কবিচন্দ্র, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বহু কবির নাম ও কাব্যের তালিকা কাব্যমধ্যে দিয়েছেন।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'মৎস্যধরার পালা'র সাহিত্যমূল্য কিছু নেই। কাব্যটি রামেশ্বরের মৎস্যধরার কাহিনী অনুসরণে লিখিত।

কালিকামঙ্গল

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্য নয়। বিদ্যা ও সুন্দরের লৌকিক প্রণয় কাহিনীকে স্বামী ভক্তির মোড়কে আবৃত করে পরিবেষণ করলেও এই কাব্যে কালিকার মহিমাকীর্তন প্রধান হয়ে উঠে নি। কাশ্মীরী কবি বিল্‌হনের চৌর পঞ্চাশিকার প্রভাবেই বিদ্যাসুন্দরের রোমান্টিক প্রণয় কাহিনী গড়ে উঠেছিল। বাঙ্গালা দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত উষা অনিরুদ্ধের প্রণয় কাহিনীও বিদ্যাসুন্দরের প্রণয় কাহিনীর উপরে ছাপ ফেলেছে বলে মনে হয়।

কালিকামঙ্গলের কাহিনী ঃ

রাজকুমার সুন্দর ভদ্রকালীর আরাধনা করে বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের রূপগুণবতী কন্যা বিদ্যাকে পত্নীরূপে লাভ করবার বর লাভ করে। অতঃপর দেবীর বর পেয়ে সুন্দর বিদ্যার পিতৃগৃহে যাত্রা করে এবং রাজবাড়ীর মালিনী হীরার আশ্রয় পায়। হীরা সুন্দর ও বিদ্যার মিলনের দৌত্য করে। সে ফুলের মালার সঙ্গে পত্র প্রেরণ করে বিদ্যার কাছে। পত্র পড়ে বিদ্যা সুন্দরের প্রতি আসক্ত হয়। সে মালিনীর নিকট সুন্দরের রূপগুণের পরিচয় পায়। উভয়ের গোপন সাক্ষাতও হয়। অবশেষে দেবী কালিকার স্তব করে দেবীর বর লাভ করে সুন্দর মালিনীর গৃহ থেকে বিদ্যার প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত এক গোপন ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করে। এই সুড়ঙ্গপথে সুন্দর ও বিদ্যার চলে নিয়মিত গোপন মিলন। এই মিলনের পরিণামে বিদ্যার গর্ভসঞ্চার হলে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনী প্রথমে রাণীর ও পরে রাজার কর্ণগোচর হয়। কোটালের বুদ্ধি ও কৌশলে সুন্দর চোর ধরা পড়ে। রাজাদেশে বধ্যভূমিতে নীত হয়ে সুন্দর ভক্তিভরে দেবী কালিকার স্তব করতে শুরু করে। দেবী স্বয়ং ডাকিনী যোগিনীসহ মশানে আবির্ভূত হয়ে সুন্দরকে মুক্ত করলেন এবং সুন্দরের

হাতে বিদ্যাকে সমর্পণ করতে রাজাকে আদেশ করলেন। রাজা বীরসিংহ সুন্দরের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ে দিলেন। সুন্দর পত্নী ও পুত্রসহ স্বরাজ্যে প্রস্থান করে এবং দেবীর পূজা প্রচার করে যথাকালে বিদ্যাসহ স্বর্গে গমন করে।

কালিকামঙ্গলের কবি :

কবি কঙ্ক : স্বর্গীয় চন্দ্রকুমার দে কবি কঙ্কের কালিকামঙ্গলের পুঁথি আবিষ্কার করেন। অতঃপর কবি কঙ্কই কালিকামঙ্গলের আদি কবিরূপে গৃহীত হয়েছেন। গর্গের কন্যা লীলার সঙ্গে কবি কঙ্কের প্রণয়কাহিনী মৈমনসিংহ গীতিকায় সংকলিত হয়েছে। কঙ্ক রচিত কালিকামঙ্গলের পুঁথি চন্দ্রকুমার ব্যতীত আর কেউ দেখেন নি। কঙ্কের কাব্য কালিকার মহিমা-কীর্তনের উদ্দেশ্যে রচিত নয়,—সত্যনারায়ণের পাঁচালী নামে উল্লিখিত বিদ্যা-সুন্দর কাহিনী। কবি কঙ্ক চৈতন্যদেবের কৃপা প্রার্থনা করেছেন কাব্য মধ্যে।

> কবে বা হেরিব আমি গৌরার চরণ।
> সফল হইবে মোর মনুষ্য জীবন॥
> পাপী তাপী মুঞি প্রভু আমি অল্প মতি।
> হইব কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি॥

অনেকে মনে করেন, কবি কঙ্ক মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তি। কিন্তু কাব্যের ভাষা কোন মতেই ষোড়শ শতাব্দীর ভাষা নয়। এ ভাষা অত্যন্ত আধুনিক। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীর আগে সত্যনারায়ণের পাঁচালী লেখা হয় নি। সুতরাং কবি কঙ্ক ষোড়শ শতাব্দীর লোক হওয়া সম্ভব নয়। ডঃ সেন আরও বলেছেন যে, শ্রীচৈতন্যের উল্লেখ কঙ্কের প্রাচীনত্ব নির্দেশ করে না। বিংশ শতাব্দীতেও কঙ্কের রীতিতে চৈতন্য বন্দনা দেখা যায়। সুতরাং ডঃ সেনের মতে কঙ্ককে বিদ্যাসুন্দরের আদি কবি বলা অনুচিত। চন্দ্রকুমার কঙ্কের রচনা থেকে যেটুকু উদ্ধৃত করেছেন, তাতে দেখা যায় যে কঙ্কের বর্ণনাভঙ্গী সাবলীল। পীর মাহাত্ম্য বর্ণনা মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় ডঃ অসিতকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কঙ্কের কাব্যকে কালিকামঙ্গল না বলে পীরমঙ্গল বলা যুক্তিযুক্ত।

শ্রীধর : মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ চট্টগ্রাম থেকে দ্বিজ শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক পুঁথির কয়েকটি খণ্ডিত পৃষ্ঠা আবিষ্কার করেন। এই কয়েকটি পৃষ্ঠায় কোন দেবদেবীর উল্লেখ নেই। শ্রীধরের কাব্যের খণ্ডিত পুঁথিতে গৌড়ের নবাব হোসেন সাহার পৌত্র ফিরোজ সাহার উল্লেখ আছে। নসরত শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফিরোজ সাহা ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য রাজা হয়েছিলেন। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই যদি কাব্যটি রচিত হয়ে থাকে, তা হলে শ্রীধরকে বিদ্যাসুন্দরের প্রথম কবির মর্যাদা দেওয়া যায়।

সারিবিদ খাঁ: মুন্সী আবদুল করিম চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সারিবিদ খাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যের খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কার করেন। সারিবিদ খাঁ একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান— তাঁর কৌলিক উপাধি ছিল 'জি-ঠাকুর'। হিন্দু শাস্ত্রাদিতে কবির জ্ঞান থেকে অনুমান হয় যে কবির পূর্বপুরুষ উচ্চ বর্ণের হিন্দু ছিলেন। পুঁথিতে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন :

পীয়ার মল্লিক সুত বিজ্ঞবর শাস্ত্রযুত
উজীয়াল মল্লিক প্রধান।
তার পুত্র জি-ঠাকুর তিন সিক সরকার
অনুজ মল্লিক মুসাখান॥
রসের রসিক অতি রূপে জিনি রতিপতি
দাতা অগ্রগণ্য অর্ক সুত।
ধৈর্যবন্ত যেন মরু জ্ঞানে ত বাসব গুরু
মানে কুরু ধর্মে ধর্মসুত॥
তার সুত গুণাধিক নাসুরাজা মল্লিক
জগত প্রচার যশখ্যাতি।

তান সুত অল্পজ্ঞান হীন সারিবিদ খান
পদবন্ধে রচিত ভারতী ॥

কবি 'তিন সিকে'র সরকার ছিলেন। 'সিক পরগণা' নোয়াখালি জেলায় অবস্থিত। আবদুল করিম সাহেবের অনুমান সারিবিদ নোয়াখালির অধিবাসী ছিলেন। পুঁথিতে রচনাকালের উল্লেখ নেই। ভাষা বিচারে কাব্যটিকে সপ্তদশ শতাব্দীর পরে স্থান দেওয়া চলে না। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে কাব্যটি যোড়শ শতাব্দীতে রচিত।

সারিবিদের কাব্যেও কালিকা মহিমা কীর্তিত হয় নি। এটি বিদ্যাসুন্দরের লৌকিক প্রণয় কাব্য। ডঃ ভট্টাচার্যের মতে সারিবিদ শ্রীধরের রীতি অনুসরণ করেছিলেন। সারিবিদের ভাষা সংস্কৃত বহুল। তিনি নিজেও সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে কাব্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। সংস্কৃত ভাষা ও পুরাণাদিতে কবির পাণ্ডিত্য ছিল। এই খণ্ডিত পুঁথিটিতেও সারিবিদের রচনা শক্তির নিদর্শন মেলে।

কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী ঃ বলরাম চক্রবর্তীর কাব্যের নাম কালিকা-মঙ্গল। বলরামের কাব্যের পুঁথির শেষাংশ খণ্ডিত। রচনাকাল জানা যায় না। কবি দিগ্‌বন্দনায় রাঢ়ের প্রধান প্রধান দেবদেবীর উল্লেখ করেছেন। এমনকি রাঢ় অঞ্চলে পূজিত 'ঘাঁটু' নামক লৌকিক দেবতারও উল্লেখ করেছেন তিনি। কবি কাশীজোড়ার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের (১৬৬৯-১৬৯২ খৃঃ) সভাসদ ছিলেন। কবি রাঢ় অঞ্চলের লোক ছিলেন বলেই মনে হয়। কাব্যারম্ভে বলরাম যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে কবির পিতামহের নাম চৈতন্য, পিতা দেবীদাস এবং মাতা কাঞ্চনী। বলরামের উপাধি ছিল কবিশেখর। তিনি কবিশেখর উপাধি ব্যবহার করেছেন।

বিদ্যাসুন্দরের লৌকিক প্রেমকাহিনী অপেক্ষা দেবী কালিকার মাহাত্ম্য প্রচারই কবির প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় কাব্যটি কালিকামঙ্গল নামেরই উপযুক্ত। কবি সংস্কৃত পুরাণতন্ত্র ইত্যাদিতে পণ্ডিত ছিলেন। কাব্য শেষে তিনি তান্ত্রিক

সাধনার প্রক্রিয়াও ব্যাখ্যা করেছেন। কাহিনীতে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য আছে সুন্দরের বালকপুত্রকে অসন্তুষ্টা দেবী কালিকার প্রেরিত রাক্ষস গ্রাস করলে সুন্দর কালীপূজা করে পুত্র ফিরে পায়। মৃত্যুর পরে সুন্দরকে যখন স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয় তখন দেবতারা বাধা দিতে আসেন; ফলে দেবতাদের সঙ্গে কালীর যুদ্ধ বাধে এবং দেবগণ কালীর কাছে পরাজিত হন। কালিকার মহিমা প্রচারে ব্যস্ত হওয়ায় বিদ্যা ও সুন্দরের লৌকিক কাহিনী অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। চরিত্রসৃষ্টিতে কবি তেমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। বলরামের কাব্যের ভাষা সরল,—পাণ্ডিত্যের গুরুভারে পীড়িত নয়। আদিরস বর্ণনাতেও তিনি প্রশংসনীয় সংযম দেখিয়েছেন। কবি ছিলেন শক্তি ভক্ত—কাব্যে ভক্তির পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে। তথাপি উচ্চতর শিল্প নৈপুণ্যের অভাবে কবিশেখরের কালিকামঙ্গল কাব্য হিসাবে উচ্চ মর্যাদা দাবী করতে পারে না।

গোবিন্দ দাসঃ কালিকামঙ্গলের অপর এক কবি গোবিন্দ দাস। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মতে গোবিন্দ দাস চট্টগ্রামের দেবগ্রামবাসী। তিনি জাতিতে কায়স্থ। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কবি কালিকামঙ্গল রচনা করেছিলেন। কাব্যটি বৃহৎ,—পাঁচটি অংশে বিভক্ত। গোবিন্দ দাস কালীমাহাত্ম্য প্রচারের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন। কাব্যে কবির পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। বৃত্রাসুর বধ, স্বর্গে দেবীমাহাত্ম্য প্রচার, ইন্দ্রের অহল্যাহরণজনিত শাপমুক্তি, মহিষাসুর ও শুম্ভনিশুম্ভ বধ, রাজা বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান এবং বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যকাহিনীতে স্থান ও ব্যক্তি নামে কিছু বিশিষ্টতা আছে। এই কাব্যে বীরসিংহের রাজধানীর নাম রত্নপুর, সুন্দরের বাড়ী গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত কাঞ্চননগর, সুন্দরের পিতা গুণিসার, মাতা কলাবতী,—মালিনীর নাম রম্ভা। কাব্য মধ্যে ভক্তিভাব আছে,—ধর্মতত্ত্বও আলোচিত হয়েছে,—আদিরসের বর্ণনা প্রায় নগণ্য। ভাষা সহজ সরল ও স্বচ্ছন্দগতি। কাব্য মধ্যে কতকগুলি গান আছে, ব্রজবুলিতে লেখা গানও আছে; রাগরাগিণীর উল্লেখও আছে। গোবিন্দ দাসের শিব বন্দনা:

নৌমি নন্দিকেশ ঈশ, কণ্ঠে কালকূট বিষ,
নীলকণ্ঠ নাম বামদেব দেব বন্দিনী।
অর্ধ অঙ্গ গৌরীসঙ্গ মৌলী কেলি চতুরঙ্গ
অঙ্গভঙ্গ অতিরঙ্গ সোহি জহ্নু নন্দিনী ॥
বঙ্গনাথ লোকপাল অর্ধ অঙ্গ বাঘ ছাল
ব্যোমকেশ শেষমাল ভালে ইন্দুমোহিনী ॥

প্রাণরাম চক্রবর্তীঃ প্রাণরাম চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গলের উল্লেখ করেছিলেন অবিনাশ মুখোপাধ্যায় ১২৭৯ সালের এডুকেশন গেজেটে। কাব্যটি ২৪৩ সালে মুদ্রিত হয়েছিল বলে উল্লিখিত হলেও কাব্যখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। প্রাণরাম কাব্য সমাপ্তির কাল সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ

বসুদ্বয় বাণ চন্দ্র শক নিরূপণ।
কালিকামঙ্গল গীত হৈল সমাপণ ॥

থেকে জানা যায় যে ১৫৫৮ শকাব্দ বা ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে কাব্যটি সমাপ্ত হয়েছিল। কেউ কেউ 'দ্বয়' শব্দকে পৃথক ভাবে গ্রহণ করে দুই অর্থ ধরে ১৫২৮ বা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ পেয়েছেন। কিন্তু এত পূর্বে প্রাণরামকে স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। কবির পিতার নাম মুকুন্দ,—তাঁর উপাধি ছিল কবিবল্লভ।

কৃষ্ণরাম দাসঃ কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কালিকামঙ্গল কাব্য। কৃষ্ণরামের নিবাস ছিল কলিকাতা—বেলঘরিয়ার নিকটবর্তী নিমতা গ্রামে। কবির পিতার নাম ভগবতী দাস,—তিনি জাতিতে কায়স্থ। কবি আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

কবি পরিচয়

অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
কলিকাতা পরগণা তায়।
ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্বকূল
নিমিতা গ্রামেতে গ্রাম যার।

* * * *

সেই গ্রাম মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়স্থ কুলেতে উতপতি।
তাঁহার তনয় হই নিজ পরিচয় কই
বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি ॥
শুন সভে একচিত যেমনে হইল গীত
কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি।
প্রথম বৈশাখ মাসে স্বপনে আপন বাসে
দেখিনু সারদা ভগবতী ॥

কবি কুড়ি বৎসর বয়সে দেবীর আদেশে কালিকামঙ্গল রচনা করেছিলেন। কালিকামঙ্গল সম্ভবতঃ কৃষ্ণরামের প্রথম রচনা। পরে তিনি ষষ্ঠীমঙ্গল ও রায়মঙ্গল ও মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেছিলেন। গ্রন্থ রচনার কাল সম্পর্কে কবি হেঁয়ালিতে লিখেছেন ঃ

সারসাসানের নেত্র ভীমাক্ষি বর্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর নাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ সকল বিচারিয়া সভে ॥

স্বর্গীয় অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই হেঁয়ালি থেকে ১৫৯৮ শকাব্দ বা ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দ পেয়েছেন। কৃষ্ণরামের কাব্যে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও শায়েস্তা খাঁর উল্লেখ আছে ঃ

অরং সাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রামরাজা সর্বজনে।
নবাব সারিস্তা খাঁ অধিকারী সাত গাঁ
বহু সরকার করতলে।

শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালা দেশের সুবেদার ছিলেন ১৬৬৪ থেকে ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দ এবং

১৬৭৯ থেকে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুতরাং কৃষ্ণরাম সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই কালিকামঙ্গল রচনা করেছিলেন, এ সিদ্ধান্ত যথার্থ।

কৃষ্ণরামের কাব্যটি দীর্ঘ। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণনায় কবি গতানুগতিক রীতিই অনুসরণ করেছেন। স্থান ও ব্যক্তি নামে কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়।

কাব্যবিচার

সুন্দরের দেশ কাঞ্চন, পিতার নাম গুণসিন্ধু, বিদ্যার গর্ভে সুন্দরের পুত্রের নাম পদ্মনাভ,—মালিনীর নাম বিমলা। কৃষ্ণরাম মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে অনুসরণ করলেও কাব্যে স্বকীয় বিশিষ্টতার ছাপ কিছু কিছু আছে। ঘটনাবর্ণনা গতানুগতিক—চরিত্র চিত্রণেও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। তবে মালিনী বিমলা চরিত্রটি অঙ্কনে কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বৈষ্ণব কাব্যে কবির ব্যুৎপত্তি ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব তাঁর কাব্যে পড়েছে। দু' একটি ব্রজবুলির পদ রচনায় কবি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। কৃষ্ণরামের রচনাশৈলী সহজ সরল,—মার্জিত রুচিসম্পন্ন,—গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা বর্জিত। ভারতচন্দ্রের পূর্বে কৃষ্ণরামই কালিকামঙ্গলকে একটি সুবিন্যস্ত রূপ দিয়ে ভাষা, ছন্দ, চরিত্র এবং রচনাশৈলীতে স্বকীয়তার ছাপ রাখতে পেরেছিলেন।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ঃ কালিকামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্য অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কালিকা মহিমা অপেক্ষা লৌকিক প্রণয়কাহিনীই প্রাধান্য পেয়েছে। চরিত্রসৃষ্টি ইত্যাদিতে তেমন কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও অসাধারণ শব্দশিল্পী ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দব কাব্যকে এক আশ্চর্য শিল্পসম্মত রূপ দিয়েছিলেন।

রামপ্রসাদ সেন ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চব্বিশ পরগণা জেলার হালিশহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে কুলীন বৈদ্যবংশে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে ১৭১৮-১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নেই।

কবির সর্বজ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম অম্বিকা, দ্বিতীয়া ভগিনীর নাম ভবানী ও ভগ্নিপতি লক্ষ্মীনারায়ণ,— কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিশ্বনাথ। রামদুলাল ও রামমোহন নামে রামপ্রসাদের দুই পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা ছিল। জনশ্রুতি এই যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশে রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। ভণিতায় তিনি 'কবিরঞ্জন' উপাধি ব্যবহার করেছেন। সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের পরে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত হয়। রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ভারতচন্দ্রের মত কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। অনেক স্থলে অনাবশ্যক পাণ্ডিত্যের ভারে কাব্যটিকে গুরুভার করে তুলেছেন। মনে হয় বিদ্যাসুন্দর কবির প্রথম রচনা। পরে তিনি শ্যামাসঙ্গীত ও উমাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। রামপ্রসাদ কৃষ্ণকীর্তনও রচনা করেছিলেন।

নিধিরাম ঃ নিধিরাম আচার্য নামে এক ব্যক্তি কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির পিতার নাম দুর্লভ আচার্য ও মাতার নাম লক্ষ্মী। ১৬৭৮ শক বা ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কাব্যটি রচিত হয়। নিধিরামের কাব্যের পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গেছে। মনে হয় কবি এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। নিধিরামের কাব্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় থাকলেও কবিত্বের পরিচয় নেই।

রায়মঙ্গল

দক্ষিণরায়ের মহিমাকীর্তন উপলক্ষ্যে রায়মঙ্গল কাব্য রচিত হয়। দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্রদেবতা। দক্ষিণ ও নিম্ন বঙ্গের ব্যাঘ্রভয় নিবারণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণরায় পূজিত হয়ে থাকেন। দক্ষিণ দিকের অধিপতি বলেই তিনি দক্ষিণরায়। দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রবাহন,—তাঁর যোদ্ধার বেশ—হাতে ধনুশর। পুরাণে দক্ষিণরায়ের কোন উল্লেখ নেই। ইনি সম্পূর্ণই লৌকিক দেবতা। হিন্দুর দক্ষিণরায়ের সঙ্গে মুসলমানের ব্যাঘ্রদেবতা বড় গাজী খাঁ এবং ব্যাঘ্রদেবী

বিধি দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে পূজিত হয়ে থাকেন। রায়মঙ্গলে দক্ষিণরায়ের ঙ্গে বড় গাজীর বিবাদ ও বিবাদ মীমাংসার কাহিনী আছে। দক্ষিণরায়ের র্ণাঙ্গ মূর্তির পরিবর্তে 'মুণ্ড' পূজারও রীতি আছে। প্রসিদ্ধ আছে, মুণ্ডটি গণেশের ছিন্নমুণ্ড, মুকুন্দরামের কাব্যে কালকেতুর ব্যাঘ্রশীকারের কাহিনী থেকে ঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন যে মুকুন্দরামের সময়ে ব্যাঘ্রদেবতা ক্ষিণরায়ের জন্ম হয় নি।

ায়মঙ্গলের কবি

মাধব আচার্য ঃ রায়মঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি সম্ভবত মাধব আচার্য। কৃষ্ণরাম দাস মাধব আচার্যের রায়মঙ্গল কাব্যের উল্লেখ করেছেন।

পূর্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য॥

এই মাধব আচার্য সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, কোন পুঁথিও পাওয়া ায় না।

কৃষ্ণরাম দাস ঃ কালিকামঙ্গল কাব্যের কবি কৃষ্ণরাম দাস রায়মঙ্গল কাব্য চনা করেছিলেন। এই কাব্যেও কবি দেবতার স্বপ্নাদেশের কথা বর্ণনা করেছেন। এক সময়ে ভাদ্রমাসের সোমবার কৃষ্ণরাম খাসপুর পরগণার অন্তর্গত ড়িষ্যা গ্রামে গিয়ে বিপদে পড়ে এক গোয়ালার গোয়াল ঘরে রাত কাটান। শেষ রাত্রে কবি স্বপ্ন দেখেন যে ব্যাঘ্রবাহন ধনুর্বাণধারী দক্ষিণরায় তাঁকে ায়মঙ্গল রচনায় আদেশ দিলেন :

পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠারো ভাটির মাঝে হইবে প্রচার॥

কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলের পুঁথি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নি। কৃষ্ণরামের রচনায় পাণ্ডিত্য আছে। ভাষা সরল। একটি বলিষ্ঠ ভঙ্গী আছে কৃষ্ণরামের কাব্যে। তবু কবিত্বের দিক থেকে রায়মঙ্গলের উল্লেখযোগ্যতা নেই।

অন্যান্য কবি ঃ কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল অনুসরণ করে রুদ্রদেব ও হরি‍ দু'খানি রায়মঙ্গল লিখেছিলেন। কাব্য দুটিতে উল্লেখযোগ্য প্রতিভার কো পরিচয় নেই।

শিশুপালিকা দেবী ষষ্ঠীদেবীর মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে ষষ্ঠীমঙ্গল কা রচিত হয়েছে। এই কাব্যটি ব্রতকথা জাতীয়। মেয়েলী ব্রতকথায় ষ দেবীর এই উপাখ্যান এখনও প্রচলিত।

ষষ্ঠীমঙ্গলের কাহিনী ঃ ষষ্ঠীদেবীর সহচরী লীলাবতী ষষ্ঠীদেবীর পূ প্রচারের উদ্দেশ্যে নানা স্থান ভ্রমণ করে সপ্তগ্রামে এসে হাজির হলেন সপ্তগ্রামের রাণী ষষ্ঠীর দিনে মাছ পোড়া দিয়ে ভাত খাচ্ছিলেন। বৃ ব্রাহ্মণীর বেশে দেবী লীলাবতীকে নিয়ে রাণীর কাছে উপস্থিত হলেন এ রাণীর বাড়ীতে ষষ্ঠীপূজা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন রাণ কৌতূহল নিবৃত্ত করতে লীলাবতী ষষ্ঠীদেবীর মহিমাসূচক কাহিনীটি বিবৃ করলেন ঃ—

সায়বেণের মা ষষ্ঠীর কৃপায় সাত পুত্রের জননী। সে পুত্রবধূদের নি সর্বদা ষষ্ঠীপূজা করতো। একদিন ষষ্ঠীপূজার আয়োজন করে কনিষ্ঠ পুত্রবধূ পাহারায় নিযুক্ত রেখে কার্যান্তরে গিয়েছিল। গর্ভবতী কনিষ্ঠা বধূ লো বশতঃ দেবীর পূজোপকরণ কিছু কিছু খেয়ে ফেলে এবং শাশুড়ীকে মিথ বলে যে এক কালো বিড়াল সব খেয়ে গেছে। ষষ্ঠীর বাহন কালো বিড় ক্রুদ্ধ হয়ে ছোট বউ-এর সকল সন্তানকে বিনাশ করার সংকল্প করলো সন্তান প্রসবের পরেই শিশুটিকে কালো বিড়াল হরণ করে। এইভাবে ছ পুত্র অপহৃত হওয়ার পর বধূটি অরণ্যে আত্মগোপন করে এবং একটি পুত্রসন্ত

প্রসব করে। কিন্তু সারারাত্রি জাগরণের পরে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ামাত্রই কালো বিড়াল পুত্রটিকে নিয়ে পালায়। বিড়ালটিকে ধরতে গিয়ে ছোট বৌ হোঁচট খেয়ে পড়ে চৈতন্য হারায়। দেবী ষষ্ঠীর দয়া হোল। তিনি ছোট বৌকে ষষ্ঠীদেবীর মহিমা বুঝিয়ে দিয়ে ষষ্ঠীপূজার নির্দেশ দিলেন এবং সাতটি পুত্রই ফিরিয়ে দিলেন। বাড়ী ফিরে ছোট বৌ ষষ্ঠী পূজা করলো।

এই কাহিনী শুনে রাণী সহচরীদের সঙ্গে সাড়ম্বরে ষষ্ঠীপূজা করলেন। দেবীর পূজা প্রচারিত হোল।

ষষ্ঠীমঙ্গলের কবি ঃ

কৃষ্ণরাম দাস ঃ কালিকা মঙ্গল ও রায় মঙ্গল রচয়িতা কৃষ্ণরাম দাস ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন ১৬০১ শকাব্দ বা ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে। কাব্যটি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এই কাব্যে সপ্তগ্রামের একটি বিস্তৃত বিবরণ আছে।

সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথীর কুল।
নিরবধি যজ্ঞ দান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাহি নাহি দুঃখ শোক ॥

ছোট বৌ-এর লোভের বর্ণনাটিও মনোজ্ঞ। কাব্যটি ছড়ার মত—ব্রতকথা জাতীয়—এই কাব্য কাহিনীতে কোন বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে নি।

রুদ্ররাম চক্রবর্তী ঃ ষষ্ঠীমঙ্গলের অপর কবি রুদ্ররাম চক্রবর্তী। কবি সম্ভবতঃ খুলনা জেলার অধিবাসী ছিলেন। এই অঞ্চলেই কাব্যটির প্রচলন ছিল। কবির উপাধি ছিল বিদ্যাভূষণ, তাঁর পিতার নাম গঙ্গারাম। কবির কন্যা অসুস্থ হলে দেবী ষষ্ঠী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে তাঁকে ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচনা করতে বললেন। দেবীর আদেশ পেয়ে রুদ্ররাম ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচনা করলেন।

কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গলে যে লৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে রুদ্ররামের কাব্যে তা থেকে ভিন্ন কার্তিকেয় সংশ্লিষ্ট পুরাণ নির্ভর কাহিনী বর্ণিত

হয়েছে। বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ষষ্ঠীর ব্রতকথামূলক কাহিনী থেকে এ কাহিনী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ভাষাবিচারে কবিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক মনে হয়। এই বৃহৎ কাব্যটিতে কার্তিকেয়ের জন্ম, তারকাসুর বধ, কার্তিকেয়ের তীর্থ-ভ্রমণ, বিহাহ ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে কোলাঞ্চ দেশের রাজ্যচ্যুত রাজা ক্ষেত্র মিশ্রের দেবীর বরে পুত্রলাভ ও পিতৃরাজ্য উদ্ধারের কাহিনী এবং কলাবতীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

রামধন চক্রবর্তীঃ রামধন চক্রবর্তী উনবিংশ শতাব্দীতে ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। পাঁচালীকার দাশরথি রায়ের মাতুলালয় বর্ধমান জেলার পীলাগ্রামে রামধনের নিবাস ছিল। কাব্যটি আকারে বৃহৎ।

শীতলামঙ্গল

বসন্তরোগের দেবতা শীতলার তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যেই শীতলামঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে। এই কাব্যেব কাহিনীর সঙ্গে ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর মিল আছে।

কাহিনীঃ শীতলার পুত্র বসন্তরায় দেবীর পূজার তদারকি করতে করতে সপ্তগ্রামে কায়স্থ মদন দাসের কাছে উপস্থিত হলেন বৈষ্ণব ব্যাপারীর বেশ ধরে। মদনদাস মুড়াঘাটের জগাতি অর্থাৎ শুল্ক আদায়কারী। বসন্তরায় শুল্ক না দিয়ে চলে যাওয়ায় মদন দাসের পেয়দারা বসন্ত রায়কে ধরে আনলো এবং তার দ্রব্যাদি কেড়ে নিল। বসন্ত রায়ের দ্রব্যাদি উদরসাৎ করে মদন দাস নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হোল। অবশেষে বসন্তরায়ের কৃপায় সে রোগমুক্ত হয়ে শীতলার পূজা করে এবং শীতলার ভক্তে পরিণত হয়। পরে নারদের কথায় দেবী আধিব্যাধি সঙ্গে নিয়ে মর্তভ্রমণে যাত্রা করলেন। এই খণ্ডিত কাহিনীটি পাওয়া যায় কবি কৃষ্ণরাম দাসের শীতলামঙ্গলে।

শীতলামঙ্গলের বিভিন্ন কবি ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে দেবীর কৃপায় কৃষ্ণ-বলরামের বসন্ত রোগ মুক্তির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কবিবল্লভ দৈবকী নন্দন 'চন্দ্রকেতুর পালা' ও 'রঘুনাথ দত্তের পালা' নামে দুটি পৃথক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। চন্দ্রকেতুর পালাটি মনসামঙ্গলের ছায়ায় রচিত। দেবী শীতলা মর্তে পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে চৌষট্টি বসন্ত ও জ্বরাসুরকে নিয়ে চন্দ্রকেতুর রাজ্যে প্রবেশ করলেন এক জরাতুরা বৃদ্ধার বেশে। রাজ্যের কুলনারীগণ বৃদ্ধাকে অবজ্ঞা করায় বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়—বালকেরাও আক্রান্ত হয়। দেবী বৃদ্ধার বেশে রাজসভার উপস্থিত হয়ে রাজাকে শীতলা পূজা করতে পরামর্শ দিলেন। শিবভক্ত চন্দ্রকেতু শীতলা পূজা করতে স্বীকৃত না হওয়ায় তার পুত্রগণ একে একে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হোল। শিব স্বয়ং অনুচর ভীমসহ ভক্তকে রক্ষা করতে এসে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। রাজার কনিষ্ঠ পুত্রটি আত্মরক্ষার্থে পাতালে প্রবেশ করেও রক্ষা পেল না। রাজকুমারের পত্নী স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সহমৃতা হবার উদ্যোগী হলে বৃদ্ধার বেশে দেবী চন্দ্রকলাকে দেখা দিলেন—তার স্বামীর জীবন দিলেন এবং তাকে 'মৃতসঞ্চারিণী' নামক মন্ত্রও শিখিয়ে দিলেন। উনসত্তরটি পুত্রের জীবনলাভের বিনিময়েও রাজা শীতলা পূজা করতে স্বীকৃত হলেন না। তখন শিবের অনুরোধে রাজা শীতলা পূজা করলেন এবং বসন্ত রোগে মৃত ব্যক্তিগণ সকলেই পুনর্জীবন লাভ করলো।

শীতলামঙ্গলের আর একটি কাহিনী 'বিরাট পালা'। এই পালায় বিরাট রাজ্যে বসন্তরোগের প্রকোপ ও শীতলার কৃপায় রোগমুক্তি বর্ণিত হয়েছে।

এ ছাড়াও কাজির কাহিনী ও হৃষিকেশ সাধুর কাহিনী পাওয়া যায় শীতলামঙ্গলে। কাজির কাহিনীতে মুসলমান কাজিকে বসন্তরোগে আক্রান্ত করে শীতলাভক্তে পরিণত করা হয়েছে। বণিক হৃষিকেশের বাণিজ্য যাত্রা সমুদ্রে মায়াপুরী দর্শন প্রভৃতি কাহিনী ধনপতির উপাখ্যানের অনুরূপ।

শীতলামঙ্গলের এই কাহিনীগুলি সুসংবদ্ধ নয়। সকল কবি সব কাহিনীগুলি গ্রহণও করেন নি। পূর্বতন মঙ্গলকাব্যগুলির আদর্শেই কাহিনীগুলি রচিত হয়েছে। তাই এই সকল কাহিনীতে বিশেষত্বও তেমন কিছু নেই।

শীতলামঙ্গলের কবি ঃ

কৃষ্ণরাম ঃ কালিকামঙ্গল ও রায়মঙ্গল প্রভৃতি কাব্য প্রণেতা কৃষ্ণরাম দাস শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যটি খণ্ডিত এবং বিশেষত্ব বর্জিত। কাব্যটি গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট; অশ্লীল গালাগালি আধুনিক রুচিকে আঘাত করে।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ঃ নিত্যানন্দ চক্রবর্তী মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণের সভাসদ ছিলেন। কবির পিতার নাম চিরঞ্জীব মিশ্র,—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীচৈতন্য মিশ্র। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে নিত্যানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে নিত্যানন্দের শীতলামঙ্গল রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে। নিত্যানন্দের কাব্যটি আকারে বৃহৎ। এতে বিরাট পালা এবং গোকুল পালাও সংযুক্ত। নিত্যানন্দের রচনা সরল—ভাষা মার্জিত। কবির পাণ্ডিত্য থাকলেও, তা কাব্যকে ভারাক্রান্ত করে তোলে নি।

মাণিক রাম ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতা মাণিকরাম গাঙ্গুলী একটি সংক্ষিপ্ত শীতলামঙ্গল- কাব্য লিখেছিলেন। কবি ভণিতায় লিখেছেন,

গাঙ্গুলী বাঙ্গাল পাস বেলটা গ্রামেতে বাস
পিতা গদাধর গুণময়।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে কৌশল্যা করিয়া মনে
ভাবিয়া শীতলা পদদ্বয়॥

শ্রীবল্লভ ঃ কবি শ্রীবল্লভ শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। শ্রী বল্লভের পিতা শ্রীগোপালও শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন,

পিতামহ পুরুষোত্তম জগতে ঈশ্বর নাম
শ্রীচৈতন্য তাহার কুমারে।
তস্য সুত শ্রীশ্যাম সকল গুণের ধাম
কতকাল হস্তিনা নগরে॥

তস্য সুত শ্রীগোপাল মান্দারণে কতকাল
নিবাস করিল বৈদ্যপুরে।
শ্রীবল্লভ তাহার সুত গোবিন্দ পদেতে রত
হরি বল পাপ গেল দূরে॥

শ্রীগোপাল মান্দারণ থেকে বৈদ্যপুরে এসে বাস করেছিলেন। হুগলী জেলায় মান্দারণ (বর্তমান মান্নাদ) থেকে অনতিদূরবর্তী সমৃদ্ধ গ্রাম বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তঃপাতী বর্ধিষ্ণু গ্রাম বৈদ্যপুরে শ্রীগোপাল বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয়। শ্রীবল্লভের পিতা গোপাল ও শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে বল্লভ পিতার কাব্য আত্মসাৎ করেছিলেন। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তাফীর মতে বল্লভের শীতলা-মঙ্গল ভারতচন্দ্রের পূর্বে রচিত। এ অনুমান যথার্থ হলে কবিকে অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে স্থাপন করতে হয়। বল্লভ তাঁর কাব্যে চৌষট্টী প্রকার বসন্তরোগের বর্ণনা দিয়েছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে বল্লভ বসন্ত রোগের চিকিৎসক গ্রহবিপ্র ছিলেন।

কবি বল্লভের ভাষা নিত্যানন্দের ভাষার মত মার্জিত নয়। কাব্যটি অনেকাংশে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। বল্লভের কাব্য কবিত্ব বর্জিত নয়। বল্লভের কতকগুলি ছত্র প্রবচনের মত ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য।

অকিঞ্চন চক্রবর্তী ঃ অকিঞ্চন চক্রবর্তী বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদের আমলে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। অকিঞ্চনের উপাধি ছিল কবীন্দ্র। ইনি ঘাটালের অন্তর্গত বরদায় বাস করতেন। অকিঞ্চনের ভণিতায় আছে ঃ

শ্রীধন্য ক্ষত্রিয় জাতি বর্ধমানে অধিপতি
শ্রীযুত তিলকচন্দ্র রায়।
তদাশ্রয়ে করি বাস শীতলার ইতিহাস
চক্রবর্তী অকিঞ্চনে গায়॥

কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও রচনা করেছিলেন।

অন্যান্য কবি ঃ

ডঃ দীনেশ সেন, কৃষ্ণনাথ, রামপ্রসাদ, শঙ্করাচার্য ও রঘুনাথ দত্ত নামে কয়েকজন শীতলামঙ্গল কাব্য রচয়িতার নাম উল্লেখ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন, দয়াল, শঙ্কর প্রভৃতি কয়েকজন শীতলামঙ্গলের কবির নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের কাব্য সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী রামেশ্বরের ভণিতায় একটি শীতলামঙ্গল কাব্যের নাম উল্লেখ করেছেন।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য

এই মঙ্গলকাব্যগুলি ছাড়াও বিভিন্ন দেবদেবীর মহিমা বিষয়ক আরও কতকগুলি মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে সারদামঙ্গল, কমলা-মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল আখ্যায়িকার দেবতারা প্রায় সকলেই বৈদিক এবং পৌরাণক দেবতা। তৎসত্ত্বেও বাঙ্গালার জনজীবনে এঁদের সম্পর্কে নানাবিধ লৌকিক কাহিনী গড়ে উঠেছে ; সমাজ ও পরিবেশ অনুসারে

দেবতাদের চরিত্রও পরিবর্তিত হয়েছে। এই কাব্যগুলির মধ্যে কমলামঙ্গল ও সারদামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্যতা আছে।

কমলামঙ্গল :

কমলা বা লক্ষ্মীদেবীর মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে কাব্যটি রচিত হয়েছে। কমলামঙ্গলের লেখক কবি কৃষ্ণরাম দাস। এটি কৃষ্ণরামের সর্বশেষ রচনা। এই কাব্যে কৃষ্ণরাম 'কবিচন্দ্র' উপাধি ব্যবহার করেছেন। এই কাব্যে কবি একটি রূপকথাকে কাব্যের আকারে পরিবেষণ করেছেন।

কাহিনী :

জনার্দন নামে এক ব্রাহ্মণকুমার এবং বল্লভ নামে এক সওদাগর পুত্র— দুই বন্ধুতে ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে কাঞ্চী যাচ্ছিল। দেবী লক্ষ্মী কৃপা করে তাদের অনেক পথ ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন এক রাক্ষসপুরীতে। সেখানে এক রাক্ষসীপালিতা রাজকন্যার সঙ্গে এক ব্রাহ্মণকুমারের গান্ধর্ববিবাহ সংঘটিত হওয়ার পরে কাঞ্চী যাত্রাপথে দেবী সমুদ্র মধ্য দিয়ে অশ্বারোহণে গমনের উপযোগী পথ করে দিলেন। পথের পাশে কমলাদহের মধ্যে ধান্যক্ষেত্রে ধানের সাজ পরা কমলাকে দুই বন্ধু দেখলো এবং কাঞ্চী পৌছে কাঞ্চীর রাজার কাছে এই দৃশ্য বর্ণনা করলো। এই কাহিনীর পরিণতি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতির কাহিনীর অনুরূপ। রূপকথা ও ব্রতকথার মিশ্রণে রচিত এই কাব্য-কাহিনীর কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই। নারীর অলংকার সজ্জার ও নানাবিধ ধান্যের তালিকা বর্ণনায় কবি বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যটির ভাষা সরল ও অশ্লীলতা এবং গ্রাম্যতা বর্জিত।

দ্বিজ পঞ্চানন, শিবানন্দ কর, ভরত পণ্ডিত, শঙ্কর, দ্বিজ বসন্ত, ধনঞ্জয়, যাদব দাস প্রভৃতি লক্ষ্মীর পাঁচালী বা ব্রতকথা রচনা করেছিলেন।

সারদামঙ্গল

সারদা সরস্বতী বেদপুরাণ-তন্ত্র বাহিতা হয়ে আধুনিক বাঙ্গালী মানসেও অবিচলিত স্থান গ্রহণ করে আছেন। এ বিষয়ে দয়াময়ের সারদামঙ্গল একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সরস্বতীর মহিমাখ্যাপনের উদ্দেশ্যে মঙ্গলকাব্যের উপযোগী একটি আখ্যান এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে।

কাহিনী

সুরেশ্বরের রাজা সুবাহু তপস্যায় শিবকে তুষ্ট করে পুত্রলাভ করলেন,—পুত্রের নাম রাখলেন লক্ষধর। সাত বৎসর বয়সে কুলগুরু গৌরীদাস পণ্ডিতের হাতে রাজা পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ভার অর্পণ করলেন। কিন্তু লক্ষধরের বর্ণজ্ঞানও হোল না। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে মূর্খপুত্রকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। সরস্বতীর প্ররোচনায় কোটাল বধ্যভূমি থেকে রাজকুমারকে মুক্তি দিয়ে শৃগালের রক্ত রাজাকে দেখায়। দেবী সরস্বতী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে লক্ষধরকে নিয়ে অরণ্যের মধ্যে পাতার কুটির নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। লক্ষধর কাঠ কাটে, দেবী বাজারে বিক্রী করেন। একদিন কুটিরে ভাগবতের পুঁথি দেখে "রাধাকৃষ্ণ" পড়তে না পেরে লক্ষধর পুঁথিটিকে নদীর জলে ফেলে দিলে; পুঁথিটি নদীর জলে ভাসতে থাকে ও রাধাকৃষ্ণ নাম জলে মুছে যায়। ব্রাহ্মণী ফিরে এসে ক্রুদ্ধ হলেন, পুঁথিটি উদ্ধার করলেন এবং লক্ষধরকে 'বৈদেব' রাজ্যে পাঠালেন রাজকন্যাদের ভৃত্যরূপে সেবা করতে। এইভাবে চার বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে সে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হবে। লক্ষধর বৈদেব রাজ্যে এসে ধূলাকুট্যা নামে রাজকন্যাদের ভৃত্যত্বে নিযুক্ত হয়। একদিন সরস্বতীপূজার সময় ধূলাকুট্যা রাত্রি জাগরণ করে পূজোপকরণ পাহারা দিচ্ছিল। শেষরাত্রে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল। হঠাৎ দেখে এক বৃদ্ধা পূজার সামগ্রী উদরসাৎ করছে। লক্ষধর চোর ভেবে বৃদ্ধাকে খাটের পায়ায় বেঁধে রাখে। দেবী স্বমূর্তিতে দেখা দিয়ে তাকে অল্পকালের মধ্যে সর্ববিদ্যালাভের বর দিলেন।

রাজকন্যাদের গুরু জনার্দন রাজকন্যাদের প্রতি আসক্ত হয় এবং বিদ্যাদানের অঙ্গীকারে প্রলুব্ধ করে রাজকন্যাদের নিয়ে পলায়নে উদ্যত হয়। দেবী সরস্বতীর কৌশলে জনার্দন ধরা পড়লো, লক্ষধর রাজকন্যাদের নিয়ে পলায়ন করলো এবং তাদের বিয়ে করলো। নৌকা সুবাহুর রাজ্যে পৌছালে বিজয় দত্ত নামক এক বণিকের পত্নী ধূলাকুট্যাকে পত্নীগণসহ আশ্রয় দেয়। দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে বিজয় দত্ত ধূলাকুট্যাকে হারানো ছেলে মনে করে গ্রহণ করলো। ইতিমধ্যে সুবাহুর রাজ্য শ্রীহীন হয়েছে। ধূলাকুট্যার আয়োজিত ভোজসভায় রাজ্য সুবাহু নিমন্ত্রিত হয়ে এসে অপমানিত বোধ করে ধূলাকুট্যাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। কোটাল এ কাজে অসমর্থ হওয়ায় রাজা কোটালের মৃত্যুদণ্ডবিধান করলেন। দেবী সরস্বতীর কৃপায় সুবাহু পুত্রের পরিচয় পেলেন এবং পুত্রবধূগণ-সহ মিলিত হয়ে মহাসমারোহে সরস্বতী পূজা করলেন।

এই কাহিনীতে সরস্বতীর বৈদিক বা পৌরাণিক রূপগুণের কোন পরিচয় নেই। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মত এতে এক রূপকথার কাহিনী পরিকল্পিত হয়েছে।

সারদামঙ্গলের কবি ঃ

দয়ারাম দাস ঃ সারদামঙ্গলের লেখক দয়ারাম দাস। কবির আত্ম-পরিচয় থেকে জানা যায় যে তাঁর প্রপিতামহের নাম রমেন্দ্রজিৎ, পিতামহের নাম পরীক্ষিৎ, পিতার নাম জগন্নাথ। মেদিনীপুর জেলার কিশোরক পরগণায় কাশীজোড়ায় কবির নিবাস ছিল। স্থানীয় জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি কাব্যখানি রচনা করেন।

সারদামঙ্গল কাব্যখানি ক্ষুদ্র আকারের। কাব্যটি পাঁচালীর মত। কাব্যগুণ বিশেষ কিছু নেই। ভাষা আধুনিক। মনে হয় কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে বর্তমান ছিলেন।

বীরেশ্বর : বীরেশ্বর নামে অপর এক কবি সারদামঙ্গল বা সরস্বতী মঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এই কাব্যের কাহিনী স্বতন্ত্র। কালিদাস, ববরুচি প্রভৃতি কবি ও পণ্ডিতগণের কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে।

মৈমনসিংহের সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ (মৃত্যু ১২২৮) কর্তৃক লিখিত ভারতীমঙ্গল এবং মুনিরাম মিশ্রের সারদামঙ্গল কাব্যে কবি কালিদাসের সরস্বতীর বরলাভ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট

[ক]

বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা ঃ

পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী। প্রসিদ্ধ কবিদের রচনা মনসা পূজা উপলক্ষে গীত হোত। কিন্তু প্রসিদ্ধ কবিদের মনসামঙ্গলের পুঁথির অনুলিপি ছাড়াও বৈষ্ণব পদসংকলনের রীতির অনুসরণে বিভিন্ন কবির মনসামঙ্গল কাব্যের উৎকৃষ্ট অংশগুলি পালাক্রম অনুযায়ী সংকলিত ও গীত হতে থাকে। কাহিনী পর্যায় ঠিক রেখে বিভিন্ন কবির রচনা থেকে অংশবিশেষ গ্রহণ করে এই সংকলনগুলি রচিত হোত। বাইশজন কবির রচনা থেকে পদসংগ্রহ থাকলে সংকলনকে বলা হোত 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' বা 'বাইশা', আর ছয়জন কবির রচনা সংকলিত হলে বলা হোত 'ষঠ্ কবি' বা 'ষট্‌পদী'। অবশ্য সংকলনগুলিতে কবির সংখ্যা সর্বত্র ঠিক ঠিক ছয় অথবা বাইশ থাকতো—এমন নয়; অনেক স্থলে নির্ধারিত সংখ্যা অপেক্ষা কম বা বেশীও থাকতো। বিভিন্ন সংকলন-কর্তার সংকলিত কয়েকখানি 'বাইশা' ঢাকা, চট্টগ্রাম, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী সংকলিত এবং তরলকুমার চক্রবর্তী প্রকাশিত 'বাইশা' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক এই সংকলনে গৃহীত চব্বিশজন কবির ভণিতার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি একুশজন কবির নামের তালিকা দিয়েছেন। বিভিন্ন সংকলনে কবির নামের পার্থক্য আছে। আবার হয়ত কোন কোন নাম গায়েনের। তৎসত্ত্বেও এই সংকলনগুলির মূল্য আছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে সংকলনকর্তারা পুঁথির পাঠে হস্তক্ষেপ করেননি। সুতরাং বিভিন্ন কবির রচনার অবিকৃত পাঠসংকলনের জন্য এইগুলির মূল্য অস্বীকার করা যায় না। এইভাবে বিভিন্ন কবির রচনা

সংকলনের ফলে অনেক অজ্ঞাত-নামা কবির রচনা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে সংকলনকালে একটি ভৌগোলিক ক্রমও রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। ে অঞ্চলে সংকলনগুলি তৈরী হয়েছে, সাধারণতঃ সেই অঞ্চলের কবিদের রচনাই সেই সেই সংকলনে স্থান পেয়েছে। অবশ্য অন্যান্য অঞ্চলের কবিদের রচনা যে একেবারে স্থান পায়নি তা নয়। তবে অঞ্চল বিশেষের কবিরাই প্রাধান্য পেয়েছেন। মনসামঙ্গলের গায়করাই প্রয়োজন মত এইরূপ সংকলনগুলি রচনা করেছিলেন। এই সংকলনগুলি লিপিকর, সম্পাদক, প্রকাশক প্রভৃতির হস্তক্ষেপের ফলে অনেক সময় পরিবর্তিত হয়েছে। বহু কবির রচনা সংকলিত হওয়ায় 'বাইশা'র কাব্যমূল্য আলোচনা করা সম্ভব নয়।

মনসামঙ্গলের আরও কয়েকজন কবি ঃ

রসিক মিশ্র ঃ রসিক মিশ্র তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যের নাম দিয়েছেন "জগতী মঙ্গল"। কবি সম্ভবতঃ 'শ্রীকবিবল্লভ' উপাধি পেয়েছিলেন। ভণিতায় তিনি লিখেছেন :

প্রসাদ মিশ্রির বালা
সেবি জগতী কমলা।
রসিক তাহার নাম
পাঞ্চালিকা অনুপাম।
আখড়াশালেতে থানা
শ্রীকবিবল্লভ বানা।

রসিক মিশ্রের পৈত্রিক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার উত্তর পশ্চিম অং সেনভূম পরগণার কাঁকুটা-নন্দনপুর গ্রামে। পরে তিনি মল্লভূমির আখড়াশা বাস করেন। কবির পিতার নাম প্রসাদ এবং পিতামহের নাম মহেশ। কবি তাঁর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের নামও উল্লেখ করেছেন।

দ্বিজ রসিক ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যেরর পরিচ

আছে, কিন্তু কবিত্বের পরিচয় নেই। রামায়ণ ও ধর্মমঙ্গলকাব্য থেকে কবি প্রচুর উপাদান গ্রহণ করেছেন। রামায়ণের হনুমান চরিত্রটি তিনি মনসামঙ্গল কাব্যে গ্রহণ করেছেন। রসিকের কাব্যে বিষঝাড়ার মন্ত্রটিতে বৈশিষ্ট্য আছে। মন্ত্রটি প্রাচীন ছড়ার ধরনের।

দ্বিজ রসিকের কাব্যে রচনাকালের উল্লেখ নেই। ভাষা বিচারে তাঁকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক বলে অনুমিত হয়।

বানেশ্বর রায়ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাণেশ্বর রায় নামে একজন কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি বানেশ্বর তাঁর কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে লিখেছেন :

মনসামঙ্গলভাষে প্রথম বৈশাখ মাসে
শকাব্দা ষোল শ একচল্লিশে
ভাবিয়া ভবানী-হর ভনে দ্বিজ বাণেশ্বর
মনসার মঙ্গল প্রকাশে।

১৬৪১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বানেশ্বর মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন। বানেশ্বর বিস্তৃতভাবে বংশ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পিতার নাম হরিনারায়ণ, পিতামহের নাম বংশী রায়। কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা সদাশিব। কবির জন্ম রাইপুরে, নিবাস চম্পকপুরী। "নিবাস চম্পকপুরী, জন্ম রাইপুরে।" কিন্তু এই স্থান দুইটি কোন্ অঞ্চলে অবস্থিত তা নির্ণয় করা যায়নি। বানেশ্বরের ভাষা কলিকাতার ভাষার মত মার্জিত এবং পরিচ্ছন্ন। তাই মনে হয় যে বানেশ্বর পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী—সম্ভবতঃ কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের। বানেশ্বরের রচনা পরিচ্ছন্ন এবং সুসংবদ্ধ। বাস্তবতাই তাঁর কাব্যের বিশেষ গুণ। বেহুলাচরিত্র বর্ণনায় তিনি বাস্তবতার প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। বেহুলাকে তিনি বাস্তব মানবীরূপেই বর্ণনা করেছেন। আদর্শবাদ বেহুলাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কলার মান্দাসে মৃত পতির শবসহ বেহুলা যখন ভেসে চলেছেন, তখন তাঁর ভাই সুমতি তাঁকে পিতৃগৃহে ফিরিয়ে নিতে এলে বেহুলা বলেছেন—

যদি যাই ওরে ভাই তব সঙ্গে বাড়ী।
ধাইব বনিতা সব দেখিবারে রাঁড়ি ॥
ভবনের বার্তা মোর কিছু নয় হারা।
বিষম বনিতা বড় তোমাদের দারা ॥
বাজিলে কোন্দল বড় সভে দিবে গালি।
বাসরে ভাতার খালি কেন হেথা আলি ॥
নারিব সহিতে ভাই সে সব বচন।
অতএব বলি এ অরে কররে গমন ॥

এই উক্তিতে বেহুলাকে যেমন বাঙ্গালী গৃহস্থ বধূ বলে চিনতে পারি, তেমনি বাঙ্গালার সংসারের একটি পারিবারিক বিবরণ পাই। এই জন্যই বানেশ্বরের মনসামঙ্গল কাব্যটির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিজ কবিচন্দ্র ঃ দ্বিজ কবিচন্দ্র একটি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কাব্যটির নাম জগতীমঙ্গল। কবি নিজেকে শাজাদা রায়ের বংশোদ্ভব বলে উল্লেখ করেছেন। কবির পুত্রের নাম রঘুবীর। কবিচন্দ্রের প্রকৃত নাম জানা যায় নি।

রামজীবন ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ ঃ রামজীবন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। রামজীবন একখানি সূর্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির জন্মভূমি চট্টগ্রাম জেলার বাঁশফলি গ্রামে। মনসামঙ্গল কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে কবি লিখেছেন—

শর কর ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
মনসা মঙ্গল রামজীবন রচিত ॥

১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রামজীবনের মনসামঙ্গল রচিত হয়েছিল। রামজীবনের মনসামঙ্গলে পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু কবিত্বের পরিচয় নেই। তবে গতানুগতিক কাহিনী বর্ণনাতেও একটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। রামজীবনের কাব্যে ছন্দোবন্ধেও কিছু বৈচিত্র্য আছে।

অন্যান্য কবি ঃ জগমোহন মিত্র ১২৫১ সাল বা ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ১২৬৭ বঙ্গাব্দ বা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যশোর জেলার অন্তর্গত মল্লিকপুর গ্রামবাসী দ্বিজ কালীপ্রসন্নের মনসামঙ্গল রচিত হয়। উনংবিশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীহট্টের রাধানাথ রায়চৌধুরীর মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়।

পূর্ববঙ্গের অন্যান্য কবিদের মধ্যে বৈদ্য হরিদাস, কৃষ্ণানন্দ, বিপ্র জানকীনাথ, গঙ্গাদাস সেন, কবিকর্ণপুর, রামবিনোদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মনসামঙ্গল কাব্যে পুরুষকারের জয়গান ঃ

মঙ্গলকাব্যগুলি দৈবনির্ভরতার কাব্য। তুর্কী আক্রমণ, শাসন ও অত্যাচারের ফলে প্রতিকারহীন বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাসের মূল যখন উৎপাটিত হয়েছিল তখনই অসহায় মানুষ সুখ-শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দেবতার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর খুঁজে পায়নি। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবচরিত্র ও কাহিনী পরিকল্পনায় এই দৈবনির্ভরতার স্বাক্ষর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্রগুলি অধিকাংশই দৈবনির্ভর অথবা দৈবানুগৃহীত। মনসামঙ্গল কাব্যের দেবতা মনসা যদিও অত্যাচারী শাসকের স্থলাভিষিক্তা, তথাপি এই কাব্যের নায়ক চাঁদসওদাগর দৈবানুগৃহীত অথবা দেবতার কৃপার উপরে নির্ভরশীল নয়। চাঁদসওদাগর দৈবনিগৃহীত মহাশক্তিধর পুরুষ। অত্যাচারী দেবতার কাছে সে নতি স্বীকার করেনি। চাঁদসওদাগর পুরুষকারের জীবন্ত বিগ্রহ। ছয় পুত্রের শোক বুকে লালন করেও চাঁদ আপন শক্তিতে দৈবানুগ্রহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। তার ভয়ে দেবতাও কম্পান্বিতা। পত্নীর বিরোধিতা—স্বজনবর্গের উপদেশ অগ্রাহ্য করে সে রুখে দাঁড়িয়েছে অত্যাচারী দেবতার বিরুদ্ধে। দেবতার চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য চাঁদ সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাই করেছে আত্মশক্তিতে নির্ভর করে। বরণ করে নিয়েছে সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট। কনিষ্ঠ পুত্রটি লোহার বাসরঘরে প্রাণত্যাগ করেছে—দেবতার রোষে চাঁদ সর্বস্ব হারিয়েছে—নিজের জীবন বিপন্ন করেছে—সমুদ্রে ভাসমান

হয়েও দেবতার দেওয়া আশ্রয়টুকুও অবজ্ঞায় উপেক্ষা করেছে। চাঁদের যেমন মনোবল অটুট, তেমনি তার দৈহিক শক্তি ও সাহস। স্নেহের প্রতি আনুগত্য-বশতঃ চাঁদ যখন দেবতার পূজা করেছে মুখ ফিরিয়ে বাম হাতে, তখন পুরুষকারে গড়া বিরাট পুরুষ চাঁদ সওদাগরের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। মঙ্গলকাব্য সংসারে চাঁদের মত এমন একটি চরিত্র একান্তই দুর্লভ।

মনসামঙ্গল কাব্যে দুটি মাত্র প্রধান চরিত্র—চাঁদ সওদাগর ও বেহুলা। চাঁদের মতই বেহুলাও আত্মনির্ভরশীলা। দেবতার বিরোধিতা না করলেও দুর্জয় বিশ্বাস এবং অটুট মনোবল নিয়ে সে একাকী কলার ভেলায় মৃতস্বামীর দেহ সঙ্গে নিয়ে ভেসে চলেছে—কেবল অন্তরে কঠোর প্রতিজ্ঞা স্বামীকে পুনর্জীবিত করবে। রূপ-যৌবনবতী নারী একাকিনী ভেসে চলেছে জলে—পথে লোভাতুর মানুষ আর হিংস্র শ্বাপদ তার দিকে চেয়েছে—তাকে কামনা করেছে। কিন্তু ব্যর্থকাম হয়েছে। পথের নির্দেশ নেই—গন্তব্যের উদ্দেশ নেই, তবু বেহুলা মনোবল হারায়নি। শেষ পর্যন্ত নিজেরই কৃতিত্বে সে ফিরে পেয়েছে তার স্বামী আর ভাসুরদের জীবন। এমনি একটি তেজস্বিনী রমণী গভীর আত্মপ্রত্যয়ের নিদর্শনস্বরূপ হয়ে আছে মনসামঙ্গল কাব্যে।

মনসামঙ্গলের প্রধান দুটি চরিত্র আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল—পুরুষকারের মূর্ত বিগ্রহ—একথা বলা অযৌক্তিক নয়। দৈবনির্ভরতার যুগে দৈবনির্ভর কাব্যে দুইটি প্রধান চরিত্রে মনসামঙ্গলের কবিগণ বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ও পুরুষকারের যে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছেন, তা প্রকৃতই বিস্ময়কর।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কয়েকজন অপ্রধান কবি ঃ

ভবানীশঙ্কর দাস ঃ ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কালে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ভবানীশঙ্করের "মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা" উল্লেখযোগ্য। কবির নিবাস চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামে। কবি জাতিতে কায়স্থ। তাঁর পিতার নাম নয়ন রায়। কাব্য শেষে কবি তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে লিখেছেন—

ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।
ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে ॥

১৭০১ শকাব্দ বা ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ভবানীশঙ্কর তাঁর 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা' রচনা শেষ করেন। কবি তাঁর কাব্যকে 'পাঞ্চালিকা' বলেছেন,—"ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে।"

ভবানীশঙ্করের চণ্ডীমঙ্গল বৃহদাকৃতির কাব্য। তিনি কালকেতু ও ধনপতির উপাখ্যান সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। কাব্যের প্রথমে তিনি ভাগবতের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পৌরাণিক হরপার্বতীর কাহিনী,—কার্তিকেয় ও গণেশের জন্মবৃত্তান্ত এবং অসুর যুদ্ধে কালিকার আবির্ভাব ও পরে কলিঙ্গনগরে দেবীর পূজা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মর্তাবরণ ইত্যাদিও প্রথম অংশে স্থান পেয়েছে।

ভবানীশঙ্কর পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত পুরাণ থেকে বহু উপাদান তিনি কাব্যমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়েছেন। তৎসম শব্দ ও অলংকারে তিনি কাব্যকে ভূষিত করেছেন। কিন্তু এইগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাব্যের ভারস্বরূপ হয়ে উঠেছে। "শৃণুধ্বং সাধব সব কর অবধান", "বন্দমাম্বিকারাঙ্ঘ্রিতে লোটাই বিশেষ" প্রভৃতি বাক্যগুলিতে সংস্কৃতরীতি শুধু শ্রুতিকটু হয়নি দুর্বোধ্যও হয়েছে। সংস্কৃত রীতির সন্ধি সমাস তিনি বাঙ্গালা ভাষায়

ব্যবহার করেছেন। ভবানীশঙ্কর যদিও আখ্যানকাব্য রচনা করেছেন, তথাপি তাঁর কাব্যে গীতিময়তা প্রচুর। কাব্যমধ্যে "ঘোষা" নামে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ও অন্যান্য দেবতা বিষয়ক ভক্তিমূলক পদগুলিতে কবির কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে। এই পদগুলিতেই ভবানীশঙ্করের স্বকীয়তা ফুটে উঠেছে।

মোহন বাঁশীর স্বরে আর না ডাকিয় মোরে
আর না আসিয় মোর ঘরে।
আপনে বঞ্চহ যথা আহ্মিহ ন জাবো তথা
ভণে দাস ভবানীশঙ্করে॥

এই জাতীয় পদে কবির আন্তরিকতা এবং কবিত্ব দুইই সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। আখ্যায়িকা বর্ণনাতেও সংস্কৃতের গুরুভারজনিত বাধা অতিক্রম করতে পারলে কবিত্বের স্পর্শলাভ দুর্লভ নয়। ফুল্লরার বারমাস্যা বর্ণনায় কবি লিখেছেন,—

ফুল্লরায়ে বলে বাক্য শুন রূপবতী।
যত ক্লেশে প্রভু সঙ্গে করিয়ে বসতি॥
মেঘরাশি মধ্যে ভাস্করোদয় হয়ে যবে।
যত ক্লেশ ক্রমে আহ্মি এই ভবে॥
আতপ প্রতাপ হয়ে ধনঞ্জয় সমা।
হেন সমে মাংস লৈয়া ভ্রমি আহ্মি বামা॥
দিবাকর বৃষস্থ হয়েন যেই মাসে।
আহ্মার বিপত্তি দেখি শক্র সর্ব হাসে॥

এই বর্ণনায় পাণ্ডিত্য থাকলেও তা সুখপাঠ্য হয়েছে। ভবানীশঙ্কর ভারতচন্দ্রের পরে আবির্ভূত হলেও ভারতচন্দ্রের প্রভাব তাঁর কাব্যে পাওয়া যায় না।

জয়নারায়ণ সেন: লালা জয়নারায়ণ সেন একটি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত জপসা গ্রামের বৈদ্যবংশে

জয়নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। 'হরিলীলা' নামক যে সত্যপীরের পাঁচালী কবি লিখেছিলেন, সেই কাব্যটি ১৬৯৪ শকাব্দ বা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। সম্ভবতঃ চণ্ডীমঙ্গল 'হরিলীলা'র পূর্বে রচিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান কৃষ্ণরামের দ্বিতীয় পুত্র রামপ্রসাদের পুত্র জয়নারায়ণ। কাহিনী বর্ণনার দিক থেকে জয়নারায়ণ প্রাচীন পন্থী। তিনি ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ না করে কালকেতুর ও ধনপতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাঙ্‌ নির্মিতির দিক থেকে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুসারী। ভারতচন্দ্রের মত ভাষাকে তিনি যথাসাধ্য সাজিয়েছেন। তবে ভারতচন্দ্রের প্রতিভা তাঁর ছিল না,—দুর্লভ কবিত্ব শক্তিরও তিনি অধিকারী ছিলেন না। পাণ্ডিত্য থাকলেও জয়নারায়ণের কাব্য সহজ কবিত্বে মণ্ডিত নয়। কবি পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার থেকে মাধব-সুলোচনার উপাখ্যান তাঁর কাব্যে সংযোজিত করেছেন।

জনার্দনঃ জনার্দন নামে এক কবির ব্রতকথা জাতীয় "চণ্ডী" নামক একখানি কাব্য পূর্ববঙ্গের নানাস্থান থেকে পাওয়া গেছে। এই জনার্দন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করেন যে জনার্দন অনেক পুরানো কালের কবি। মুকুন্দরাম এবং মাধব জনার্দনের ক্ষুদ্র ব্রতকথাকেই বিস্তৃত কাব্যের রূপ দিয়েছেন। এ অনুমানের স্বপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। জনার্দনের কাব্যের ভাষা একেবারে আধুনিক। জনার্দনের রচনা সরল—বর্ণনাভঙ্গীও প্রাঞ্জল। তবে জনার্দনের কাব্যে কবিত্বের প্রকাশ দেখা যায় না।

দ্বিজ মুকুন্দঃ ইনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম থেকে ভিন্ন ব্যক্তি। এঁর কাব্যের নাম 'বাসুলী মঙ্গল'। কবি ভণিতায় 'দ্বিজ' অথবা 'কবিচন্দ্র' উপাধি ব্যবহার করেছেন। কাব্যটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দুসুন্দর সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। সুবলচন্দ্রের অনুমান, বাসুলীমঙ্গল কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের পূর্ববর্তী। কিন্তু এরূপ অনুমানের

পোষকতায় কোন প্রমাণ নেই। কাব্যের ভাষা আধুনিক। কাব্যটি অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে রচিত হওয়াই সম্ভব।

বাসুলী মঙ্গলের প্রথমাংশে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। চণ্ডীর উপাখ্যানের পরে ধূস দত্তের কাহিনী স্থানলাভ করেছে। ধূস দত্তের কাহিনী প্রকৃতপক্ষে ধনপতি সদাগরের কাহিনী বেনামীতে উপস্থাপিত। এই কাব্যে কালকেতুর উপাখ্যান পরিত্যক্ত হয়েছে।

অন্যান্য কবিঃ কবি কৃষ্ণজীবন, হরিরাম, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি বহু কবিই চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন। গতানুগতিক কাহিনী বর্ণনা এবং মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির অনুসরণ ছাড়া তাঁরা স্বতন্ত্র প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কাহিনীতে রসগত বিচ্ছিন্নতাঃ

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে দুটি স্বতন্ত্র আখ্যান পরিবেষিত হয়েছে। এই দুটি আখ্যান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন,—পরস্পর নিরপেক্ষ। কালকেতুর উপাখ্যানে ব্যাধ-সন্তান কালকেতুর প্রতি দেবীর কৃপাপ্রদর্শনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দেবী এখানে অরণ্যের পশুকুলের দেবতা—আবার শবর জাতির উপাসিতা গোধারূপিণী চণ্ডী,—তিনিই পুরাণের দশভুজা দুর্গা। কিন্তু ধনপতির উপাখ্যানে দেবী নারী পুজিতা মঙ্গলচণ্ডী—ঘটে পূজিতা,—কিন্তু রূপকল্পনায় তিনি গজলক্ষ্মী,—বণিক জাতির উপাস্যা সম্পদদাত্রী দেবী। দুইটি উপাখ্যানে দেবীর রূপকল্পনায় যেমন বিস্তর পার্থক্য,—তেমনি দুটি কাহিনীতে নেই কোথাও কোন প্রকার সংযোগ। ধনপতির কাহিনী সন্দেহাতীত ভাবে মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগরের উপাখ্যানের আদর্শে পরিকল্পিত। দুটি কাহিনী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পাঠকের মনে অখণ্ড রস সৃষ্টি সম্ভব হয় না। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে যেমন অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা থাকায় এক অখণ্ড রসানুভূতি

সম্ভব হয়, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তা কোনমতেই সম্ভব হয় না। অবশ্য মঙ্গলকাব্যগুলিতে কাহিনী বিন্যাসে সুসংবদ্ধ ঐক্য প্রায়ই রক্ষিত হয় না। দেবখণ্ডের হরগৌরীর উপাখ্যানের সঙ্গে লৌকিক কাহিনীর সংযোগ গ্রন্থি খুব দৃঢ় নয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের কাহিনী ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী পরস্পর সংশ্লিষ্ট নয়। শিবায়নে পৌরাণিক শিবের উপাখ্যান ও লৌকিক শিবের উপাখ্যানেও সঙ্গতিবিধান কষ্টকর। তথাপি সব মিলিয়ে একটি সমগ্রতা বিরাজ করে,—সকল কাহিনীর মধ্যেই একটি সংযোগ সূত্র থাকায় সমগ্র কাব্য জুড়ে মোটামুটি একটি অখণ্ড রসপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের স্বতন্ত্র দুটি উপাখ্যান এমন বিচ্ছিন্ন,—এমনই পরস্পর নিরপেক্ষ যে দুয়ের মধ্যে একটি সংযোগ সূত্র আবিষ্কার করা দুরূহ ব্যাপার। দুই উপাখ্যানের দেবতার নাম এক হওয়া সত্ত্বেও,—রূপগতভাবে সাদৃশ্য নেই কোথাও। সুতরাং চণ্ডীমঙ্গলের পাঠকের মনে রসের অখণ্ডতা কোন প্রকারেই রক্ষিত হয় না। ভিন্ন জাতের ভিন্ন স্বাদের দুটি স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী অখণ্ড রসানুভূতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

ধনপতির উপাখ্যানে গার্হস্থ্য চিত্রঃ

মঙ্গলকাব্যগুলি বাস্তব রসের আধার। মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবিরা বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যের কবিরা বিস্ময়কর সমাজবোধের পরিচয় দিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যগুলির কাহিনীতে অলৌকিকতা থাকলেও দেব ও মানব চরিত্রে যেমন বাঙ্গালীর জীবনচর্যার ছাপ পড়েছে তেমনি কাহিনীতে যত্রতত্র সমাজ চিত্র পরিবেষিত হয়েছে। বাঙ্গালীর সামাজিক রীতিনীতি—আচার-অনুষ্ঠান—জাতি ও বৃত্তি—ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পারিবারিক জীবনধারা প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। তাই সমাজজীবনের মূল্যবান ইতিহাস হিসাবে মঙ্গলকাব্যগুলি ঐতিহাসিকের আদরের সামগ্রী।

সমাজ ও পরিবার পরস্পর সংশ্লিষ্ট এবং অবিচ্ছিন্ন। মঙ্গলকাব্যগুলিতে সমাজজীবনের সঙ্গে পারিবারিক জীবনের চিত্রও অপ্রতুল নয়। বিশেষতঃ শিবায়ন কাব্যে শিব-শিবাণীর গার্হস্থ্য জীবন বর্ণনায় কবিরা দরিদ্র নিম্নবিত্ত বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনকে মূর্ত করে তুলেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতুর উপাখ্যানেও দরিদ্র ব্যাধদম্পতির গার্হস্থ্য জীবন চিত্রিত করেছেন। কিন্তু সমাজজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পরিবারগত এমন কতকগুলি বিশিষ্টতা প্রকাশ পায়, যেগুলির সাধারণীকরণ সর্বাংশে সম্ভব হয় না। পরিবার ভিত্তিক কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে সহৃদয় কবি সাহিত্যে মূর্ত করে তুলতে পারেন। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির উপাখ্যানে বৃহত্তর সামাজিক অবস্থার বিবরণ অপেক্ষা গার্হস্থ্য জীবন চিত্রণই প্রধান হয়ে উঠেছে। ধনপতির উপাখ্যানে সেকালের বণিকসমাজের বিবরণ থাকলেও ধনপতি-খুল্লনা-লহনার দাম্পত্য প্রেম—কলহ—মান ইত্যাদিই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে। বহুবিবাহ ভিত্তিক সেকালের বাঙ্গালী সমাজে সপত্নী কলহ স্বাভাবিক হলেও ধনপতি-লহনী-খুল্লনার গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র করেই কাহিনীটি আবর্তিত হয়েছে। লহনা-খুল্লনার বিবাদ—লহনার স্বামী বশ করার বিচিত্র প্রয়াস—দুই পত্নী নিয়ে ধনপতির বিড়ম্বনা,—দুই পত্নীর মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের প্রয়াস,—দাসদাসীদের মনিবগৃহের অশান্তিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ প্রভৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে গার্হস্থ্য জীবনের একটি চমৎকার চিত্র কবিরা তুলে ধরতে পেরেছেন। তবে একথাও সত্য যে গার্হস্থ্য জীবনের এই চিত্রগুলি সমাজ-বিবিক্ত বিচ্ছিন্ন চিত্র নয়। সেকালের সমাজের পটভূমিকাতেই এই গার্হস্থ্য জীবনচিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বরঞ্চ ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা, শ্রীমন্তর বিদ্যাশিক্ষা,—জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের খুল্লনার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ এবং ধনপতির গৃহে ভোজনে অনিচ্ছা প্রভৃতিতে সেকালের সমাজচিত্রই উদ্ঘাটিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে ধনপতির উপাখ্যানে গার্হস্থ্য জীবনের একটি অম্লমধুর বিবরণ কাহিনীটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য ঃ

মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য একই। কোন বিশেষ দেবতার মহিমাকীর্তন ও পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্যেই মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বর্ণিত দেবতারাও পৌরাণিক দেবসমাজে তেমন প্রাধান্য লাভ করতে পারেননি। এই দিক থেকে বিচার করলে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যে উদ্দেশ্যগত ঐক্য সুস্পষ্ট। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্যে একটি করে কাহিনী পরিকল্পিত হয়েছে। কাহিনী পরিকল্পনাতেও মঙ্গলকাব্যের এই তিনটি প্রধান ধারার মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। এই কাহিনীতে নায়কনায়িকারা হয় দেবতার আনুকূল্য লাভ করে মহিমা প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন, নয়ত দেবতার প্রতিকূলতা করেও শেষ পর্যন্ত নিজে ঐ দেবতার পূজা করে দেবতার মহিমা প্রচারে সহায়তা করেছেন। তিনটি কাব্যশাখার কাহিনীকেই অন্ততঃ দুই খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে—দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। কাব্যারম্ভে দেবদেবীর বন্দনা—কবির আত্মপরিচয় দান—গ্রন্থোৎপত্তির হেতু বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবতার স্বপ্নাদেশের বিবরণ—দিক্ বন্দনা প্রভৃতি প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেরই বর্ণিতব্য বিষয়। দেববন্দনা ইত্যাদির পর দেবখণ্ডে পৌরাণিক দেবতার কাহিনী বর্ণিত হয়ে থাকে। এই অংশে পৌরাণিক শিবের উপাখ্যান বর্ণনা প্রসঙ্গে দক্ষযজ্ঞ—সতীর দেহত্যাগ,—পার্বতীর জন্ম,—হরপার্বতীর পরিণয়,—কার্তিক-গণেশের জন্ম প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়। পরে হর-পার্বতীর দারিদ্র্য ও সংসারযাত্রাও স্থান পেয়েছে। কাব্যবর্ণিত দেবতার সঙ্গে পৌরাণিক দেবতার সংযোগ স্থাপনই দেবখণ্ড বর্ণনার উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ দেবদেবীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বর্গস্থ কোন দেবতার অথবা অপ্সরা প্রভৃতির তুচ্ছ কারণে অভিশপ্ত হয়ে মর্তে জন্মগ্রহণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়। অতঃপর নরখণ্ডে মানব-মানবীরূপে জাত শাপভ্রষ্ট দেবদেবীগণের দ্বারা মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতির পূজা প্রচারের কাহিনী বিবৃত হয়ে থাকে। নায়ক-নায়িকারা

দেবতার পূজা প্রচার করে শাপান্তে স্বর্গে গমন করে থাকে। এই নরখণ্ডই মঙ্গলকাব্যের প্রধান বর্ণিতব্য বিষয়। মঙ্গলকাব্যগুলি কয়েকটি পালায় বিভক্ত হয়ে আট বা বার দিনে দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে গীত হয়। উদ্দেশ্য, আঙ্গিক এবং রচনা রীতির দিক থেকে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি এক সূত্রে বিধৃত। বারমাসী বর্ণনা, চৌতিশা স্তব ইত্যাদিতে তিনটি কাব্য সমসূত্রে গাঁথা।

কিন্তু কাব্যের কাঠামোতে যথেষ্ট মিল থাকলেও তিন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে গরমিলও স্বল্প নয়। নরখণ্ডের লৌকিক আখ্যায়িকাগুলি প্রায়শঃই ভিন্ন। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের মনসা বিরোধিতার কাহিনীই সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অপর দুটি কাব্যে এই তীব্র দৈব বিরোধিতার বিবরণ নেই। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতির উপাখ্যানের সঙ্গে চাঁদ সদাগরের সাদৃশ্য আছে। ধনপতি চণ্ডীর ঘটে লাথি মারলেও চাঁদের মত তীব্র দৈব বিরোধিতা তার চরিত্রে নেই, চাঁদের চারিত্রিক বলিষ্ঠতাও তার চরিত্রে প্রকাশিত হয়নি। আবার ধনপতি ও শ্রীমন্তের 'কমলে কামিনী' মূর্তি দর্শনের সঙ্গে মনসামঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল কাহিনীর কোন সাদৃশ্য নেই। মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে একটা অখণ্ডতা আছে। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বিচ্ছিন্ন শাখা কাহিনী হলেও তা কাব্যবর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে যে ভাবে সবিস্তারে সৃষ্টিপ্রকরণ বর্ণিত হয়ে থাকে,—অপর দুটি কাব্যে তা হয় না। মনসামঙ্গল কাব্য করুণ রসের আকর। চণ্ডীমঙ্গলও করুণ রসাশ্রিত। কিন্তু ধর্মমঙ্গল বীর রসের কাব্য। যুদ্ধের এত উন্মাদনা এবং এত যুদ্ধবর্ণনা মধ্যযুগের অন্য কোন কাব্যে নেই। ধর্মমঙ্গল কাব্যের উপাখ্যানে যে ভাবে গল্পরস জমে উঠে, অন্য দুটি কাব্যের কাহিনীতে গল্পরস তেমন ভাবে উঠে না। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসের কোন কোন ঘটনা আত্মগোপন করে আছে মনে

য়। কিন্তু অপর দুটি কাব্যের কাহিনীতে ইতিহাসের কোন গন্ধ নেই। তিনটি কাব্যের কাহিনীই অলৌকিকতায় ভরা। তৎসত্ত্বেও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেশ, কাল ও সমাজের বিবরণ যত বাস্তবানুগত অন্য দুটি কাব্যে তেমন নয়। বাস্তবরস ও জীবনচিত্রণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই সর্বাধিক পরিমাণে দেখা যায়। পুরাণাদির প্রভাব তিন শ্রেণীর কাব্যেই অল্পাধিক পরিমাণে আছে। তথাপি ধর্মমঙ্গল কাব্যে পুরাণ-কাহিনীর এবং পৌরাণিক চরিত্রের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী।

মঙ্গলকাব্যের প্রধান তিনটি শাখার মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য যেমন গভীর, তেমনি প্রত্যেকটি শাখাই স্ব স্ব বিশিষ্টতা সহ অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন।

আধুনিক উপন্যাস ও মঙ্গলকাব্য ঃ

উপন্যাস আধুনিক যুগের ফসল। ইহা পাশ্চাত্ত্য জগৎ থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানীকৃত। বাঙ্গালা ভাষায় যথার্থ উপন্যাস রচনার গৌরব বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাপ্য। কিন্তু গল্প শোনার প্রবৃত্তি মানুষের চিরকালের। মানুষের জৈব জীবনের প্রয়োজনের বাইরেও যে একটা জগৎ আছে, তাকে বলা হয় মনোজগৎ—সেই জগতের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন সাহিত্যের। মনোজগৎ রসের জগৎ। মানুষের রস-পিপাসা পরিতৃপ্ত করে সাহিত্য। পরিশীলিত রুচির মানুষেরা কাব্যরস আস্বাদন করে থাকেন। সাধারণ মানুষের রস-পিপাসা নিবৃত্ত করে গল্প-কাহিনী। প্রাচীন ভারতবর্ষে বহুতর গল্প কথা প্রচলিত ছিল। কাদম্বরী, কথাসরিৎসাগর, দশকুমার চরিত প্রভৃতি একালের উপন্যাসের স্থান গ্রহণ করেছিল।

বাঙ্গালা ভাষায় গদ্য রচনা আধুনিককালের ব্যাপার। প্রাগাধুনিক যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য পদ্যে রচিত। সেই বিশাল পদ্যসাহিত্যের একদিকে যেমন গীতিধর্মী চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী প্রভৃতি—তেমনি অপরদিকে আখ্যানধর্মী মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলিই সে যুগের উপন্যাস রসের চাহিদা মেটাতো। এক শ্রেণীর উপন্যাসে লেখক কল্পনার পাখা বিস্তার করে উদ্দাম বেগে

ছুটে চলেন—লেখকের কল্পনার গতির সঙ্গে পাঠকের মনও ভেসে চলে কল্পনার রাজ্যে। এই শ্রেণীর উপন্যাস রোমান্স প্রধান হয়ে থাকে। আর এক শ্রেণীর উপন্যাসে বাস্তব জীবন—বাস্তব ঘটনা—বাস্তব দেশকাল প্রধান হয়ে ওঠে। সমাজ ও পরিবার জীবনের বিচিত্র ঘটনার সমবায়ে একপ্রকার বাস্তব-রসের সৃষ্টি হয়। মঙ্গলকাব্যগুলি উপন্যাস নয়। উপন্যাসের মধ্যে কাহিনীর মধ্যে দৃঢ় সংবদ্ধতা থাকে। মঙ্গলকাব্যের কাহিনী দৃঢ় সংবদ্ধ নয়। তথাপি উপন্যাসের গুণাবলী অংশতঃ মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যায়। সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বাস্তবানুসারী বর্ণনা,—বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টির জন্যই এগুলি আধুনিক উপন্যাসের ধর্মাবলম্বী। কিন্তু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশের দ্বারা দেবমাহাত্ম্যকীর্তন লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনা ও চরিত্রে সংগতি থাকেনি। একই কাহিনী বিভিন্ন কবির দ্বারা পরিবেষিত হওয়াতেও উপন্যাসসুলভ বৈচিত্র্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি।

বাস্তবতার দিক দিয়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের মধ্যে অগ্রগণ্য। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল সর্বাপেক্ষা উপন্যাসের নিকটবর্তী। সুধী সমালোচকের মতে এযুগে জন্মালে মুকুন্দরাম উপন্যাসই লিখতেন। সমাজের বাস্তব বর্ণনায় মুকুন্দরাম মধ্যযুগীয় কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। চরিত্রচিত্রণে বিশেষতঃ মানব মনের সূক্ষ্ম গতিপ্রকৃতির বিশ্লেষণে মুকুন্দরাম ঔপন্যাসিকসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কাহিনীর শ্লথবদ্ধতা এবং গতানুগতিকতা মুকুন্দরামের কাব্যকে উপন্যাসের গঠনপ্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

একদিক থেকে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি উপন্যাসের নিকটবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে একটা গাঢ়তর উপন্যাসের রস জমে ওঠে। এই কাব্যে দেবতার হিংস্রতা বা দেবতাকে তুষ্ট করার কাহিনী বর্ণিত হয়নি,—বর্ণিত হয়েছে দেবতার কৃপাধন্য লাউসেনের অসীম বীরত্বের কাহিনী। লাউসেনের বীরত্বের কাহিনীগুলি একটির পর একটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে একটি নিটোল গল্পরস জমিয়ে তোলে, মঙ্গলকাব্যের অন্য কোন আখ্যানে এমনটি পাওয়া যায় না। বীর

রসপ্রধান এই কাব্যকাহিনীতে লাউসেনের অনুচরবর্গ—কালুডোম, লখা ডোম, ময়ুরা, লাউসেনের পত্নী কলিঙ্গা ও কানাড়ার বীরত্বগাথা অন্যান্য মঙ্গলকাব্য থেকে ধর্মমঙ্গল কাব্যে একটি পৃথক আস্বাদ এনে দিয়েছে। মনে হয় ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত অবিন্যস্ত ভাবে গড়ে না উঠে কবিদের সচেতন প্রয়াসে সুসংবদ্ধ ভাবে গড়ে উঠেছে। যদিও অলৌকিকতা এই কাহিনীতে প্রচুর—যদিও চণ্ডীমঙ্গলের মত বাস্তব-রস তত প্রখর নয়—যদিও চরিত্র বর্ণনায় অধিকাংশ স্থলেই সূক্ষ্ম কারুকার্য দৃষ্ট হয় না,—তথাপি যুদ্ধবিগ্রহ সমন্বিত বীর রসাশ্রিত এই কাহিনীটিতে মানুষের গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষা খানিকটা তৃপ্ত হয়। দেবতার মহিমা অপেক্ষা লাউসেনের বীর কীর্তিই পাঠক বা শ্রোতার চিত্তকে অধিকার করে বসে। এই কাহিনী রোমান্স-রসাশ্রিত। লাউসেনের অনেক কীর্তিই হয়ত সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে যায়, তথাপি বাস্তবাতিক্রান্ত রোমাণ্টিক কাহিনীর মত ধর্মমঙ্গলের কাহিনী সকল শ্রেণীর মানুষের গল্প শোনার আগ্রহকে তৃপ্ত করতো। মধ্যযুগে,—যখন বিজ্ঞানের শিক্ষা এবং অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার সম্ভব অসম্ভবের সীমা নির্দেশ করেনি,—মানুষের মন অলৌকিক ঘটনাবলীকে অবিশ্বাস্য বলে উপহাস করতে শেখেনি,—ধর্মমঙ্গল কাব্যকাহিনী আধুনিক কালের উপন্যাসের স্থান গ্রহণ করতো জন-মানসে,—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী যেমন নভোবিহারী রোমান্স রসাশ্রিত—শিবমঙ্গলের কাহিনী তেমনি মৃত্তিকা-সঞ্চারী বাস্তব রসাশ্রিত। শিবায়নে হরগৌরীর লৌকিক কাহিনী বাস্তব উপন্যাসের স্বাদ এনে দেয়। এই কাহিনীতে দেবমহিমা প্রচার অপেক্ষা বাঙ্গালীর সামাজিক এবং গার্হস্থ্য জীবন চিত্রণই প্রাধান্য পেয়েছে। হরগৌরীর সংসারযাত্রা—দারিদ্র্য, কোন্দল—শিবের কৃষিকার্য—নিম্নজাতীয়া নারীতে আসক্তি ইত্যাদিতে বাঙ্গালার গার্হস্থ্য এবং সমাজ জীবনের একটি বাস্তব রসাশ্রিত চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। নিম্নবিত্ত অথবা নিম্নমধ্যবিত্ত

বাঙ্গালীর জীবনচর্যার একটি নিখুঁত চিত্র যেন পাঠকের মানসচক্ষে ভেসে ওঠে অথচ এই গার্হস্থ্য জীবন কাহিনীতে গল্প রস কোথাও ব্যাহত হয়নি, দেবতার রুদ্ররোষ কোথাও উৎকটভাবে দেবতার অস্তিত্ব ঘোষণা করে গল্পরস বিনষ্ট করেনি। যদিও কাহিনী এবং চরিত্রসৃষ্টিতে শিবায়নের কবিগণ গতানুগতিকতাকেই মেনে নিয়েছেন, তথাপি শিব-দুর্গার লোকায়ত কাহিনীতেই বাঙ্গালীর রসপিপাসা অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের প্রায় সব কটি শাখাতেই উপন্যাসের রস কিছু কিছু আছে। কিন্তু ধর্মমঙ্গল ও শিবমঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে গল্পরস যেমন দানা বেঁধে উঠেছে তেমন আর কোথাও হয়নি। কাহিনী নির্মিতির দিক থেকে দুটি কাব্যেরই স্বাতন্ত্র্য আছে। অলৌকিকতা বা চরিত্র চিত্রণের ঔপন্যাসিক নিষ্ঠার অভাব কাহিনী গ্রন্থণের নৈপুণ্যে অনেকটা ঢাকা পড়ে যায়। মনসামঙ্গল কাব্যে দেবতার মহিমাকীর্তন অত্যধিক প্রাধান্য পেয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি উপাখ্যান রসের অখণ্ডতাকে ব্যাহত করেছে। আর ধর্মমঙ্গল ও শিবায়নে গল্পে সংহত গ্রন্থণ উপন্যাসের স্বাদ এনে দিয়েছে। তাই ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন কাব্য মধ্যযুগীয় বাঙ্গালীর উপন্যাস রসস্পৃহাকে অনেকটা তৃপ্ত করেছে,—এ কথা বলা অযৌক্তিক নয়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের পৃথক বৈশিষ্ট্যঃ

মঙ্গলকাব্যগুলিতে আঙ্গিকের সাদৃশ্য হেতু একটা স্বাজাত্য লক্ষিত হয়। কাহিনীগত পার্থক্য এবং স্থান কাল ও কবির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গঠনরীতির দিক থেকে মঙ্গলকাব্যগুলি একটি বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। দেবমহিমা প্রচার—পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে লৌকিক দেবতার মিশ্রণের উদ্দেশ্যে দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের অবতারণা,—নরখণ্ডে কোন শাপভ্রষ্ট স্বর্গবাসী দেবতার মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ ও বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেবতার পূজা প্রচারের আয়োজন,—দেবতার পূজাপ্রচারের পরে শাপাবসানে নায়ক-নায়িকার স্বর্গগমন,—দেবতার স্বপ্নাদেশে কবির কাব্য রচনায় প্রবৃত্তি—নায়িকার বারমাসের সুখ-দুঃখের বিবরণ,—চৌত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট বাক্যের দ্বারা দেবতার স্তব—বাঙ্গালীর রন্ধন ও ভোজন রসিকতার বিবরণ,—নারীগণের পতি-নিন্দা বর্ণনা,—নগর পত্তন ও অন্যান্য বর্ণনার সুযোগে দেশের সামাজিক পরিচয় দান ইত্যাদি বিষয়গুলি মঙ্গলকাব্যে সাধারণ বিষয়রূপে স্থানলাভ করে থাকে। এ ছাড়াও কোন কোন কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্বেরও বিস্তৃত বিবরণ থাকে। তৎসত্ত্বেও কাহিনী ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে একটা সাধারণ পার্থক্যও মঙ্গলকাব্যগুলিতে আছে। যেমন, মনসার মত হিংস্রতা মঙ্গলকাব্যের অন্য কোন দেবচরিত্রে নেই, চাঁদ সওদাগরের মত বলিষ্ঠ পুরুষকারের চিত্রও মনসামঙ্গল ছাড়া অন্যত্র পাই না; আবার বাস্তব জীবন পর্যবেক্ষণ যেমন চণ্ডীমঙ্গলে আছে, অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে ততটা সুলভ নয়। ধর্মমঙ্গলকাব্যের বীর রস এবং যুদ্ধ বর্ণনা ও যুদ্ধের উদ্দীপনা ও অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় না। চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকেও ধর্মমঙ্গলকাব্যে এমন একটা বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে—তা অন্য কোন মঙ্গলকাব্যেই সুলভ নয়।

মনসামঙ্গল কাব্যে একমাত্র চাঁদ সওদাগরের চরিত্রেই জীবন্ত মানুষরূপে চিহ্নিত। অপ্রধান চরিত্রহিসাবে বাঙ্গালী জননীর চিরাচরিত চরিত্রটি সনকার মধ্যে খুঁজে পাই। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিচিত্র চরিত্রের ভিড়। ব্যাধ, বণিক, শঠ, ধূর্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে জীবন্ত। বিশেষতঃ মুকুন্দরামের কাব্যে এই ধরনের চরিত্রগুলি নিঁখুত বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে মানব-মানবীর চরিত্রের বাস্তবসম্মত গুণাগুণগুলি অনেকাংশে উপেক্ষিত হলেও মানব-মানবীর জীবনের এমন একটা দিক উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে, যা অন্য কোন কাব্যে হয়নি। এই দিকটি বীরত্বের দিক।

দৈনন্দিন জীবনের মানসভঙ্গীর বিচিত্র গতি-প্রকৃতির বাস্তবোচিত সূক্ষ্ম বিবরণ সমাজের বাস্তব চিত্রটি উন্মোচিত করে সত্য, কিন্তু প্রাত্যহিকতার উর্ধ্বে আরও একটি বৃহৎ জীবনের আকর্ষণ মানুষ মাত্রেই কম বেশী অনুভব করে। বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ—বঞ্চনা—শঠতার উর্ধ্বে অবস্থিত বীরত্বের গরিমায় ভাস্বর এই জীবনটির প্রতি মানবমনের আকর্ষণ চিরন্তন। এই জীবনের আস্বাদনেই ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতাকে ভুলে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে দুঃসাহসিক কার্যে জীবন বিপন্ন করে। ধর্মমঙ্গল এই দুঃসাহসিকতারই আলেখ্য। বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ এখানে প্রাধান্য পায়নি,—প্রাধান্য মহাবীর লাউ-সেনের অসীম শৌর্য ও বীর্যের অলৌকিক কাহিনীর। শুধু লাউসেন কেন, কালুডোম, ইছাই ঘোষ, লখাডোম, সাকা, ময়ুরা, কানাড়া, কলিঙ্গা—বীর চরিত্রের মিছিল চলেছে ধর্মমঙ্গল কাব্যে। এরা অধিকাংশই বীর এবং বীরাঙ্গনা—প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতায় ক্ষয়ে যাওয়া অপেক্ষা শৌর্য ও বীর্যের গরিমায় জীবনকে শাশ্বত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করাই এদের কাছে শ্রেয়ঃ। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা দেশরক্ষা, সত্যরক্ষা এবং নিজের ও রাজার সম্মান রক্ষাই এদের কাছে বড়। লাউসেনের কীর্তিকাহিনী অদ্ভুত বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাসে শোনার উপযুক্ত। রঞ্জাবতীর কঠোর তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের বৃত্তান্তও কম রোমাঞ্চকর নয়। এই চরিত্রগুলিতে যে দৃঢ়তা, যে নিষ্ঠা, যে বীরত্বের

পরিচয় আছে তা শুধু মঙ্গলকাব্যে কেন, সমগ্র বাঙ্গলাকাব্যেই সুলভ নয়। সত্যবটে, জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণের অভাবে চরিত্রগুলিকে অনেক সময় রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয় না, তথাপি জীবনের এই যে একটি বিশেষ দিক,—যে দিকটি মানুষের প্রাত্যহিকতার উর্ধ্বে এক শাশ্বত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত—তা ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিচিত্র চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার জন্যই এই কাব্যটিকে মঙ্গলকাব্যের জগতে একটি স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে।

ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব :

সৃষ্টির আদিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল তমসাচ্ছন্ন। সেই তমসাচ্ছন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অব্যক্ত শূন্যমূর্তি নিরাকার নিরঞ্জন ধর্মঠাকুর বর্তমান ছিলেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ধর্মঠাকুর দ্বিধা হলেন—অনিল অর্থাৎ বায়ু এবং নীল অর্থাৎ মন—এই দুই রূপে। নীলের সংযোগে অনিলের গর্ভ হয় এবং ডিম্ব প্রসূত হয়। ডিম্ব থেকে সাকার ধর্মঠাকুর জন্মালেন। ধর্মঠাকুরের নিঃশ্বাস বা জৃম্ভণ থেকে উলূক বা হনুমান জন্মালেন। উলূকের পিঠে চেপে ধর্মঠাকুর চোদ্দ ভুবন ভ্রমণ করলেন। উলূক পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চাইলে ধর্মঠাকুর মুখ থেকে অমৃত দিলেন। এক কণা অমৃত বাইরে পড়লে তা থেকে প্রবল জলের সৃষ্টি হয় এবং ব্রহ্মাণ্ড জলে প্লাবিত হওয়ায় ধর্ম ও উলূক জলে ভাসতে লাগলেন। তখন ধর্মঠাকুর স্বীয় অমঙ্গল থেকে সৃষ্টি করলেন মেদিনী। তারপরে ত্রিভুবন সৃষ্টি করলেন। ধর্মঠাকুরের ঘাম থেকে সৃষ্টি হোল আদ্যাদেবী কেতকার। উলূকের মধ্যস্থতায় আদ্যাদেবীকে বিয়ে করেই ধর্মঠাকুর তপস্যা করতে চলে গেলেন। তপস্যাকালে ধর্মঠাকুরের মন আদ্যাদেবীর জন্য চঞ্চল হওয়ায় বিন্দু স্খলিত হয়। সেই বিন্দু তিনি বিষ বলে পাঠালেন দেবীর কাছে। দেবী ধর্মের বিরহে কাতর হয়ে সেই বিষ পান করায় গর্ভবতী হলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম দিলেন। তিন ভাইই, জন্মের পরেই বল্লুকা নদীর ধারে তপস্যায় গেলেন। তাঁদের পরীক্ষা করতে ধর্ম গলিত

শবরূপে ভেসে এলেন.। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু পিতার শব চিনতে না পেরে একজন সরে গেলেন আর একজন জলে ঢেউ দিলেন। শিব পিতার শব চিনতে পেরে অপর দুই ভায়ের সঙ্গে শব সৎকার করলেন। ধর্ম খুশি হয়ে কেতকাকে পত্নীরূপে শিবের হাতে দান করলেন। ধর্মের আদেশে বিষ্ণু দেবতা ও জীব সৃষ্টি করলেন। আদ্যাদেবী আদি দেবের চিতানলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে জন্মান্তরে দুর্গারূপে শিবের সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টিধারা রক্ষা করে চললেন।

এই সৃষ্টিতত্ত্ব ধর্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্মপূজাবিধান প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন কবি চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যেও অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। এই সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় কোন কোন পণ্ডিত কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে মনে করেন। আবার মনুসংহিতা, মর্কেণ্ডেয় পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত সৃষ্টিরহস্যের সঙ্গেও সাদৃশ্য দেখা যায়। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তে (১২৯ ঋক্) বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব। কেউ কেউ আবার এই সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে বৌদ্ধ শূন্যবাদ, সাংখ্যের পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্ব, বেদান্তের মায়াবাদ প্রভৃতিরও সাদৃশ্য দেখিয়ে থাকেন। ফতলঃ ঋগ্বেদ, পুরাণ, বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন এবং বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবে ধর্মমঙ্গল কাব্যের এই সৃষ্টিতত্ত্ব গঠিত হয়েছে।

ধর্মমঙ্গল ও মনসামঙ্গল ঃ

ধর্মমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলেও মূল কাহিনীতে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য যেমন দেবচরিত্র পরিকল্পনায়, তেমনি নরখণ্ডে বর্ণিত লৌকিক উপাখ্যানের মৌলিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান দেবতা মনসার চরিত্র যেমন হিংস্র, তেমন হিংস্র, মঙ্গলকাব্যের অন্য কোন দেবচরিত্র নয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী কালকেতুর উপাখ্যানে বরদা অভয়া,—ধনপতির উপাখ্যানে কিছুটা

নিষ্ঠুরতা চণ্ডীর চরিত্রে থাকলেও মনসার সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধর্মঠাকুরও হিংস্র নয়,—তিনি বরদ—ভক্তের প্রতি তাঁর অসীম আনুকূল্য। তাঁর অনুগ্রহে লাউসেন অসাধ্য সাধন করেছেন। মনসার মত স্বয়ং মর্তে বারংবার আবির্ভূত হয়ে নিজের পূজা প্রচারে তিনি জঘন্য হীনতা স্বীকার করেননি।

তুলনামূলক বিচারে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে মনসামঙ্গল কাব্য ধর্মমঙ্গল কাব্য অপেক্ষা অধিকতর মানবিক গুণে সমৃদ্ধ। এই মানবিকতা কেবল মানব-মানবীর ক্ষেত্রেই নয়, দেবচরিত্র পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও সুপ্রকট। মনসামঙ্গলের মনসা সমকালীন যুগে অত্যাচারী রাজশক্তির প্রতীক।

মানবিকতা

এ ছাড়াও মনসার চরিত্রে দেবত্বের আরোপ কোথাও নেই। মনসা একান্ত স্বার্থপরায়ণা। স্বীয় পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি যে কোন রকম হীনতা স্বীকার করেছেন। নিরপরাধ চাঁদ সওদাগরকে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য বিপদে ফেলে তিনি স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছেন। গুপ্তহত্যা, ছলনা, ভীতিপ্রদর্শন প্রভৃতি সর্বপ্রকার জঘন্যতম অন্যায় কার্য করতে তিনি কখনও দ্বিধা করেননি। মনসাকে দেবতারূপে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে মানুষের মন স্বভাবতই কুণ্ঠা বোধ করবে। মনসামঙ্গলের মনসা একজন ক্রূরকর্মা হীন ষড়যন্ত্রকারিণী আত্মপরায়ণা মানবী মাত্র। মঙ্গলকাব্যের অন্য কোন দেব-চরিত্রে এরূপ মানবত্ব আবোপিত হয়নি।

নরখণ্ডের লৌকিক কাহিনীতেও নরনারীর চরিত্রগুলি মানবিক গুণে সমৃদ্ধ। সীতা ও সাবিত্রীর আদর্শে পরিকল্পিত বেহুলা চরিত্রটিতে অনেক অলৌকিকতার সমাবেশ ঘটলেও তাঁর মানবিক রূপটি একেবারে আচ্ছন্ন হয়নি। লখীন্দরের মৃত্যুর পর সনকার ভর্ৎসনার প্রত্যুত্তরে বেহুলার কঠোর উক্তি, স্বামীর মৃত্যুতে করুণ বিলাপ, ভ্রাতৃগণের প্রতি সকরুণ বাক্য প্রভৃতি বেহুলাকে মর্তে মানবীতেই পরিণত করেছে। কোন কোন কবি বেহুলাকে মানবী রূপেই বর্ণনা করেছেন। বেহুলা চরিত্র ছাড়া আর সকল চরিত্রই

মানবিক গুণে সমৃদ্ধ। চাঁদ সওদাগরের মানসিক দৃঢ়তা, পুরুষকার এবং প্রতিকূল ভাগ্যের বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম, এবং সাত পুত্রের মৃত্যুজনিত শোকের আগুনে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হওয়া এক অসীম শক্তিমান পুরুষেরই চিত্র। চাঁদ সওদাগরের চরিত্রে অলৌকিকতার স্পর্শ নেই। চাঁদের অন্তরবেদনা চাঁদকে প্রাণহীন পুতুল না করে মানুষই করেছে। সনকা স্বামীপুত্রের কল্যাণাকাঙ্ক্ষিণী স্নেহময়ী বাঙ্গালী জননী মাত্র। এর অতিরিক্ত কোন পরিচয় সনকায় নেই। লখীন্দর একটি সাধারণ যুবক মাত্র। বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রে ফোটেনি। তবে কোন কোন কবি লখীন্দরকে এক চরিত্রহীন লম্পট রূপে অংকিত করেছেন। মনসামঙ্গলের চরিত্রগুলি যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র অপেক্ষা বহুলাংশে মানবিক গুণসম্পন্ন, তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র মানবিক গুণসম্পন্ন। ব্যক্তিত্বহীন অপদার্থ রাজা গৌড়েশ্বর, ভীরু কর্পূরসেন, স্ত্রৈণ কর্ণসেন প্রভৃতি চরিত্রগুলি সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ। লখাডোম কিংবা রঞ্জাবতীর চরিত্রে কোন কোন স্থানে মানবিক গুণের সমাবেশ আছে। কিন্তু মানবজীবনের শৌর্যবীর্যময় দিকটির প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকায় ধর্মমঙ্গলের কবিগণ চরিত্রগুলির বাস্তব মানবিকতার দিকটি প্রায়শঃই উপেক্ষা করেছেন। ফলে চরিত্রগুলি অধিকাংশ স্থলেই আইডিয়া মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। নায়ক লাউসেন শৌর্যবীর্যের প্রতীক —বহু অঘটন ঘটনে পটু—কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ নয়। মহামদের হিংস্রতা— রঞ্জাবতীর কৃচ্ছ্রতা, কালু লখা ইত্যাদির বীরত্ব ও সত্যনিষ্ঠা উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত হলেও চরিত্রগুলিকে বাস্তব মানব রূপে চিত্রিত করার দিকে কবিগণ মনোযোগ দিতে পারেননি। মানবজীবনের একটি অংশের প্রতি তাঁদের মনোযোগ এমনই নিবিষ্ট ছিল যে অপর দিকগুলির প্রতি তাঁরা নজরই দিতে পারেননি। তথাপি একথা সত্য যে কোন মঙ্গলকাব্যের চরিত্রই সম্পূর্ণ মানবত্ব বর্জিত নয়। এদিক থেকে সর্বাপেক্ষা আগে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় চণ্ডীমঙ্গলের চরিত্রগুলির প্রতি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অধিকাংশ চরিত্রই অথবা সকল

চরিত্রই মানবিক গুণে সমৃদ্ধ। কবিগণ বাস্তব মাটির দিকে তাকিয়েই চরিত্রগুলি তৈরী করেছেন। তাই কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারীশীল ও তৎপত্নী, লহনা, দুর্বলা প্রভৃতি চরিত্রগুলি যেমন বাস্তবসম্মত, তেমনি জীবন্ত। এমন জীবন্ত চরিত্র মঙ্গলকাব্যের অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তথাপি একথা স্বীকার্য যে দেবচরিত্রে মানবত্ব আরোপণে এবং মানবচরিত্র সৃজনে ধর্মমঙ্গল কাব্য অপেক্ষা মনসামঙ্গল কাব্য অনেকাংশে মানবিক গুণসমৃদ্ধ। কাহিনী ও চরিত্র বর্ণনায় ধর্মমঙ্গলের কবিগণ যতটা ঊর্ধ্বলোকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, অন্যান্য শাখার কবিরা ততটা করেননি।

রামকৃষ্ণের শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্য ঃ

মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা কাব্যের তিনটি ধারা—মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ কাব্য ও বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে রামকৃষ্ণের শিবায়ন একটি স্বতন্ত্র আসনের দাবী রাখে. রামকৃষ্ণের শিবমঙ্গল অনুবাদ কাব্য নয়, আবার মঙ্গলকাব্যেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতি ও কাহিনী ভাগের সঙ্গে রামকৃষ্ণের কাব্যের কোন সাদৃশ্য নেই। মঙ্গলকাব্যে সাধারণতঃ দুটি ভাগ থাকে—দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। চণ্ডীমঙ্গলে তিনটি ভাগ—দেবখণ্ড, আখেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ড। এই বিভাগের মধ্যে নরখণ্ডই প্রধান। নরখণ্ডে কাব্য বর্ণিত দেবদেবীর মহিমা অথবা পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি লৌকিক উপাখ্যান বর্ণনা করা হয়ে থাকে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লৌকিক উপাখ্যান দুটি। কোথাও দেবতা স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে নিজের পূজা প্রচারে যত্নবান হন, কোথাও বা দেবতার অনুগ্রহ পুষ্ট কোন মানুষ স্বীয় কীর্তিকলাপ দ্বারা দেবতার পূজা প্রতিষ্ঠিত করেন। যেখানে দেবতা স্বয়ং উদ্যোগী সেখানে কোন অভক্ত অথবা অন্য দেবতার ভক্তকে তিনি স্ববশে আনয়ন করে থাকেন। এই দিক থেকে শিবায়ন কাব্যগুলিই মঙ্গলকাব্যের সমধর্মী নয়। রামকৃষ্ণের শিবায়নের সঙ্গে মঙ্গলকব্যের পার্থক্য আরও বেশী। শিবায়ন কাব্যে দেবতার পূজা প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়নি। এখানে দেবখণ্ড ও নরখণ্ড নামে দুইটি পৃথক বিভাগ নেই। কেবলমাত্র হরপার্বতীর উপাখ্যান বর্ণনাই কবির লক্ষ্য। অবশ্য হরপার্বতীর উপাখ্যানেও স্পষ্ট না হলে সূক্ষ্ম বিভাগ আছে। প্রথম ভাগে হরপার্বতীর পৌরাণিক কাহিনী এবং দ্বিতীয় ভাগে হরপার্বতীর লৌকিক কাহিনী। এই লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর সংযোগ নিবিড় নয়। লৌকিক কাহিনীতে শিবের সংসারযাত্রা—দারিদ্র্য,

কৃষিকার্য ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। নরখণ্ডের পরিপূরক হিসাবে হরপার্বতীর লৌকিক উপাখ্যানকে গ্রহণ করা গেলেও দুই প্রকার কাহিনীর মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য আছে। মঙ্গলকাব্যের নরখণ্ডে দেবতার পূজা ও মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে লৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়ে থাকে। শিবায়নের লৌকিক কাহিনীতে লঘু তরল সুরে দেবতার লৌকিক লীলা বর্ণিত হয়েছে মাত্র—দেবতার মহিমা কীর্তিত হয়নি। এই লঘু চপল সুর ও আদিরসাত্মক বর্ণনার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কোন কোন অংশের সাদৃশ্য আছে সত্য, কিন্তু মৌল দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্যের বিরাট পার্থক্য। রামকৃষ্ণের শিবায়নে ত লঘু সুরটি একেবারেই অনুপস্থিত। হরগৌরীর লৌকিক কাহিনীও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—এর সুরও উচ্চগ্রামে বাঁধা। আদিরসের বর্ণনাও অনুপস্থিত। মঙ্গলকাব্যের কোন অংশের সঙ্গেই রামকৃষ্ণের শিবায়নের তুলনা হয় না। মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডের হরগৌরীর কাহিনীর সঙ্গে মাত্র রামকৃষ্ণের কাব্যের তুলনা হয়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে লৌকিক কাহিনীর ভূমিকাই প্রধান—দেবখণ্ড অপ্রধান অংশ মাত্র। রামকৃষ্ণের কাব্যে হরপার্বতীর পৌরাণিক কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করেছে। সংযত ভাষা—উন্নত রুচি ও উচ্চতর ভাবাদর্শ রামকৃষ্ণের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। হরগৌরী সম্পর্কিত বিভিন্ন কাহিনী তিনি নানাবিধ পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং পৌরাণিক মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখে ভাবানুসারী তৎসম বহুল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাই তাঁর কাব্য রামেশ্বরের শিবায়নের মত 'শিবদাস ভট্টাচার্যে'র কাহিনীতে পর্যবসিত হয়নি। রামকৃষ্ণের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে দেবখণ্ড বর্ণিত হরপার্বতীর কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা কেবল মাত্র লৌকিক দেবতা নামে খ্যাত মঙ্গলকাব্যের দেবতা বিশেষের পৌরাণিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই রচিত। রামকৃষ্ণের শিবমঙ্গলে শিব সম্পর্কিত কাহিনী বর্ণনাই উদ্দেশ্য। সংস্কৃত পুরাণের অনুসরণে সৃষ্টিতত্ত্ব, কালবিভাগ তীর্থমাহাত্ম্য, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, পার্বতীরূপে সতীর জন্মলাভ,

হরপার্বতীর পরিণয়, সমুদ্রমন্থন, সগর রাজার কাহিনী,—গঙ্গার মর্তাবতরণের কাহিনী—অন্ধকাসুর বধ, ত্রিপুরাসুর বধ,—তারকাসুর বধ, পৌরাণিক জরৎকারু মনসার কাহিনী—উষা-অনিরুদ্ধের উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে রামকৃষ্ণের শিবায়নে। এ যেন বাঙ্গালা ভাষায় রচিত একটি শৈব পুরাণ —একে শিবসংহিতা বলাই যুক্তিযুক্ত। প্রচুর পাণ্ডিত্যের অধিকারী রামকৃষ্ণ তাঁর কাব্যটিকে পুরাণ কাহিনীর প্রদর্শনীতে পরিণত করেছেন। রামকৃষ্ণের শিবায়ন তাই মঙ্গলকাব্য নয়;—মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক স্বতন্ত্র কাব্য। হরপার্বতীর পৌরাণিক মহিমাকেও তিনি ক্ষুণ্ন হতে দেননি।

মধ্যযুগীয় অনুবাদ কাব্যগুলির সঙ্গে রামকৃষ্ণের শিবায়নের কিছুটা মিল আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি নিছক অনুবাদ কর্ম নয়। বিশেষতঃ এই দুই কবি রামকথা ও ভারতকথা সম্পর্কিত বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত কাহিনীগুলি প্রয়োজনমত তাঁদের রচনায় গ্রহণ করেছেন, আবার প্রয়োজনমত মূল কাব্যের বহুল অংশ বর্জনও করেছেন,—আবার স্থল বিশেষে নিজ নিজ কল্পনা শক্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। রামকৃষ্ণের শিবমঙ্গল পুরাণকথার সংগ্রহশালা হলেও যেমন অনুবাদ নয়, তেমনি রামায়ণ মহাভারতের মত কোন একটি মূল মহাকাব্যকে আশ্রয় করেও রচিত নয়। এখানে কবি স্বাধীনভাবে পৌরাণিক কাহিনী নির্বাচন করেছেন এবং সংকলন করেছেন।

রামকৃষ্ণের শিবমঙ্গল মধ্যযুগের কাব্যের ত্রিধারা থেকে স্বতন্ত্র,—অথচ নূতন ধারার পথিকৃৎও নয়। শিবায়নের অন্যান্য কবিরা হরপার্বতীর লৌকিক কাহিনীর উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং কাব্যের সুরকে রামকৃষ্ণের মত উচ্চ গ্রামে রাখেননি বা রাখতে পারেননি। রামকৃষ্ণের শিবমঙ্গলকে তাই মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা কাব্য ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন—একক স্বতন্ত্র কাব্য বললে অত্যুক্তি হয় না।

রামকৃষ্ণের কাব্য ও যুগরুচি:

যুগের প্রতিফলন হয় কাব্যে। একদিকে যেমন সমাজজীবন কাব্যে

আপনার স্থান করে, তেমনি যুগের রুচি ও রসবোধ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। কদাচিৎ কোন মহৎ প্রতিভা যুগের প্রভাব অতিক্রম করে নব যুগের সৃষ্টি করে থাকেন। কাব্য রচিত হয় পাঠকের উদ্দেশ্যেই। পাঠকের রসবোধ এবং রুচির সঙ্গে কবির রসবোধ ও রুচির মিল না থাকলে কাব্য সমকালে অন্ততঃ সমাদৃত হয় না। বিপুলা পৃথ্বীতে নিরবধি কালপ্রবাহে কোন সুদূর অতীতের কথা ভেবে কবিকে সান্ত্বনা পেতে হয়। রামকৃষ্ণের কাব্যও এই কারণেই সমাদর লাভ করেনি। তাঁর কাব্য যুগরুচিকে তৃপ্ত করতে পারেনি।

মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা কাব্যের দিকে চোখ ফেরালে সর্বপ্রথম যেখানে চোখ পড়বে তা বাঙ্গালী সমাজের রস ও রুচিবোধ। জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকেই এর শুরু। ভাগবত দৃষ্টি ব্যতিরেকে গীতগোবিন্দ পড়লে অভক্ত প্রাকৃতজন অবশ্যই কাব্যের উন্নত রুচির প্রশংসা করতে পারবেন না। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আদিরসের ছড়াছড়ি,—দেহসম্ভোগের বিস্তৃত বিবরণ এ কালের রুচিকে সর্বতোভাবে আঘাত করে। সেকালের পাঠকের রসপিপাসা তৃপ্ত করতেই যে এই জাতীয় কাব্যের সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই। আদিরস সর্বদেশে সর্বকালেই প্রাকৃতজনের স্বাদনীয় বিষয়। তৎসত্ত্বেও মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্যে আদিরসের প্রাধান্য স্বীকার করতেই হয়। ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে পরিশীলিত আধুনিক যুগরুচির পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালা কাব্যে এই রীতিরই ব্যাপ্তি। এমনকি ইংরাজী সভ্যতার সংস্পর্শ লাভের প্রথম যুগেও তর্জাগান, যাত্রাগান, কবিগান, খেউর, টপ্পা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রমোদকর, সঙ্গীতমূলক অনুষ্ঠানেও ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতাকে অবাধে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। যুগসন্ধির কবিরূপে স্বীকৃত ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যেও এই জিনিস দুর্লভ নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে উৎকট আদিরসাত্মক বর্ণনা বর্তমান, তাহাই কায়া বদল করে আত্মপ্রকাশ করলো অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে মহাশক্তিধর কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে আদিরসের

প্রগল্‌ভ বিবরণ আশ্চর্য শিল্পকুশলতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সাধক কবি রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরও এই দোষবিমুক্ত নয়।

মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণবপদাবলীতে আদিরসের বর্ণনা এক অতীন্দ্রিয় রসানুভূতিতে পরিণত হয়েছে। যুগরুচির প্রতিফল মঙ্গলকাব্যগুলিতে অদৃশ্য নয়। মনসামঙ্গলের কোন কোন কবি বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র প্রভৃতি কবিগণ আদিরসের ছড়াছড়ি করেছেন; গ্রাম্যতা দোষও এঁদের কাব্যে দুর্লভ নয়। লখীন্দরের মাতুলানী-গমনরূপ কুৎসিৎ বর্ণনাও এঁদের কাব্যে স্থানলাভ করেছে। চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলিতেও যে আদিরসাত্মক বর্ণনা নেই তা নয়। মুকুন্দরামের মত প্রতিভাবান কবিও ধনপতি ও খুল্লনার বিবাহ বর্ণনা না করে পারেননি। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও রাজা জমিদার প্রভৃতির রাজসভার রুচি খুব উন্নত ছিল না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে রুচিবিকার লক্ষিত হয় ভারতচন্দ্রের কাব্যে তারই শিল্পসম্মত রূপ দেখতে পাই। অদ্বিতীয় ভাষাশিল্পী রায়গুণাকর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে আদি রসের চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। সাধক কবি রামপ্রসাদও বিদ্যাসুন্দর কাব্যে আদিরস বর্ণনায় কার্পণ্য করেননি। শিবায়ন কাব্যগুলিতেও শিবের কোচনী সম্পর্কিত বিবরণ উন্নত রুচির পরিচায়ক নয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগের কবি রামেশ্বর শিবায়নে উন্নততর রুচিবোধের পরিচয় দিতে পারেননি। রামেশ্বরের শিবায়নে লঘু সুরে বর্ণিত শিবের লৌকিক কাহিনীতে গ্রাম্যতা দোষও প্রচুর।

যুগরুচি ও রসবোধের বিচারে রামকৃষ্ণের শিবায়ন এক অনন্য সৃষ্টি। তিনি কাব্যের বিষয়বস্তুতে যেমন সংস্কৃত পুরাণাদি বর্ণিত কাহিনীগুলি গ্রহণ করেছেন, কাব্যের ভাব এবং ভাষাও তেমনি শিবমহিমা কীর্তনের উপযোগী করে তুলেছেন। রামকৃষ্ণের ভাষা গ্রাম্যতা বর্জিত,—সংযত এবং উচ্চতর রুচিবোধের পরিচায়ক। শিবের লৌকিক উপাখ্যানেও রামকৃষ্ণ উচ্চতর রস ও রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও তিনি আদিরস বর্জন করে যুগরুচির ঊর্ধ্বচারী হতে চেয়েছেন। শিবের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে

সঙ্গতি রেখে সংক্ষিপ্ত লৌকিক কাহিনীটিও উচ্চগ্রামে বেঁধেছেন। ফলে রসবোধ ও রুচিবোধের দিক থেকে রামকৃষ্ণ পৃথক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই কারণেই রামকৃষ্ণের শিবায়ন বহুল প্রচার লাভ করেনি।

মৃগলুব্ধ কাব্য :

শৈব পুরাণের শিবচতুর্দশীর ব্রতকথা অবলম্বনে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কয়েকখানি কাব্য রচিত হয়েছিল। এই ক্ষুদ্রাকৃতির কাব্যগুলি মৃগলুব্ধ নামে পরিচিত। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ চট্টগ্রাম থেকে দুজন কবির মৃগলুব্ধ কাব্য আবিষ্কার করেন, এবং তাঁরই সম্পাদনায় কাব্য দুখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।

মৃগলুব্ধ কাব্যে এক জীবহিংসক ব্যাধের শিবরাত্রির মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে মুক্তিলাভের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। হস্তিনাপুরীর ধার্মিক রাজা ও রাণী

কাহিনী

রুক্মিণী শিবচতুর্দশীর ব্রত করে রাত্রি জাগরণ করে শিবপূজা করছেন। রাত্রি জাগরণকালে রাণী রুক্মিণী ব্যাধের কাহিনী বিবৃত করেন। ইন্দ্রশাপে অভিশপ্ত কোন বিদ্যাধর ব্যাধরূপে মর্তে জন্মগ্রহণ করে এবং জাতিগত বৃত্তি হিসাবে জীবহিংসায় রত হয়। কোন এক শিবচতুর্দশীর রাত্রে সে পশু শিকার করে ফেরার সময় ঝড়বৃষ্টিতে কাতর হয়ে অনাহারে ক্লিষ্ট এবং শ্রমশ্রান্ত দেহে বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করে রাত্রি যাপন করে। বৃক্ষনিম্নে শিবলিঙ্গ অবস্থিত থাকায়, অনাহারক্লিষ্ট ব্যাধের দেহসংস্পর্শজাত বিল্বপত্র, স্বেদজল, নিহত পশুর রক্ত ইত্যাদি শিবলিঙ্গে পতিত হওয়ায় তিথি-মাহাত্ম্যহেতু পরিতুষ্ট শিব মৃত্যুর পরে ব্যাধকে শিবলোকে স্থানদান করেন। রাণী রুক্মিণীর মুখে এই কাহিনী শুনে শিবভক্ত মুচকুন্দ চন্দ্রভাগা নদীর তীরে শিবের লিঙ্গমূর্তির আরাধনা করে প্রজা ও পরিবারবর্গসহ শিবলোক প্রাপ্ত হন।

মৃগলুব্ধের কবি :

এই ক্ষুদ্র কাহিনী কাব্যের একজন কবি রামরাজা। আবদুল করিম

সাহেবের মতে রামরাজা এই কাব্যের প্রাচীনতম কবি। তিনি আরও একজন অজ্ঞাতনামা প্রাচীন কবির কথা উল্লেখ করেছেন।

রামরাজা

ডঃ সুকুমার সেন রামরাজাকে শিশুরাম বা রামরায় রূপে উল্লেখ করেছেন। রামরায়ের কাব্যে স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে। তবে চরিত্রসৃষ্টি, কাহিনী বর্ণনা ইত্যাদিতে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেনি।

দ্বিজ রতিদেব মৃগলুব্ধ কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। রতিদেবের পুঁথিতে কালজ্ঞাপক পয়ার আছে।

রস অঙ্ক বাউ শশী শকের সময়।
তুলামাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হএ॥

এ থেকে জানা যায় যে ১৫৯৬ শকাব্দে বা ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে কার্তিক মাসে রতিদেবের কাব্য রচিত হয়। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে কবির নিবাস ছিল চট্টগ্রামের চক্রশালা পরগণায় সুচক্রদণ্ডী গ্রামে। তাঁর পিতার নাম গোপীনাথ, মাতার নাম মধুমতী, তাঁর দুই বড় ভাই রাম ও নারায়ণ।

রতিদেব

মৃগলুব্ধ কাব্যের পরিশিষ্টে 'মনসার ধূপাচার' নামক কবিতাটিও সম্ভবত রতিদেবের রচনা। রতিদেবের কাব্যের সঙ্গে রামরাজার কাব্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। মুন্সী আবদুল করিমের মতে রতিদেব রামরাজার কাব্য অনুসরণ করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান, দুই কবিই পূর্বতন কোন কবির কাব্য থেকে গ্রহণ করেছেন। রতিদেবের কাব্য প্রসাদ গুণ-সম্পন্ন। কাহিনী গ্রন্থণেও কবির নিপুণতা প্রকাশ পেয়েছে। বর্ণনাও স্থানে স্থানে বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। মৃগলুব্ধ কাব্যে রতিদেব রামরাজা অপেক্ষা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।